অবসরিকা

শঙ্কর

সাহিত্যলোক
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট । কলকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক । ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট । কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ : শেখ জাম মহম্মদ

মুদ্রাকর : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স । ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন । কলকাতা ৬

মধ্য কলকাতার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পাড়ায় তখন পড়ন্ত দুপুর। পার্ক স্ট্রিটের কাছে রিপন স্ট্রিটের দোতলা অফিসঘরের গ্র্যান্ড ফাদার ঘড়িটায় তখন চারটে বেজে দশ। আমি তখনও চেয়ারে বসে মাথা নিচু করে হিসেবের খাতায় একমনে এন্ট্রি করে যাচ্ছিলাম। সেই সময় ছোকরা সহকর্মী সুকুমার বলে উঠলো, "আর কেন, বলরামদা? জানি আপনারা সেকেলে সেগুন কাঠ, লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত অনেস্টলি কোম্পানিকে সার্ভিস দিয়ে যেতে চান। কিন্তু মিস্টার ধাওয়ান এরমধ্যেই আপনার খোঁজ করছেন।"

চুকলিখোর চাটুজ্যেও এই বিকেলে আমার সঙ্গে অস্বাভাবিকভাবে ভাল ব্যবহার করছে। এই বলরাম বিশ্বাসের দোষ ছাড়া কোনও গুণ যে লোকটা সারা জীবনেও দেখতে পায়নি, সাবাক্ষণ যে সিনিয়র অফিসারদের কাছে অধস্তন কর্মীদের সবার হাঁড়ির খবর রিপোর্ট করেছে, সেও বলে উঠলো, "ওরে সুকুমার, বলরামদা একালের ছোঁড়া নন, ওঁরা যাদের নুন খেয়েছেন তাদের সেবা করতে কখনও পিছপাও হননি।"

চেয়ার ছেড়ে হাত ধুতে অফিসের কলঘরে ঢুকে পড়লাম। ওখানে বেসিনের কলটা আজকাল পুরো বন্ধ হয় না, টপটপ করে সারাক্ষণ জল পড়ে যায়। বহুকাল আগে বড়সায়েব মিস্টার ক্যামবেল বলেছিলেন, "একটা কলের মুখ ঠিক বন্ধ না হলে বছরে কত হাজার গ্যালন জলের অপচয় হয় জানো? এই শহরেই কত যে জলের টানাটানি।" এখন এসব নিয়ে এই অফিসের কেউ আর মাথা ঘামায় না। জল সারাক্ষণ টপটপ করে পড়ে যাচ্ছে—যেন মানুষের পরমায়ু তিলে তিলে অপচয় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু

কলের মুখ পাল্টাবার জন্যে খরচ অনেক—কোম্পানির পক্ষে এ একটা বিলাসিতা।

সুকুমার ছোকরাও টয়লেটে এসে জড়ো হয়েছে। সিগারেট খাবার জন্যে। সিগারেটে মুখাগ্নি করে সে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা বলরামদা, সিগ্রেট খেলে কি সত্যিই ক্যানসার হয়?"

"আমি তো আর ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় নই। তবে সিগারেটের বাক্সে যখন ওয়ার্নিং দেওয়া থাকে, তখন নিশ্চয় কিছু রোগবিরোগ হয়।"

সিগারেটের লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে সুকুমার তেওয়ারি বললো, "একদম বাজে কথা, তা হলে তো কলকাতার রাস্তাঘাটে লাখ-লাখ ক্যানসার রোগী দেখা যেতো। আসলে ওয়ার্নিংটা ভয় দেখাবার জন্যে।"

আজ আর কাউকে ভয় দেখাবো না। "সুকুমার, তোমরা বড় হয়েছ, মেয়ের বাবা হয়েছ, যাতে সংসারের ভাল হয় তাই তোমরা করবে।"

সিগারেটে আরও একটা টান দিয়ে সুকুমার বললো, "শরীরের ক্ষতি কতটুকু জানি না, কিন্তু পকেটের যথেষ্ট ক্ষতি। ভয় হয়, এই কোম্পানিতে কাজ করে আর কতদিন সিগ্রেট ফোঁকা চলবে!"

চুকলি চাটুজ্যে কলঘরে ঢুকে বললো, "ওইসব অলুক্ষুণে কথা মুখে আনিস না। যখন প্রথম সিগ্রেট ফুঁকেছিলি তখন তো বাবা পয়সা জুগিয়েছিলেন। যে খায় চিনি তাকে জোগায় চিন্তামণি।"

চুকলির অফিসিয়াল নাম জলধর। সে বললো, "কী বলেন, বলরামদা? মিস্টার চিন্তামণি না থাকলে দুনিয়ার এতো লোকের চলছে কী করে? ভালয়-মন্দয় সবাবই তো চলে যাচ্ছে, কী বলেন?"

তাই তো পাবলিকের ধারণা! কিন্তু সবার কি চলছে? সে কথা এদের জিজ্ঞেস করে আজকের এই বিকেলবেলায় কোনও লাভ নেই।

"যাদের চলছে না তাদের কোনো খবর আমরা কি রাখতে পারি, জলধরবাবু?" একটু দার্শনিকের মতন বলে উঠলো সুকুমার। "এই যে আমাদের পুরনো বড়বাবু সুধাময় দাঁ। কোমরের হাড়গোড ভেঙে ছ'মাস বিছানায় পড়ে আছেন, আমরা জেনেও জানি না।"

আমি এই সময় কমোডের মাথা থেকে ঝোলানো চেনটা টানলাম, কিন্তু কোনও কাজ হলো না। তারপর আমি চেন টেনেই চলেছি। আজ অফিস ছেড়ে যাবার দিনে কোনও ময়লা জমা রেখে যাবো না। চুকলি চাটুজ্যে বলে উঠলো, "ছেড়ে দিন, বলরামদা। টানাটানি করলেই সংসারে সবকিছু পাওয়া যায় না।"

তা ঠিক। চুকলি চাটুজ্যে অজান্তে দামি কথা বলে ফেলেছে। এই তো গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ধাওয়ানকে অনেক ধরাধরি করেছি, ফল তো হলো না। অথচ লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত মিষ্টি হেসে লোকটা বলে গেলো, "দেখছি কিছু করা যায় কি না।" এসব মিথ্যে অভিনয়ের কি প্রয়োজন ছিল? আজ যাবার সময় আমি শুনিয়ে দেবো, সবার সামনে বলে যাবো, মানুষকে মিথ্যে আশা দিয়ে ঝুলিয়ে রাখাটাও এক ধরনের অন্যায়। এসবের কোনও প্রয়োজন ছিল না।

আমি টয়লেট থেকে বেরিয়ে নিজের সিটে ফিরে এসেছি। পুরনো আসন—এই একই চেয়ারে কত বছর ধরে আমি বসে আছি তার হিসেব নেই। এখন মনে পড়ছে, বহু বছর আগে গণপতিবাবু—গণপতি চট্টরাজ যেদিন কাজ থেকে রিটায়ার করলেন সেদিন বিকেলে চুপি চুপি বললেন, "বলরাম, তুমি আমার চেয়ারটা নিয়ে নাও। এই গদিটা হিগিনবথাম সায়েবকে ধরে আমি স্যাংশন করিয়েছিলাম।" হিগিনবথাম সায়েবকে আমি দেখিনি, তবে সারা জীবন এই রিপন স্ট্রিটে তাঁর গল্প শুনেছি। গণপতিকে ভাল গদিই দিয়েছিলেন। কারণ উইদাউট এনি রিপেয়ারিং আমিও এত বছর গদিসুখ উপভোগ করে গেলাম। অবশ্য কাল থেকে এতে বসবার সুযোগ আমার থাকবে না।

ঘড়িতে পাঁচটা এখনও বাজেনি। চুকলি চাটুজ্যে এবার আচমকা আমাকে ধাওয়ান সায়েবের ঘরে নিয়ে গেল। আমার ডিপার্টমেন্টের লোকরাও সেখানে উপস্থিত। ধাওয়ান সায়েবের টেবিলে পাঞ্জাবির দোকান থেকে আনানো সিঙাড়া ও সন্দেশ সাজানো রয়েছে। ধাওয়ান সায়েব লেকচার দিলেন, "আজ আমাদের দুঃখের দিন। বলরাম অবসর নিচ্ছে।

স্পটলেস চান্সলেস ইনিংস বলতে যা বোঝায় তাই বলরামের। আমরা তোমাকে খুবই মিস্ করব।"

কী অদ্ভুত লোকটা। গড়গড় করে মিথ্যে বলে যাচ্ছে। আমি যেতে চাইনি, আমি অ্যাপ্লিকেশনও করেছিলাম, কিন্তু আবেদন গ্রাহ্য হয়নি।

কী আশ্চর্য! যাবার সময় যেসব সত্যি কথা বলে হাটে হাঁড়ি ভাঙবো ভেবেছিলাম তার কিছুই পুরনো সহকর্মীদের সামনে বলতে পারলাম না।

সকলের সামনে আমি বললাম, "আজ আমি যাচ্ছি। এখানে চিরকাল থাকবার জন্যে কেউ আসে না। কিন্তু পরিবারের সভ্য হয়ে বহু বছর ছিলাম। আপনাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সকলকে আমি নমস্কার জানাই। পরিবারের একজন প্রাক্তন সভ্য হিসেবে দয়া করে আমাকে মনে রাখবেন। ম্যানেজার মিস্টার ধাওয়ান, বিশেষ করে আপনাকে আমার ধন্যবাদ, আপনি আমার সঙ্গে নিখুঁত ব্যবহার করেছেন।"

রিপন স্ট্রিট থেকে পায়ে হেঁটে লোয়ার সার্কুলার রোডে এসেছি, যার নতুন নাম এ. জে. সি. বোস রোড। ওখান থেকে মিনি ধরবো। আজ সঙ্গে মালের বোঝা রয়েছে, মনের মধ্যেও কিছু প্রাপ্তি এবং কিছু বিক্ষোভের বোঝা রয়েছে। অফিসের বেয়ারা নেতাজি দাস দয়াপরবশ হয়ে অফিস ছাড়বার আগে আমাকে একটা পাটের হ্যান্ডব্যাগ দিয়ে দিয়েছে। বড় আশা করে ওর পিতৃদেব নেতাজি নামটা দিয়েছিলেন, কিন্তু ফাইফরমাশ খাটার চাপরাশি হয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মতনই কটক থেকে বহুবছর আগে কলকাতায় এসেছিল।

মিনিবাসে মাল নিয়ে ওঠা গেল না। তাই বাধ্য হয়ে আমি আজ একটা মিটার ট্যাক্সি করেছি। প্রত্যেকটা ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়িটা থমকে দাঁড়াচ্ছে আর প্রতিবারই মিটারটা লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় যারা ট্যাক্সি নিয়মিত চড়ে তাদের হার্ট অ্যাটাকের চান্স খুব বেশি—ভীষণ ধকল দেয় ওই মিটারটা। নেতাজি দাস আমাকে বলে দিয়েছে, ট্যাক্সি চড়তে

গেলে অঙ্কে খুব স্ট্রং হওয়া দরকার। যা উঠবে মিটারে তা প্রথমে ডবল করতে হবে, তারপর দশ শতাংশ যোগ করতে হবে, তারপর কোনও কারণে আবার দশ শতাংশ যোগ দিতে হবে, তবে সঠিক হিসেব পাওয়া যাবে। এসবের মধ্যে আমি যাইনি কখনও। বেয়ারা হলেও নেতাজি দাস কোম্পানির মালপত্তর নিয়ে মাঝে মাঝে ট্যাক্সি চড়ে।

বাড়ি এসে আমি সহকর্মীদের উপহার প্যাকেট খুলেছি। একটা সুদৃশ্য ফোল্ডিং ছাতা দিয়েছে—মেড ইন চায়না। একটা ট্র্যাভেল ক্লক দিয়েছে, আর দিয়েছে একখানা বই। সেটার প্যাকেট এখনও খোলা হয়নি। নেতাজি দাস আজ অবশিষ্ট সিঙাড়া ও সন্দেশগুলোও বাক্সে প্যাক করে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে।

আরও একটা বাক্স রয়েছে—তার মধ্যে আছে বাটা কোম্পানির টি-শার্ট আর একজোড়া শাদা রানিং সু।

একসময় আমাদের অপিসে রিটায়ারের সময় উপহার দেওয়া হতো লাঠি, টুপি আর জগদীশ ঘোষের গীতা। এখন সবাই বলছে, অফিস ছুটি দিয়েছে বলে বিছানায় বসে থেকো না, হাঁটো-হাঁটো-হাঁটো। ওয়াকিং স্টিক নয়, জোরে হাঁটবার জন্যে পরে নাও স্পিড সু। বইয়ের প্যাকেটটা খুললাম। জগদীশ ঘোষের গীতা নয়। গীতা বড্ড শক্ত, সবাই কেনে, কেউ পড়ে না সাধু-সন্ন্যাসী ছাড়া, তাই মরবার সময় খাটে দিয়ে দেয়। মরার পরে তো মানুষের অঢেল সময়, তখন মন দিয়ে গীতা পড়ার শ্রেষ্ঠ সময়। আমার সহকর্মীরা গীতার বদলে দিয়েছে উদ্বোধন প্রকাশিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত অখণ্ড সংস্করণ।

একবার আমার জানাশোনা এক সন্ন্যাসী রসিকতা করে বলেছিলেন, "মশাই, মেড্-ইজির যুগে বাস করছি আমরা। সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রের সংক্ষিপ্তসার যেমন এই গীতা, তেমন গীতার শ্রেষ্ঠ মানে-বই হচ্ছে শ্রীমকথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।"

যখন বাড়ি ফিরে এলাম তখন উপাসনা অনুপস্থিত। উপাসনা গিয়েছে

নিজের পিসিমার বাৎসরিকে। গিয়েছে সেই সাত সকালে কিন্তু এখনও ফেরবার নাম নেই। মরেও সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক হাঙ্গামা থেকে মুক্তি নেই—প্রথমে ডেথ সার্টিফিকেট যোগাড় হোক, তারপর সৎকার সমিতির গাড়িতে চড়ো, ইলেকট্রিক চুল্লির সামনে লাইন দিয়ে শুয়ে থাকো, তারপর ভস্মীভূত হয়ে ছাইয়ের আকারে আদিগঙ্গা খালের পলিউশন বাড়াও। এরপর আবার শ্রাদ্ধসংস্কার। এক বছর পরে আবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। তারপর আবার গয়াধামের টিকিটকাটা, যে মরে গিয়েছে সেও পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিয়ে অধীর অপেক্ষায় রয়েছেন পিণ্ডভোজনের জন্য। উপাসনা পরম ধৈর্যসহকারে আত্মীয়স্বজনদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহঘটিত সবরকম সামাজিকতা সামাল দেয়। আমি কখনও এসব পারিনি। এতোদিন আমার যুক্তি ছিল, আমি অফিসের কাজে ভীষণ ব্যস্ত। অথচ অফিসে তেমন কাজ তো কিছু করিনি—স্রেফ কর্তাদের হুকুম তালিম করেছি—হিঁয়া কো মাটি হুঁয়া, হুঁয়াকে মাটি হিঁয়া ফেলেছি সিনিয়রদের মর্জিমাফিক।

মদীয় সহধর্মিণী উপাসনা বড় সাইজের টিফিন কেরিয়ার হাতে বাড়ি ফিরে এল একটু দেরিতে। প্রয়াত পিসিমার ভাগ্যহীন সন্তানরা যে অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত জামায়ের জন্যে বেশ খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে তা আন্দাজ করতে পারছি। উপাসনার পিসিমাও এই রকম ছিলেন। কাজের বাড়িতে কেউ উপস্থিত না থাকলে টিফিন কেরিয়ারের খোঁজ করতেন। ধন্য এই বাঙালি পিসিমা, মাসিমা, কাকিমারা—কারণে অকারণে অপরকে খাইয়ে নিজেরা ফতুর হবার জন্যেই যেন এঁরা ধরায় আসেন। বাঙালিরা এখনও এঁদের মর্ম বোঝেনি, বুঝবে যখন এক প্রজন্মের বাঙালি হঠাৎ সামাজিকতায় তিতিবিরক্ত হয়ে লোক-খাওয়ানো বন্ধ করে দেবে। হালুইকর, কেটারিং কোম্পানি আর প্যান্ডালওয়ালা ছাড়া এতে বাঙালি জাতের লাভ বই লোকসান হবে না।

টেবিলের ওপর ছড়ানো উপহার প্যাকেটগুলো দেখেই উপাসনা ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিল। শান্তভাবে সে বললো, "তোমার কথা শুনল না। ওই ধাওয়ান লোকটা সুবিধের নয়।"

"আজ কিন্তু খুব ভাল ব্যবহার করেছে সবাই। ধাওয়ান পাঁচ মিনিট স্পিচ দিল।"

"স্পিচ!" উপাসনা আমার মুখ চেয়েই বোধ হয় আর কোনও কঠিন মন্তব্য করলো না।

"জানো উপাসনা, অফিসের সবাই চাঁদা করে জিনিসগুলো কিনেছে। ওরা আর কত কিনবে? এই ক'মাসে একের পর এক কত মানুষ চলে গেল।"

উপাসনার ধারণা অফিসে আমি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছি, কিন্তু স্বীকৃতি পাইনি কর্মক্ষেত্রে। তার ধারণা হয়েছে, "খাটাখাটনির কোনও দাম নেই।"

আমি তবু জানালাম, "ধাওয়ান সায়েব স্পিচে বললেন, আমরা সবাই একটা পরিবারের সভ্য।"

বিরক্ত উপাসনার মন্তব্য : "রাখো! তোমার ধাওয়ান সায়েবকে বলো, কোনও ফ্যামিলিতে পরিবারের সভ্যকে আচমকা বাইরে বার করে দেওয়া হয় না।"

আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, তবু ওরা যথেষ্ট ভদ্রতা করেছে। ইচ্ছে করলে, ফাংশন না করতে পারতো।

এটা যে রিটায়ারমেন্ট নয়, অন্য কিছু তা উপাসনা বেশ বুঝছে। অপমানটা ওর গায়েও লেগেছে।

"ফল পাকলে বোঁটা ছিঁড়ে গাছ থেকে পড়ে যায়, উপাসনা।" আমি আস্তে আস্তে ওকে বললাম।

"আধপাকা ফলকেও খোঁচা দিয়ে নামিয়ে নেওয়া যায়!" এই বলে উপাসনা স্নানঘরে চলে গেল। ওখান থেকে বেরিয়ে পাকা পনেরো মিনিট সে ঠাকুরঘরে একলা বসে থাকবে এবং মেঝেতে মাথা ঠুকবে।

আর খাবার টেবিলে নিজের চেয়ারে বসে আমি ভাবছি, ভি-আর-এস কথাটা নোংরা। সময় হবার আগেই আমার কর্মকেন্দ্র আমাকে বাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে, এর থেকে অপমানের কী আছে! স্নানঘরে যাবার আগে উপাসনা হিসেব করেছে, আমার আরও আড়াই বছর চাকরির মেয়াদ ছিল।

ধাওয়ান সায়েব মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "বিশ্বাস, খুব ভাল প্যাকেজ দিচ্ছে কোম্পানি, নিয়ে নাও। কখন লক-আউট ক্লোজার কিছু একটা হয়ে যায় তার ঠিক নেই।"

উপাসনার বক্তব্য স্পষ্ট : "টাকাটা বড় কথা নয়। কিন্তু এই কালো দাগ। পাকা নয়, ঝড়ে-পড়া আম, সময় হবার আগেই মাটিতে আছড়ে পড়েছে। মস্ত অপমান।"

উত্তরের অপেক্ষা না-করে উপাসনা স্নানঘরে ঢুকে গিয়েছে। এখন আমি অন্য কথা ভাবছি। "উপাসনা, রাগ করছি বটে, আবার করছিও না!" আমার দূরদর্শী জ্যাঠামশাই জীবনের শুরুতেই পাঁচটা বছর হিসেবের গোলমাল করে দিয়েছিলেন। এখন ধাওয়ান ক্ষতি করার চেষ্টা করলো, কিন্তু দুধে হাত পড়লো না! থ্যাংকস টু জ্যাঠামশাই, এখনও আমি আড়াই বছর গেনার।

আজ সন্ধে থেকে আমি একটু দার্শনিক হয়ে যাচ্ছি—হাতের গোড়ায় পড়ে থাকা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত না পড়েই। হিসেবের খাতায় জমা পড়লেই কোথাও কোনও দিন একটা খরচও হবে। অথবা আগাম কিছু খরচ করলেই একদিন হিসেবের খাতায় কিছু জমা দিতেই হবে।

কাউকে যখন বলি, আগেকার যুগে এদেশের মানুষ অনেক সৎ ছিল, তখন আজকালকার ছেলেরা মিটিমিটি করে হাসে। তাদের যেসব সিনিয়র উপদেষ্টা আছেন তাঁরাও মজা পান। তাঁদের আশঙ্কা, জন্ম, কর্মসন্ধান, বিবাহ সবেতেই এ দেশে ভেজাল ছিল, শুধু মৃত্যু ছাড়া। বিয়েতে কুষ্ঠির ব্যাপারটা ধরুন না—পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী পাত্র এবং পাত্রীর বয়স ও জন্মলগ্ন যে গণকঠাকুররা কতবার পাল্টাতেন তার ঠিক ছিল না।

কিন্তু ব্যাপারটা চাপা থাকতো, দু'নম্বরি ব্যাপারগুলো হুট করে ওপরে ভেসে উঠতো না। তাই উপাসনা আমার স্বীকারোক্তিতে বোধ হয় সুখী হলো না। স্নানঘর থেকে বেরিয়েই সে হঠাৎ বললো, "জুতোটা টেবিলে রেখে দিয়েছো, ঠাকুরের বইয়ের সঙ্গে!"

পায়ে না পরা পর্যন্ত জুতোর জাত যায় না একথা কোথায় যেন পড়েছিলাম। কিন্তু সেকথা উপাসনাকে বলি কী করে?

উপাসনা বোধ হয় বলতে চাইছে, অপমান করে ওরা তোমাকে জুতো দান করেছে।

আমি ভাবছি, ঠাকুর এ সংসারে কারওর দোষ দেখবো না আর। লাঠি না দিয়ে আমাকে ওরা স্পিড শু উপহার দিল কেন? ম্যানেজমেন্ট ও সহকর্মীরা নিশ্চয় চায়, রিটায়ার হয়েছি বলে আমি যেন অচল না হই। ওই যে কোনকালে এদেশের মুনিঋষিরা বুঝে গিয়েছেন, চলমান থাকাটাই জীবন। যার গতি স্তব্ধ তার খেলা অবশ্যই খতম। অতএব চরৈবেতি, চরৈবেতি।

ঘুম থেকে উঠে নিজেকে থার্ড পার্সন সিংগুলার নাম্বার হিসেবে দেখছি! আমার চোখের সামনেই বলরাম বিশ্বাস নড়াচড়া করছে! গতকাল রাতে ঘড়িটার কথা স্বেচ্ছা-অবসরপ্রাপ্ত বলরাম বিশ্বাসের মাথায় তেমনভাবে ঢোকেনি।

উপহারের মোড়ক খুলেই কোয়ার্টজ ঘড়িটা চালু করা হয়েছিল। গেরস্তর সংসারে যখন এসেছে তখন খেটে মরুক। বিশ্বসংসারের সবাই যখন বিশ্রাম নেয়, তখনও মিস্টাব টাইটানের ছুটি থাকে না। যে বাড়িতে সময়ের কোনও ভূমিকা থাকছে না সেখানেও ঘড়ি তুমি খেটে মরো, ছুটে চলো, ছুটে চলো।

আজ অবাক কাণ্ড! অন্যদিন সকালে এই বলরাম বিশ্বাসের চোখে ঘুম জড়িয়ে থাকে, বিছানা ছেড়ে উঠে বসতে ইচ্ছে করে না, অফিসের সময়ের কথা ভেবে ব্যস্ত উপাসনা ঘন ঘন তাগাদা লাগায়। এই ভগবতীতনুকে অফিসের উপযোগী করে তুলবার জন্যে একজন পুরুষকে সকালে যে কতো কাজ করতে হয়। বিশেষ করে এই দাড়ি কামানো। [ইন্ডিয়া এখনও দাড়িকামানোর যন্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়নি, যেমন তৈরি করতে পারেনি ফাউন্টেন পেন।] সাধে কি আর প্রাচীনকালের ঋষিদের ছবিতে সব সময় একমুখ দাড়ি দেখতে পাওয়া যায়!

আজ কিন্তু সাত সকালে বলরাম বিশ্বাসের ঘুম ভেঙে গিয়েছে।

উপাসনাও অবাক হয়ে গেল, তার আগে আমি শয্যাত্যাগ করেছি অথচ দাড়ি কামাইনি।

এখন থেকে আমি প্রতিদিন দাড়ি কামাবো না শুনে ভীষণ রেগে উঠলো উপাসনা। "পাগলামো কোরো না। ইন্ডিয়ার প্রত্যেক পুরুষমানুষ যদি ডেলি শেভিং বন্ধ করে দেয় তা হলে শেভিং ব্লেড কোম্পানিগুলোর কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ!"

আজ সকালে সত্যিই এক অদ্ভুত পরিস্থিতি—সকাল থেকে উঠে ফিটফাট হওয়া, স্নান করা তো সম্ভব। কিন্তু যার জন্যে এইসব প্রস্তুতি তা তো উধাও। অফিস যাবার সুযোগ তো আর নেই। রিপন স্ট্রিটে দরজার কাছে রাখা অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টারের রক্তচক্ষুও নেই।

অন্যদিন সকাল আটটায় আমি ঝটপট গরম ভাত খাই। গরমের চোটে কপালে একটু অনিচ্ছার ঘাম জমে, কিন্তু তাকে ডোন্ট কেয়ার করে দ্রুত পদক্ষেপে রওনা দিই মিনির উদ্দেশে। এই মিনি না থাকলে ম্যাক্সি কষ্টে পড়ে যেত অর্ধেক কলকাতা, যতই দুষ্টজনরা বলুক শহরের সমস্ত স্পন্ডিলাইটিস এই মিনির সুবাদে। আসলে, পুরো বাঙালি জাতকে ঘাড় নিচু করতে শেখাল মিনি—মাথা উঁচু করে বীরত্ব দেখাতে গিয়ে বহু বছর অকারণে অনেক ভুগেছে এই বাঙালি জাত। ধড়ের ওপর মাথা উঁচু থাকলেই আত্মসম্মানওয়ালা জাত যে হয় না, তার প্রমাণ নতমস্তক জাপানিরা। আমাদের রিপন স্ট্রিটের অফিসে যত জাপানি এসেছে সব বিনয়াবনত! অথচ কোটিপতি—আমার মাথা নত করে দাও চরণধূলির পরে, কিন্তু আমার কোম্পানির মাল কেনো, প্রচুর অর্ডার দাও, তবেই আমার কোম্পানির প্রফিট মুনাফা নিশ্চিত হবে।

আজ গরম ভাতের বদলে দু'পিস গরম পাঁউরুটি দিয়েছে উপাসনা। ওকে বলবার কিছু নেই। বৃদ্ধ বয়সের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে পাক্ষিক গৃহবধূ পত্রিকায় ইদানীং মস্ত আর্টিকেল বেরিয়েছে—বড় বড় ডাক্তার চিবিয়ে চিবিয়ে বড় বড় কথা বলেছেন। ইদানীং আবার হোমিওপ্যাথ, হকিম এবং 'ভৈদ'রা জাতে উঠেছেন, বড় বড় কাগজে বিলিতি ডিগ্রিওয়ালাদের

পাশাপাশি এঁদেরও ছবি এবং উপদেশ সগৌরবে ছাপা হচ্ছে। উপাসনাও এইসব মাঙ্গলিক ম্যাগাজিন থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে আগ্রহিণী হয়ে উঠেছে। তাই আমার সামনে গরম পাঁউরুটি আছে, কিন্তু মাখন নেই। সাত সকালে ড্রাই টোস্ট কেন রে বাবা? বলরাম বিশ্বাসের মাস্থলি স্যালারি আর আসবে না বলে? রিটায়ার করা মানেই কি বুড়ো হয়ে যাওয়া? গতকাল পর্যন্ত তো বিশ্বসংসারে কারওর মনে হয়নি এই বাড়িতে বলরাম বিশ্বাস নামে একজন বুড়ো আছে।

সকাল আটটায় কলকাতাইয়া বাঙালির পেটে গরম ভাতের একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে। একবার ভেবেছিলাম উপাসনাকে বলি, হুট করে ওটা বন্ধ করো না। একটু সময় নাও উপাসনা, পৃথিবীর বড় বড় পরিবর্তনগুলো ধীরে ধীরে হয়, সইয়ে সইয়ে হয়, তাই ফল হয় দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু আমার গৃহিণীকে বলে লাভ নেই, পাক্ষিক গৃহবধূ পত্রিকায় যা লেখা হয় তা এ যুগের মেয়েরা স্বামীর কথার থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। আসলে, আমার অফিসের অবস্থার আগাম আঁচ পেয়ে উপাসনা ক'দিন ধরেই প্রস্তুত হচ্ছে, বাড়িতে বসে থাকা একজন প্রবীণ কর্মহীন লোককে কী ভাবে পরিচর্যা করতে হবে। যে বাঘ এতোদিন কর্ম-অরণ্যে নিজের ইচ্ছেয চরে বেড়িয়েছে সে এখন বিধবা হয়ে চাকরির নোয়া খুইয়ে খাঁচায় বন্দি থাকার জন্যে ঘরে ফিরে আসছে। তাকে তো একটু অন্যভাবে রাখতেই হবে। বনের বাঘ আর চিড়িয়াখানার বাঘ তো এক নয়!

ঘড়িতে ন'টা বাজতেই ইওরস ফেথফুলি বলরাম বিশ্বাসের পৈত্রিক শরীরটা কেমন আনচান করে উঠলো। ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়বার জন্যে একটা ব্যাকুলতা সমস্ত শরীরে অনুভব করছি। উপাসনা বোধ হয় দূর থেকে আমার হাবভাব লক্ষ্য করেই বললো, "যাও না একটু ঘুরে এসো।"

অতএব বাড়ি ছেড়ে আমি রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি। কিন্তু অন্য দিনের তুলনায় যেন কোথায় কিছু পার্থক্য থেকে যাচ্ছে। এতদিন যখন অফিস বেরিয়েছি তখন তো এই অনুভবটা আদৌ ছিল না।

কলকাতার রাস্তা দিয়ে আমি একা হাঁটছি না। আরও অনেক যাত্রী রয়েছেন। তাঁদের অনেকে ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন—এঁদের মুখ দেখলেই বোঝা যায় কর্মক্ষেত্রে লেট মার্কা হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। সময়ানুবর্তিতার দিকে আজকাল সব প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের অত্যধিক নজর। অথচ উত্তর ভারতের কাউবেল্টে এখনও অনেক শহর আছে যেখানে ন'টা বললে কেউ সাড়ে ন'টার আগে হাজির হবার কথা স্বপ্নেও ভাবে না। আবার মুমবাই বাঙ্গালোর চেন্নাই শহরের ওয়ার্ক কালচার আলাদা—ওখানে সাড়ে ন'টা মানে ন'টা বেজে তিরিশ মিনিট। কলকাতায় এখনও ন'টা মানে বড় জোর ন'টা বেজে পনেরো মিনিট। তাই রাস্তার মোড়ে দাঁড়ালে অফিসমুখো যাত্রীদের ঘন ঘন হাতঘড়ির সঙ্গে পরামর্শ করতে দেখা যায়। কিন্তু, ওরে বাছা, কর্মক্ষেত্রে পৌঁছে সেই তো হাফ-বেকার অবস্থা। ক'টা লোকের অফিসে কী কাজ আছে তা এই বলরাম বিশ্বাসের জানতে বাকি নেই! এতো কাজ থাকলে রিপন স্ট্রিট থেকে

আড়াই বছর আগে চলে আসার কোনও দরকার হতো না।

আমি এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি সাক্ষীগোপালের মতন। আমার মণিবন্ধে রিস্টওয়াচ বাঁধা আছে। অভ্যাসের বশে ঘড়ির দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়েও নিচ্ছি, কিন্তু তবু কলকাতার কাজের মানুষের জনস্রোত থেকে আমি যে আলাদা হয়ে পড়েছি তা একটু একটু করে হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে।

"হ্যালো, হ্যালো বলরামবাবু! আজ আপিসে যাচ্ছেন না? ছুটি নিয়েছেন বুঝি?" মিনিবাসের ওপর বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ার তৎপরতার অভাব দেখেই বোধ হয় একজন অর্ধপরিচিত সহযাত্রী প্রশ্ন করলেন।

মহা মুশকিলে পড়ে একগাল হাসলাম। ছুটি নিইনি, কর্তৃপক্ষ আমাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে বলতে কেমন যেন সঙ্কোচ হলো। অন্য দেশ হলে হয়তো গর্ব করে বলতাম, এখন থেকে বলরাম বিশ্বাসের চিরছুটি। এই পৃথিবীর জন্যে বহুবছর ধরে বলরাম বিশ্বাস অনেক কাজ করেছে। এবার চুপচাপ বসে থাকা, ইচ্ছে মতন ঘুরে বেড়ানো। কাজের ঘানি থেকে মুক্তি অর্জন করেছে বলরাম বিশ্বাস তার দীর্ঘদিনের লং অ্যান্ড মেরিটোরিয়াস সার্ভিসের সুবাদে।

আমার উত্তর শোনবার জন্যে অফিসযাত্রী ভদ্রলোক অপেক্ষা করেননি। ছিটকে ছুটে গিয়েছেন একটা গড়িয়া-বিবিডি মিনিবাসের দিকে। একটা, বড়জোর দুটো প্যাসেঞ্জারের পা গোঁজবার জায়গা আছে ওই বাহনে। মিনিবাসটা বোধ হয় গত জন্মে কোনও জন্তু ছিল, পূর্বজন্মের সংস্কারে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে, এগোতে যেয়েও যেন এগোচ্ছে না। বৎস মিনি, ভদ্রভাবে দু' সেকেন্ডের জন্যে থামো না। মানুষ একটু স্বস্তি নিয়ে উঠুক—এই শহরের সব মানুষ পি টি ঊষা নয়, যে টুক করে পাদানিতে পা তুলে দেবে।

একটা চিঠি কাগজের সম্পাদককে লিখলে হয়—পৃথিবীর কোনও শহরে মিনিবাসের পাদানি এত উঁচু নয়—একটা বাড়তি স্টেপ থাকলে বিশ্বসংসারের কি ক্ষতি হত বাপধন? আসলে, এই শহরে অনেক গাইয়ে বাজিয়ে জন্মেছেন, কবি জন্মেছেন, দার্শনিক জন্মেছেন, কিন্তু ডিজাইনাররা এই শহরে আজও জন্মগ্রহণ করেননি। অটোমোবাইল প্রযুক্তিতে বাঙালিদের

এক কানাকড়ি দান নেই—এটা বললে গোটা জাতের আঁতে লেগে যাবে।

আর একটা ব্যাপার, মিনিগুলো থামার ভান করেও কেন পুরোপুরি থামে না? এই ছুটলাম এই ছুটলাম ভয় দেখায় বুড়োদের, মেয়েদের, শিশুদের। পৃথিবীর কোনো শহরে বাস ড্রাইভার তো এত ব্যস্ততা দেখায় না! বৎস সারথি, ব্যস্ত হয়ো না। ব্যস্ত হয়ে কোনও লাভ হয় না। কাজের জায়গায় পৌঁছেও লোকের অঢেল সময় থেকে যায়। এত সময় আছে বলেই তো কোম্পানির মালিকরা হাজার হাজার লোককে স্বেচ্ছা অবসর দিয়ে বিদেয় করতে চায়।

দূর। যেমন মানুষ, তার তেমন ভাবনা! এতোদিন এই বলরাম বিশ্বাস নিত্যযাত্রীর সংগ্রাম করেছে প্রতি সকালে, নিয়মিত অফিস পৌঁছনো এবং ওখানকার সময় শাসন ও নির্দেশিকা মেনে চলা ছাড়া আর কোনও ভাবনা ছিল না।

কিন্তু আজ সকালে রাস্তার চেনা-জানা মানুষরাও আমাকে দেখে তেমন যেন ব্যস্ত হচ্ছেন না। দুনিয়ার কোথাও তো এখনও রটে যায়নি যে বলরাম বিশ্বাস চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন—দলছুট হয়েছেন তিনি। ব্যাপারটা কিভাবে ঘটলো কে জানে? ট্রামরাস্তার ধারে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে রহস্যটা আমার কাছে উদঘাটন হল। এই পৃথিবীতে জামাকাপড়ই মানুষের অর্ধেক কথা নিঃশব্দে ফাঁস করে দেয়। সাধে কি আর এদেশের সন্ন্যাসীরা আত্মশ্রাদ্ধ করেই গেরুয়ার আশ্রয় নেয়! সাধে কি স্বামীহারা হয়ে রং বিসর্জন দিয়ে সাদা কাপড়ে যোগিনীর রূপ নেয় মেয়েরা। বলরাম বিশ্বাস যে আজ শার্ট-প্যান্ট এবং বেল্ট পরেনি তা দুনিয়ার সবাই দেখতে পাচ্ছে। হাফ হাতা শাদা পাঞ্জাবি পরেই আমি রাস্তায় বেরিয়ে এসেছি এবং সমস্ত পৃথিবী ঝটপট সিগন্যাল পেয়ে গিয়েছে আমি আর যেখানেই যাই আজ কিছুতেই অফিসমুখো হচ্ছি না।

অবস্থাটা মোটেই ভাল লাগছে না আমার। এই শহরের জন-অরণ্যে হারিয়ে যাবার জন্যে আমি একটা মিনিবাসে উঠে পড়তে চাই। কিন্তু মিনির কনডাক্টরদেরও কি তৃতীয় নয়ন আছে? মানুষ দেখেই কোথায় যেতে চায়,

কেন যেতে চায় সব ওরা বুঝতে পারে। যারা কাজে যাচ্ছে বিশ্বসংসার যে এখনও তাদের একটু বাড়তি খাতির করে তা বুঝতে পারছি এই সকালে। অফিস যাত্রী ছাড়াও আরও কিছু যাত্রী বাসে রয়েছেন। আমার পিছনেই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, সঙ্গে বোধহয় স্ত্রী। এই বয়সের মানুষ চাকরি করেন না, কিন্তু চাকরি না থাকলেও পথে বেরুতে হয়। বৃদ্ধ ভদ্রলোক অল্প জলে রাখা গড়িয়াহাট মার্কেটের কই-এর মতন খলবল করছেন। কারণ তাঁর নেমে পড়ার জায়গা এসে গিয়েছে। কিন্তু মেজাজী মিনিবাস কোন স্টপ পেরিয়ে কোথায় উপস্থিত হয়েছে তা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। আমিও এবার বাস থেকে নেমে পড়তে চাই, রাস্তায় মজায় ভিড়, বাসে ওঠার জন্যে তাঁরা ব্যাকুল। শুধু শুধু আর একজন যাত্রী যার হাজিরা দেবার তাগিদ আছে তাকে বঞ্চিত করে লাভ নেই।

আমি তো মাত্র একদিনের পেনসনার, আমার গায়ে এখনও কেজো লোকের ছাপ রয়েছে। আমি সহযাত্রীদের প্রয়োজনীয় চাপচোপ দিয়ে এবার রাস্তায় নেমে পড়লাম। এরপর কনডাক্টর সায়েবের লীলাখেলা। প্রথমে সে ওই নার্ভাস বুড়ো ভদ্রলোককে গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিতে উৎসাহ দিল, তারপর সতীসাধ্বী যখন একই কায়দায় ভূমিস্পর্শ করলেন তখন তাঁর পক্ষে তাল রাখা শক্ত হল। আমি এগিয়ে এসে পরনারীর হস্তস্পর্শ করে তাঁকে টেনে তুললাম। ভাগ্যি ভাল, পিছনের অটো এসে এই অসহায় বৃদ্ধ দম্পতিকে গুঁতো মারেনি। অটোড্রাইভার ছোকরা বললে, এর একটাই ওষুধ আছে, সব মিনিড্রাইভারকে রাতারাতি অটোড্রাইভার করে দেওয়া। সব রোয়াব একদিনে কিসমিস হয়ে যাবে।

কিন্তু তা হলে মিনি চালাবে কারা? এতবড় ম্যানেজমেন্ট সমস্যা ছোকরা অটোড্রাইভার এক কথায় সমাধান করে দিল। "মিনি চালাবে অটো-ড্রাইভাররা! ওদেরও লাইসিন নেই, আমাদেরও লাইসিন নেই—সব দু'নম্বরি কারবার!"

অটো আর এগোবে না। ড্রাইভার বলছে, "আর বোকা সাজবেন না দাদু! বেলতলার দালালদের ঠিকমতন পেন্নামি দিলে ওরা আমাকে দমদম

এয়ারপোর্টে পাইলটের লাইসিন এনে দেবে!"

আমার হাতে তো যথেষ্ট সময় রয়েছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর নিজস্ব গৃহিণীর শরীরে হাল্কা চপেটাঘাত করে পায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছ।

দিনদুপুরে হাজার হাজার লোকের সামনে কী অন্যায়। অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও এই বৃদ্ধ দম্পতিকে দুর্বিনীত মিনি তিন স্টপেজ বেশি নিয়ে চলে এসেছে। একে ভদ্রলোকের পায়ে বাতের ব্যথা। কিন্তু যারা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা সহানুভূতি দেখানো তো দূরের কথা বৃদ্ধকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। ওঁর নাকি কম খরচে বেশি ভ্রমণ হয়ে গিয়েছে, লোকসান হয়েছে মিনিমালিকের।

আর অটোরিকশার ছোঁড়াটা নিজের পাবলিসিটি করছে, "দুটো পয়সা বাঁচাতে গিয়ে নিজের জানটা বাঁচাতে পারবেন না স্যর। কেন আপনারা মিনিতে ওঠেন? রাস্তায় অটোর তো অভাব নেই। সেবা করবে অটো, খেটে মরবে অটো, আর প্যাসেঞ্জার তুলে নিয়ে লাল হবে মিনি। গরমেন্ট তো ওদের ঘরজামাই করে রেখেছে, জাম রঙের বডি দিয়েছে, পুরো লাল হতে আর কতক্ষণ?"

"তুমি কী বলতে চাইছ ভাই?" অটোড্রাইভারকে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করে বসলাম আমি।

"এই দেখুন না, উল্টো রাস্তায় এখন অটো পাবে না প্যাসেঞ্জার। অথচ আমাদের ওয়েটিং চার্জও নেই! একদিন কিন্তু রিকশা, অটো আর আরশোলা ছাড়া চালুমাল কিছুই থাকবে না এই ক্যালকাটায়। আমার এই গাড়িতে চড়েই সেদিন একজন মেমসায়েব বলেছেন। ভদ্রমহিলা মশাই আমাকে দশটাকার নতুন নোট দিয়ে খুচরো ফেরত নেননি, ছবি তুলেছিলেন গাড়ির, দু'দিন পরে আমাকে স্ট্যান্ডে এসে নিজের হাতে উপহার দিয়ে গিয়েছেন। পাসপোর্ট থাকলে কবে স্যর চলে যেতাম ফরেনে! আর ফিরতাম না।"

সস্ত্রীক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তখনও দিশেহারা। শুধু আজকে নয় আরও দু'দিন

মিনিকন্ডাক্টর তাঁকে তিনটে স্টপেজ বাড়তি টেনে নিয়ে গিয়েছে, তাঁকে নিয়ে তখনও সবাই হাসাহাসি করেছে। কোমরের ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা তো চোখে দেখা যায় না, যে ভুগছে সেই কেবল জানে।

কলকাতা শহরে নতুন এসেছেন ওঁরা। সারাজীবন রাউরকেল্লার শিল্পনগরীতে কাটিয়েছেন—ট্র্যাফিক জ্যাম, বন্‌ধ, ওয়াটার লগিং এসব এখনও ঠিকমতন বোঝেন না। দুর্বিনীত মিনির নম্বরটা লিখে নিয়েছিলাম। ওঁকে বললাম, আজই একটা পিটিশন ঠুকে দিন।

ভদ্রলোক অবাক। আগে যেখানে থাকতেন সেখানে পিটিশনে কোনও কাজ হয় না।

আমি বললাম, "এখানে হয় আমি বলছি না, কিন্তু এইটুকুই তো জনগণের হাতের মধ্যে রয়েছে। মিনিবাসের দুষ্টুমি রিপোর্ট করবার আগে লিখে দেবেন, আপনি একজন সিনিয়র সিটিজান।"

সিনিয়রিটির ব্যাপারটা আগে ঠিক বোধগম্য ছিল না। সেবার ভবেশ খাস্তগিরের দয়ায় ব্যাপারটা জেনেছিলাম। বললাম, "আজকাল বুড়ো কথাটা কেউ পছন্দ করে না, মনে করে এটা একটা ইনসাল্ট। এখন যারা এই দুনিয়া থেকে যাবার জন্যে একপা বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের নতুন নাম হয়েছে সিনিয়র সিটিজান। ওঁদের একটা সমিতিও আছে। মিস্টার ভবেশ খাস্তগির ওখানকার একজন কর্তাব্যক্তি। খুব আশাবাদী লোক। আমাকে বলেছিলেন, সিনিয়রমোস্ট একজন সিটিজান তেইশ বছর এই রাজ্য চালিয়েছেন। কেন্দ্রেও তো সিনিয়রদের দাপট অনেকদিনের। সুতরাং বয়োজ্যেষ্ঠরা এবার সুবিচার পেতে বাধ্য।"

ভবেশ খাস্তগিরের ঠিকানাটা আমার অফিসের ভিজিটিং কার্ডের পিছনে লিখে ওঁর হাতে দিয়ে বললাম, "ছাড়বেন না। এযুগে সংগ্রামই জীবন। ভবেশদা আপনার হয়ে সব লিখে দেবেন গরমেন্টের কাছে। ভবেশদার ধারণা, তীব্র প্রতিবাদ করতে করতে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বৃদ্ধ দম্পতি এখন যাচ্ছেন রক্তপরীক্ষা করাতে। তারপর যাবেন ওঁরা পুরনো আধাসরকারি আপিসে পি.এফ-এর তদ্বির করতে, তারপর হাজিরা

দেবেন আত্মীয়ের বাড়িতে। বুড়ো হয়ে অবসর নিয়েও কাজের কোনও কমতি নেই ভদ্রলোকের। ব্যাংক, পোস্টাপিস, হেড অফিস, রিজিওন্যাল অফিস, সবাই কিছু না কিছু কাগুজে গোলমাল পাকিয়ে বসে আছে। অথচ সংবাদপত্রে নিত্যঘোষণা ইন্ডিয়াতে এসব সমস্যার ঝাড়েবংশে উৎখাত হয়ে গিয়েছে। এখন বিশ্বায়নের যুগ, ইন্টারনেটের যুগ, পুরো ওয়ার্লড হাসিমুখে আপনার খিড়কিতে হাজির হয়েছে।

ফেরার সময় মিনিবাসে চড়ার আগ্রহ হলো না এই অধমের। বাসে চড়ে এই তো কয়েকটা মাত্র স্টপেজ এসেছি। শরীরকে অযথা সুখ দিতে গিয়ে মিনিবাসওয়ালাকে বড়লোক করার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া এবার বাজে খরচ কমাতে হবে, কথায় কথায় মানিব্যাগ থেকে পাঁচটাকার কয়েন বার করা চলবে না। আমার তহবিলে একটা দু'টাকার এবং একটা পাঁচটাকার নোট বহুদিন পড়ে আছে। যা পচাপাচকো অবস্থা, কেউ হাসিমুখে নিতে চায় না। প্রতিবারই ঝগড়ঝাঁটি বেধে যায়। দু'বার জিনিস কিনে এই নোটের বিনিময়সংক্রান্ত মতভেদে মাল ফিরিয়ে দিয়েছি। আমাদের আপিসের চুকলি চাটুজ্যে বলেছিল, আর ক'টা দিন ধৈর্য ধরে পকেটে রেখে দিন, ক্যালকাটা কর্পোরেশন টাউন হলে সংগ্রহশালা খুলছে, পুরনো নোট তখন মোটা দামে বিক্রি হয়ে যাবে!

আমি বাড়িমুখো হয়েছি, হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি, রিটায়ার করা বলরাম বিশ্বাস আর এই পচা নোটের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। আইনত দুটোই চালু অবস্থায় আছে, কিন্তু সংসারে সমাজে এদের নেবার কেউ নেই। সংসারে এদের চালু রাখতে গেলেই চুলোচুলি!

সত্যিই চাকরি থেকে আমি যে অবসর নিয়েছি তা বোকা শরীরটা বোধ হয় এতোক্ষণে আন্দাজ করতে পেরেছে! না হলে, এইটুকু ঘোরাঘুরিতেই কিছুক্ষণ থামতে চাইছে কেন? অথচ চিরকাল শুনেছি, শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়। রিটায়ারের পর সব নিয়ম বোধহয় উল্টো, খেয়ালী শরীরমহাশয় যা চাইবেন না তা করাতে গেলেই বিপদ ডেকে আনা। অতএব চলতে চলতে থামা, থামতে থামতে চলা। কিন্তু এও এক

অদ্ভুত অবস্থা। তুমিই কোচোয়ান, তুমিই ঘোড়া। তুমিই ঘোড়াকে হ্যাট হ্যাট করো, আবার ঘোড়ার মেজাজ বুঝে ব্যবস্থা নাও, প্রয়োজনে থমকে দাঁড়াও, দরকার হলে বুঝলে নিজেকে ঘাসপানি দাও।

ভারী ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এই শরীরটা। যতদিন চাকরি ছিল, তখন কোম্পানিকে ঘোড়া ভাড়া দেওয়া ছিল, ম্যানেজার এবং মালিক এঁদের ইচ্ছেতেই সারাক্ষণ যাতায়াত। রিটায়ার করার পর পরিস্থিতিটা বেশ জটিল, স্বাধীন হবার পরেই হাজার ঝামেলা!

কোচোয়ান বলছে, আর কতটুকু! চলো হুড়ুক করে নিজের আস্তাবলে ফিরে যাই, ওখানে কোচোয়ানের গিন্নি তোমাকে যথেষ্ট দানাপানি দেবে। ঘোড়া কিন্তু হুকুমটা কানেই নিচ্ছে না! সে বলছে, একটু দাঁড়াই, একটু ঘাড় ফেরাই, আমাকে নিজের খুশিমত চলতে দাও। ঘোটকের তীর্যক মন্তব্য : তোমার মতন কোচোয়ানের পাল্লায় পড়ে সমস্ত জীবনটাই তো নয়ছয় হলো। কোচোয়ান হিসেবে এই মুহূর্তে ভীষণ অপমানিত বোধ করছি। আমার প্রত্যুত্তর : বলরাম বিশ্বাসকে কেন ঘাঁটাচ্ছ বাছাধন? এসব বেয়াড়া কথা তো এতোদিন মুখে আনোনি কখনও? অশ্বরূপ বলরাম বিশ্বাস আমার কথা শুনে ফিক ফিক করে হাসছে, ঘামছে তবু হাসছে, আবার হাসতে হাসতে ঘামছে। এতক্ষণ সে কথা বলেনি এইজন্যে যে গাড়িতে প্যাসেঞ্জার ছিল। প্যাসেঞ্জার থাকলে কলকাতার সব ঘোড়াই সাবধান হয়ে যায়—খদ্দের বিগড়ে কোচোয়ানের ট্যাকে যদি হাত পড়ে তা হলে সমস্যা হাজারগুণ বেড়ে যাবে। বুঝতে পারছি কলকাতার প্রত্যেকটি ঘোড়ার কর্মসংস্কৃতি অর্থাৎ ওয়ার্ক কালচার আছে এখনও প্রবল।

অর্থাৎ বলরাম বিশ্বাসের মাস মাইনের চাকরি না থাকলে তার শরীরটাও ঝটিতি সব বুঝে নিতে চাইছে।

কোচোয়ান বলরাম এতোক্ষণে কিছুটা বাধ্য হয়েই ঘোটক বলরামের কাছে নতিস্বীকার করে ফুটপাথেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়েছে। আজই বেলুড়মঠে পূজ্যপাদ রমানন্দ স্বামীকে একটা লম্বা চিঠি লিখতে হবে। কতবার তিনি বইতে দাগ দিয়ে দিয়েছেন, পইপই করে বলেছেন, ঠাকুরের

পরামর্শ অনুযায়ী নিজেকে দুটো ভাগ করে দেখতে শেখো। একটা তুমি, আত্মা। আর তুমি ঢুকে বসে আছ প্রাণময় শরীরে। মনে রেখো, তোমার শরীর এবং আত্মা কিন্তু এক নয়। একটা স্থায়ী, আর একটা কিছু সময়ের জন্যে। চিরকাল এই শরীর বলবান থাকবে না। সময় শেষ হলেই শরীরটিকে অপরের ঘাড়ে ফেলে রেখে তুমি টুক করে কেটে পড়বে অনন্ত অসীমে। আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার দেহটাকে ডিসপোজ করে দেবার জন্যে তোমার অমন প্রিয় স্ত্রী পুত্র-কন্যারা ব্যাকুল হয়ে উঠবে, এমনকী গোবরছড়া দেবে দেহটা সরে যাবার পরে। তখন তুমি ওপর থেকে কী ভাবছ কে জানে? অথবা কিছুই ভাবছ না—শরীরটা যেন একটা হোটেলঘরের সাময়িক ঠিকানা, চেক-আউট করে, হোটেল লবিতে চাবি জমা দিয়েই, তুমি ঘরের নম্বর ভুলে গিয়েছ। বিশ্বসংসারে চলমান সেলস্‌ম্যান হিসেবে তুমি কত নগরে কত সরাইখানার কত ঘরে সময় কাটিয়েছ তা জাতক ছাড়া কেউ মনে রাখে না।

ঠাকুরের উপদেশ সাধুজনের মুখে এবং বারবার ছাপার অক্ষরে পড়েও এতোদিনে ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। চাকরিতে থাকার সময় একবারও ভাবতে পারিনি, দিস বলরাম বিশ্বাস অফ গুড্‌হাউস ইন্ডিয়া লিমিটেড, দশ নম্বর রিপন স্ট্রিট, একটা অবিচ্ছেদ্য ইউনিট নয়। ভেবেছি ঠাকুরের পবামর্শ ওসব উঁচুতলার উঁচু কথা! যে সময়মত বুঝতে পারে সে পরমহংস এটসেটেরা হয়ে যায়। কিন্তু রমানন্দ মহারাজ বলেছিলেন, ঠাকুর ভাল ব্যাখ্যাই দিয়ে গিয়েছেন, বিশ্বাসমশাই। আমাদের একটা ইউনিট জানে সে অনন্তের অংশীদার, অগ্নি তাকে দগ্ধ করতে পারে না, সে অবিনাশী, আর একটা ইউনিট বলরাম বিশ্বাস নাম নিয়ে বিশ্বসংসারে নিজের খেয়ালে ক'দিনের জন্যে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে।

এবার তা হলে তৃতীয় ফ্যাকড়া বেরুচ্ছে! বলরাম বিশ্বাসের মনরূপ কোচোয়ান, আর দেহরূপ ঘোড়া একই সঙ্গে রাস্তায় নেমেছে সংসারপরিক্রমায়। এক নম্বর ইউনিট অর্থাৎ মিস্টার আত্মা এখন কী করছে কে জানে! যেহেতু আত্মার চাকরি যাবার ভয় নেই, যেহেতু দেহবন্ধন ও

দেহমুক্তি দুয়েতেই তার সমান সুখ, সেহেতু বোধহয় সে একটু কুঁড়ে। সুযোগ পেলেই ঘুমিয়ে থাকে। জেগে থাকলেও সে ঝুটঝামেলায় যেতে চায় না, কোচোয়ান ও ঘোড়া যত খুশি তর্কাতর্কি করুক, অবিনাশী আত্মার তাতে কিছু এসে যায় না।

যাঁরা সত্যকে সন্ধান করেছেন, তার ঠিকানা খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা আত্মাকে তুষ্ট করতেই সারাক্ষণ ব্যস্ত, আর যাঁরা ওই স্তরে পৌঁছতে পারেননি তাঁরা শরীর নিয়েই সন্তুষ্ট। তাঁরা ভাবছে এই মানবদেহ একটা রিকশওয়ালা, অবশ্য যে সারথি সেই বাহন—এই অবস্থায় কোচোয়ান আর ঘোড়াকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি অর্থাৎ বলরাম বিশ্বাস প্রশস্ত রাজপথের যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার পশ্চিম দিকে ইলেকট্রনিক গুড্‌সের ঝকঝকে দোকান। দুটো চকচকে ব্যানার ঝুলছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শো-রুমের সামনে—ওয়ান-ইন-টু, আবার থ্রি-ইন-ওয়ান। অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ম, একের মধ্যে দুই, আবার একের মধ্যে তিন-তিনটি চয়েস নিয়ে বিশ্বসংসারের সেলসম্যান হাঁক দিচ্ছে, আপনি আপনার সাধ্যমতন, পছন্দমতন জিনিস বেছে নিন।

খরিদ্দার মনোরঞ্জনের ম্যাজিশিয়ান দোকানের সিন্ধি ম্যানেজার আমাকেও পাকড়াও করলেন। একটা টু-ইন-ওয়ান যন্তর গছিয়েই ছাড়বেন—বলছেন ক্যাশ টাকাও লাগবে না, আগে ঘরে নিয়ে যান, উপভোগ করুন, তারপর ধীরেসুস্থে কিস্তি গুনুন। আরে ম্যানেজারমশাই, কার পিছনে সময় নষ্ট করছেন? এই ভদ্রলোক যে মুহূর্তে শুনবেন, আমি গতকাল ভি-আর-এস হয়ে গিয়েছি অমনি তাঁর সব উৎসাহ শুকিয়ে যাবে। তখন নগদনারায়ণের কথা তুলবেন, কারণ ভি-আর-এসরা কিস্তি পাওয়ার যোগ্য নয়। সব ব্যাপারটা জানা নেই বলে, ভদ্রলোক সেলস্ টক চালিয়ে যাচ্ছেন, সময়ের অপচয় করে বলরাম বিশ্বাসকে বলে যাচ্ছেন, জাপানিদের নাকটা ঘষে দিয়ে কোরিয়ানরা এখন ইলেকট্রনিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে! ওয়ান-ইন-থ্রি না থাকলে সংসারে কত অসুবিধে। আমি অবশ্য মনে মনে বলছি, মশাই, কেন ভস্মে ঘি ঢালছেন? কিন্তু সিন্ধি সেলস্ ম্যানেজার

ইতিমধ্যেই ঠাণ্ডা পানীয় আনবার ব্যবস্থা করেছেন, ক্যাপ খোলা অবস্থায় কোকাকোলার বোতল উপস্থিত হলো, সুতরাং হাঙ্গামা না বাড়িয়ে দোকানদারের আতিথেয়তা গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলাম। ঠাণ্ডা বোতল হাতে আমি ভাবছি, শুধু থ্রি-ইন-ওয়ান কেন? আমার এই দেশ তো একদিন একমবহুধা সত্যকে হৃদয় থেকে অনুভব করেছে। চব্বিশ ঘণ্টা আগে ভি-আর-এস পাওয়া বলরাম বিশ্বাস অস্তিত্বের জটিলতা ইতিমধ্যেই হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে।

ইলেকট্রনিক দোকানের পাশেই প্রাইভেট এস-টি-ডি বুথ। এই বুথে একদিন ভারতবর্ষ ছেয়ে যাবে—বাড়িতে ফোন না থাকলেও মানুষে মানুষে দূরত্ব অনেকটা ঘুচে যাবে। যে কোনও দূরের মানুষের সঙ্গে কয়েকটা কড়ি ফেলে যোগাযোগ করো।

আমার মনটা হঠাৎ ছটফট করছে রিপন স্ট্রিটের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে। আগে রিপন স্ট্রিট ছিল গলার কাঁটার মতন, আর এখন মনে হচ্ছে, কাঁটা নেমে গিয়েও অস্বস্তি কমেনি। আমি লোকাল কল করব জেনে টেলিফোন বুথের মালিক মোটেই সুখী নয়—যত ইচ্ছে দূরে ফোন করুন—এস-টি-ডি আই-এস-ডি ডায়াল করো, তবে তো সুখ হবে বুথওয়ালার। এই শহরে লোকাল টেলিফোন কল মানেই স্রেফ খেটে মরো কিন্তু পয়সা প্রত্যাশা করো না। আরে বাবা, বিজনেস ইজ বিজনেস। সব জীবকে সমভাবে দেখতে শেখো। বিশ্বসংসারের সকলেই এস-টি-ডি করতে পারে না। এইসব জেনে শুনেই তো লাইসেন্স নিয়েছো বাছাধন।

লোকটা অবশ্য ঝগড়া করলো না, শুধু বললো, "প্লিজ তাড়াতাড়ি কলটা সারবেন, এক একজন লাইন ছাড়তেই চায় না।" নিশ্চয় কথা বলার দরকার থাকে না হলে কে খরচ বাড়াবে? লোকটা বললো, "এ লাইনে সুখ নেই, মশায়। বাড়ির ফোনে যেসব কথা বলা যায় না তা বলবার জন্যে পুরুষমানুষ মেয়েমানুষ সব পাবলিক বুথে ছুটে আসছে। পুলিশও সারাক্ষণ নজর রাখছে—এই তো কদিন আগে প্লেন ড্রেসে এসে একটা মেয়েকে পাকড়াও করল। ভয় দেখিয়ে কার কাছ থেকে পয়সা চাইছিল।"

বুথ অপারেটর আমাকে বলছে, "পুলিশ মশাই আমাকে জিগ্যেস করছে মেয়েটা কতবার ফোন করতে এসেছে? তা মশাই, আমি কি একটাকা আট আনার জন্যে প্রত্যেক খরিদ্দারের ঠিকুজি কুষ্টি লিখে রাখবো? তা পুলিশ মশাই, বিশ্বাস করবে না। সোজা বললো, আমরা নিজের বস্‌কে বিশ্বাস করি না, বাপকে বিশ্বাস করি না, আর তোমার মতন হরিদাস পালকে বিশ্বাস করবো?"

"হ্যাঁ মশাই, হরিদাস পাল লোকটা কে?" জানতে চাইছে বুথের অপারেটর। এই শহরের সব ব্যাপার যে লোকটার ওখনও জানা হয়নি তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আমি মৃদু হেসে বললাম, "আপনি ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন করেছেন। মিস্টার পালকে কেউ কখনও দেখেনি, কিন্তু কেউই আজকাল ওঁকে সম্মান করে না। একসময় নিশ্চয় নামীদামি হোমড়াচোমড়া কেউ ছিলেন।"

রিপন স্ট্রিট অফিসের চুকলি চাটুজ্যেই আমার ফোনটা ধরল। আমার প্রারম্ভিক বক্তব্য : "হ্যালো, তোমরা সবাই ভাল আছ তো?"

চুকলি বললো, "আপনি নেই, খারাপ লাগছে, দাদা। আপনার অভাব ব্যাটারা বুঝতে পারবে পদে পদে, কাজে তো আটকাবেই।"

আমি বললাম "তোমরা সবাই রয়েছ, গুড্‌হাউস কোম্পানির চিন্তা কি?"

চুকলি বলছে, "সাতসকালেই একটা ফাইল খুঁজে পাচ্ছে না। ধাওয়ান ইতিমধ্যেই হইচই লাগিয়েছে।"

আমি বললাম, "ব্যস্ত না হয়ে শান্তভাবে কাগজগুলো খুঁজতে বলো, সব পেয়ে যাবে।"

চুকলি এবার একটা গরম খবর ছাড়লো, "দাদা, আপনার মতন নির্বিবাদী সাত্ত্বিক লোকের গায়ে হাত দেওয়া। শুনছি, আজ সকালে ধাওয়ানেরও বাজনা বেজে গিয়েছে! ওঁকেও যেতে হচ্ছে এবার। তবে ওদের আর কি—অঢেল টাকা কামিয়েছে—দুই জেনারেশন বসে খাবে, গুরগাঁওতে বাড়ি ভাড়াই পাচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা।"

আমি আর কথা বাড়াতে চাই না। কিন্তু সুকুমার তেওয়ারি এসে ফোন ধরলো, "দাদা, কেমন আছেন? মনে হচ্ছে যেন কতদিন দেখা হয়নি।"

"সুকুমার, তুমি ছোটছেলের মতন কথা বোলো না।"

"আজই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে আমাদের কোম্পানি, অ্যাভারেজ মানুষকে কর্মক্ষেত্রে একলাখ ষোলো হাজার ঘণ্টা কাটাতে হয়। সোজা কথা নয়!"

অর্থাৎ গুড্‌হাউস কোম্পানি নতুন লোক চাইছে, আমি বুঝতে পারছি। পুরনো বলরাম বিশ্বাসদের টিম থেকে হটিয়ে দিয়ে মাঠে নতুন প্লেয়ার নামানোর চক্রান্ত। নতুন লোককে লোভ দেখাতে গিয়ে বিজ্ঞাপনী কায়দায় আশ্বাস দেওয়া, আমরা লক্ষাধিক ঘণ্টার কর্মসম্পর্কে বিশ্বাসী, বলরাম বিশ্বাসদের আমরা সময় হবার আগেই চাকরি থেকে বিদায় করেছি, একথা মনে রেখো না।

"কেমন আছেন?" রিপন স্ট্রিটের সহকর্মীদের প্রশ্নটা আমার কাছে কেমন হেঁয়ালির মতন মনে হচ্ছে।

বলরাম বিশ্বাসকে অনিচ্ছা-অবসর দেওয়ার পরের দিনই সে কেমন থাকতে পারে তা আন্দাজ করার মতন বিচারবুদ্ধি ওই অফিসের কেন নেই?

ঠিক হ্যায়! যেমন প্রশ্ন করেছ তেমন উত্তর পাবে! একটু গম্ভীর গলাতেই আমি টেলিফোনে জানিয়ে দিলাম, "ওয়ান্ডারফুল! গলার বকলেস এবং লাগোয়া চেন খুলে না পর্যন্ত বুঝতেই পারিনি স্বাধীনতায় এতো সুখ আছে। আমার স্ত্রী বলছিল, তোমাকে আবার যদি কেউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে আসে তা হলে তুমি কিছুতেই নেবে না।"

ওরা আমার কথার কি মানে করছে কে জানে। চুকলিখোর চাটুজ্জ্যে আন্দাজ করছে, কোনও প্রতিযোগী কোম্পানির পার্সোনেল ম্যানেজার লোকমুখে বলরাম বিশ্বাসের অবসর নেওয়ার খবর পাওয়া মাত্রই ছুটে এসেছেন বিশ্বাসের কাছে। চুকলি এখনই ফোন নামিয়ে ধাওয়ানের কাছে ছুটত, কিন্তু ধাওয়ান নিজেই এতক্ষণ ওলট-পালট খাচ্ছে—ওদের পোস্টে ভি-আর-এস দিতে হয় না, তিনমাসের নোটিশ ধরিয়ে দিলেই যথেষ্ট।

কোম্পানির দেওয়া গাড়ি, বাড়ি, ফোন সব মুহূর্তে ভ্যানিশ হয়ে যাবে স্রেফ এক চিঠির জোরে। সেই সঙ্গে উধাও হবে কিস্তিতে কেনা ফ্রিজ, ওয়াশিংমেসিন, টিভি এটসেটরা। ধাওয়ানের এসব মনে ছিল না যখন দিনের পর দিন রিপন স্ট্রিট অফিসে বসে সে অন্য কর্মীদের কাউনসেলিং করছিল।

এই কাউনসেলিং বস্তুটি কী তা উপাসনার জানা ছিল না। সবটা ইচ্ছে করেই বলিনি আমি। বিস্তারিত ব্যাখ্যা শুনিয়ে উপাসনার যন্ত্রণা বাড়িয়ে লাভ কী?

ব্যাপারটা সত্যিই পিকুলিয়র। কসাইখানায়, পোলট্রিতে জবাই করার আগে জন্তুদের স্টানিং করে দেওয়ার মতন। আচমকা হটিয়ে দেওয়ার চিঠিটা না ধরিয়ে দিয়ে যাদের তাড়াতে চাও তাদের এক এক করে ম্যানেজারের ঘরে ডাকো। অফার করে এককাপ গরম চা ধরিয়ে দাও। সৌজন্যের বিনিময় করো, জিজ্ঞেস করো ওয়াইফ, সন, ডটার কে কেমন আছে? তারপর জেনে নাও তার স্বাস্থ্যের কথা।

পৃথিবীতে কোন্ কর্মীর ক'টা ছেলে আছে বউ আছে তা ম্যানেজারের মুখস্ত রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং কমপিউটরের ওপর ভরসা রাখো। জন্মদিন, বিয়ের দিন এটসেটরার সঙ্গে কমপিউটর প্রিন্ট-আউট গুষ্ঠির প্রতিটি খবর লিখে দিয়েছে। নিজেকে খুব হৃদয়বান লোক বলে মনে করেন ধাওয়ান। জন্মদিনে অথবা ম্যারেজ অ্যানিভারসারিতে কোনও ছাঁটাই চিঠি ইসু করেন না। একবার তিনি খুব বিপদে পড়ে গেলেন, যাঁকে জবাই করবেন ঠিক করেছেন তাঁর জন্মদিন মাসের পয়লা। নিজের চেম্বারে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলেন ধাওয়ান, তারপর কোম্পানির যাতে কোনও আর্থিক ক্ষতি না হয় তার জন্য একদিন এগিয়ে আনলেন স্যাকিং ডেট।

মানুষকে চলে যাবার ব্যাপারটা কেন 'স্যাক' বা 'থলেপোরা' হল তা আমার জানা নেই। হয়তো প্রাচীন কোনও কালে, পশুদের নিধন করে থলেয় পুরে ফেলবার রীতি ছিল। কিংবা স্যাকিং-এর অন্য কোনও গল্প আছে, যা আমার জানা নেই। যেমন মাস মাইনে স্যালারির সঙ্গে নুন

সাপ্লায়ের ঐতিহাসিক সংযোগ আছে—নুনের হিসেবে সে যুগে মাইনে হতো। সময়ের পথে হাঁটতে হাঁটতে মানুষ কত যে কাণ্ড করেছে তাঁর ঠিকঠিকানা নেই।

ধাওয়ানের কাউনসিলিং! অসহ্য! বাছা, তোমার কোম্পানি একটা পোলট্রি ব্রয়লার মুরগির প্রাণ নিতে চাও, তা এক কোপে কাজ সারো। তা নয়, প্রথমে মুরগিকে লেকচার শোনানো। বলরাম, কোম্পানির ফিনানশিয়াল অবস্থা তো দেখছ। গত বছরে সেল কমেছে এবং লাভও কমেছে। এবার প্রথম তিন মাসে সেল কিছু বেড়েছে, কিন্তু লোকসানের পরিমাণ আরও বেড়েছে। এই মুহূর্তে আমাদের কোম্পানির সবচেয়ে বড় শত্রু খরচ। সেলিং কস্ট কমাতেই হবে। হরে কেষ্ট, হরে কেষ্ট! অর্থাৎ হবে কষ্ট, হবে কষ্ট।

আমি তো ধাওয়ানের স্টাইল বুঝি। হেড অফিসের বড়কর্তাদের বিদেশভ্রমণের খরচা যে দশগুণ বেড়েছে তা আমাদের কানে এসেছে। এই কোম্পানির নামে বাজার থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করে মালিকদের জামায়ের ডুবন্ত কোম্পানিতে যে খয়রাতি দেওয়া হচ্ছে তাও আমাদের অজানা নয়। কিন্তু সে-কথা তোলবার অধিকার আমাদের মতন অর্ডিনারি জুনিয়র অফিসারদের নেই।

"আমার তো বেশি দিন নেই, মিস্টার ধাওয়ান। একটা বছর এবং কয়েকটা মাস।" ধাওয়ান সায়েব জানেন, এই খরচটা নস্য।

কিন্তু চতুর ধাওয়ান আমার ওয়েলউইশার সাজছেন। "বাল্‌রাম, আমি তোমার মঙ্গল চাই, তুমি তো মানবে?"

একশবার মানব। কারণ, না মেনে উপায় নেই। পোলট্রির ম্যানেজার অবশ্যই খাঁচায় রাখা সমস্ত মুরগির ওয়েলউইশার। প্রত্যেকেই জানে, ভাল খামারে দু'রকম মুরগি থাকে—লেয়ার, যারা নিয়মিত ডিম পেড়ে যায়, বছরে অন্তত তিনশ দশটা ; আর ব্রয়লার, যারা দু'সের খেয়ে অন্তত একসের মাংস তৈরি করে নিজের দেহে। ভোজন ও ওজনের অঙ্কে সামান্য অসঙ্গতি হলেই পাঠিয়ে দাও কসাইখানায়। ফিড-ওয়েট রেসিওটা ভীষণ

ইম্পর্টান্ট এই সংসারে। কত খাচ্ছ আর কত দিচ্ছ তা না বুঝলেই কর্তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

এখন বলতে পারেন, জাহান্নামে যখন যেতেই হবে, তখন সত্যি কথাটা প্রকাশ হয়ে যাক। রিপন স্ট্রিটের গুড্‌হাউস ইন্ডিয়াও নথিভুক্ত হয়ে থাক রেজিস্টার্ড কসাইখানা হিসেবে। কিন্তু মুখ খুলবারও উপায় নেই। ভূমিষ্ঠ হবার কিছুদিন পরে কোন একসময়ে পোলট্রির সব মুরগির ঠোঁট যন্তর দিয়ে কেটে দেওয়া হয়—এর নাম ডিবিকিং। এই ঠোঁট থাকলে নাকি মুরগিরা নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করে, ওজন কমতে থাকে, রক্তারক্তি হয়। আসলে ঠোঁটে ধার থাকলে ডিসিপ্লিন্‌ড পোলট্রি ব্রয়লার হওয়া যায় না। তাই আমরা বিনা প্রতিবাদে শুনে যেতে পারি ধাওয়ানের কথা, কিন্তু নিজেদের ধারালো ঠোঁটের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করতে পারি না। আমরা চমৎকারভাবে কর্তাদের কাউনসেলিং সহ্য করে যেতে পারি।

"বাল্‌রাম, শোনো।" বলছিলেন ধাওয়ান সায়েব।

একবার ভাবলাম বলি, "ঠোঁট ডিবিকিং করেছ বলে নামটা বিকৃত করার অধিকার তোমাদের দেওয়া হয়নি। লেগহর্ন, রোড আইল্যান্ড রেড্‌, এমনকী ইন্ডিয়ান গোমতী মুরগী পর্যন্ত এই অধিকার আজও এনজয় করে। ইন্ডিয়ান মিথলজিতে বলরাম একটা পবিত্র নাম, অনেক ভেবেচিন্তে আমার দাদু ঘনশ্যাম বিশ্বাস নামটা রেখেছিলেন, আমাকে প্লিজ্‌ বাল্‌রাম করবেন না। পাঞ্জাবিদের কোনও ক্ষতি তো আমরা বাঙালিরা করিনি।"

কিন্তু বলার কোনও স্কোপ পাওয়া গেল না। ঠোঁট কাটার সময় বোধ হয় জিভও কেটে যায় অনেক সময়।

ধাওয়ানের লেকচার, "বাল্‌রাম, চটপট হিসাবপত্তর বুঝে নিয়ে পাওনাগণ্ডা আদায় করে কোম্পানি থেকে সরে যাওয়াটাই বিচক্ষণের কাজ। অনেক ক্যালকাটা কোম্পানিতে কী হচ্ছে, দেখছ তো। গৌরনিতাইভজা মহাপুরুষ মহাত্মাদের প্রতিষ্ঠিত সব কোম্পানি, এদের সুযোগ্য সব বংশধর, সমাজে কত সব সুনাম, অথচ এঁরা যখন পিতৃপুরুষের কোম্পানিতে তালা ঝোলাচ্ছেন তখন কর্মীদের পাওনা গ্র্যাচুইটি এটসেটেরা

তো দূরের কথা, নিজেদের জমা দেওয়া প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাও ব্যাংক থেকে বেমালুম উধাও। অথচ মহাত্মাদের বংশধররা পুরনো সুখে বড় বড় ম্যানসনে বাস করছেন, ইমপোর্টেড গাড়ি চড়ছেন কিন্তু কর্মীরা অনাহারে আত্মহত্যা করছেন।" ধাওয়ানের অ্যাডভাইস, "আমি হলে এই সব পরিস্থিতি আসার আগেই হিসেবপত্তরের হাঙ্গামা চুকিয়ে ভি-আর-এস নিয়ে হাত-পা ধুয়ে ফেলতাম, বাল্‌রাম।"

আমি সবিনয়ে ধাওয়ানকে বলেছি, "সায়েব, জীবনের একলাখ ঘণ্টা যেখানে কেটেছে সেখানে হাত ধুয়ে ফেলব বললেই হাত ধোওয়া যায় না। আত্মসম্মান বলে একটা বস্তু আছে। দেড় দু'বছর এমন কিছু লম্বা সময় নয়, কিন্তু অসময়ে বিতাড়িত হওয়ার পিছনে মস্ত এক অপমান আছে।"

শুধু অপমান নয়, ব্যর্থতার পিত্তরসও আছে—সারা অস্তিত্বটা তিক্ত হয়ে যাবার ব্যাপারটা কর্তাদের বোঝানো সহজ ব্যাপার নয়। এরা ভিড় কমাতে চায়, পোলট্রি ফাঁকা করে ফেলতে চায়, এরা শৃঙ্খলাসম্পন্ন সৈনিক—ডিসিপ্লিন্‌ড সোলজার। গোরুদের মধ্যে এই ডিসিপ্লিন চূড়ান্ত—তাই দার্শনিকের নীরবতায়, নিস্পৃহভাবে গোরুর মাংসের গাড়ি গোরুতেই টেনে নিয়ে যায়।

চিকেন, বিফ এদের মৃত্যুভয় নিশ্চিত আছে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে মৃত্যুভয় ছাড়াও বাড়তি ভয় চাকরি যাবার ভয়, রুজিরোজগার হারাবার ভয়। মানুষ সেদিক থেকে বড়ই দুর্ভাগা—কতরকমের ভয় যে তার ঘাড়ের ওপর তলোয়ারের মতন সারাক্ষণ ঝুলছে। ফেল করার ভয়, ডাইভোর্স হবার ভয়, পি-এফ-এর টাকা উধাও হয়ে যাবার ভয়, গ্র্যাচুইটি গ্যাঁড়া হয়ে যাবার ভয়। পোলট্রিতে, ডেয়ারিতে মুরগীদের মধ্যে এসব ভয় এখনও ঢোকেনি, ওরা ভাগ্যবান অভাগা মানুষের তুলনায়। মানুষের ক্ষেত্রে শুধু সময়ের মাপকাঠিটা একটু বড়। একটা চিকেনের জীবনে আট সপ্তাহেই জন্ম থেকে মৃত্যু যা হবার সব হয়ে যায়, যদি পুনর্জন্মের ধারাবাহিকতায় বিশ্বাস করেন তা হলে এভরি এইট-টেন উইক্‌স্ মুরগীর চাকাটা ঘুরছে স্রষ্টার খেয়ালে।

আমার কাছে তাৎক্ষণিক সাড়া না পেয়ে ধাওয়ান কিছুটা হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু দু'দিন পরেই বিপুল উৎসাহে আবার ধাওয়ানের কাউনসেলিং শুরু হয়েছে। আমাকে আবার চা ধরিয়ে দিয়েছেন। নিজের চেম্বারে বসে ধাওয়ান জিজ্ঞেস করেছেন, "বাল্‌রাম, তুমি বিষয়টা নিয়ে কিছু ভাবলে? ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত না নিয়ে কত মানুষ যে পরে দুঃখ করেছে তার হিসেব নেই।"

"সিদ্ধান্ত তো নেওয়াই রয়েছে, মিস্টার ধাওয়ান। বহুদিন আগে যেদিন এই কোম্পানিতে প্রথম জয়েন করেছিলাম সেদিনই তো নিয়োগপত্রে লেখা হয়েছিল অবসর নেওয়ার তারিখ। ট্রেন কখনও কি নির্ধারিত সময়ের আগে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যায়? যদি যায় তা হলে মানুষের কী অবস্থা হয় বলুন তো।"

"বাল্‌রাম, আমাদের কর্মজীবনটা তো ইস্টার্ন বা সাউথ ইস্টার্ন রেলের প্ল্যাটফর্ম নয়। গতকালই দমদম আমি এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের প্লেন লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের নেতাজী সুভাষ এয়ারপোর্টে নির্ধারিত সময়ের বিশ মিনিট আগে চলে এল।"

এই লোকটার সঙ্গে তর্ক করে কে পেরে উঠবে? ধাওয়ান একটা ইন্ডিয়া কিং সিগারেট ধরিয়ে রাজকীয় স্টাইলে বললেন, "আমার ওপর টপ ম্যানেজমেন্টের ভীষণ চাপ রয়েছে, বাল্‌রাম। যে কর্মী ইচ্ছে করে চাকরি ছাড়ল না তাকে চিঠি লিখে চলে যেতে বাধ্য করতে হলে মনোকষ্ট হয়। বিশেষ করে যাদের সঙ্গে এতোদিন একসঙ্গে কাজ করেছি।"

"মানে আপনি আমার এতোদিনের পুরনো চাকরি চিঠি দিয়ে টার্মিনেট করবেন?"

ধোঁয়া ছেড়ে ধাওয়ান শান্তভাবে বললেন, "ওটা তো ম্যানেজমেন্টের শেষ পথ। আসল কথা হল, চাকরি নিয়ে আমরা কলকাতার মানুষরা অযথা সেন্টিমেন্টাল হয়ে উঠি। কিন্তু আসলে চাকরি জিনিসটাই একটা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি মাত্র। নাইদার লেস নর মোর। তিন মাসের নোটিশ—এই নোটিশ

কোম্পানিও দিতে পারে, তুমি-আমিও দিতে পারি। একগুঁয়ে কোম্পানিরা নোটিশ দেয় না, তার বদলে কর্মচারির হাতে তিনমাসের মাইনের একটা চেক গুঁজে দেয়। কিন্তু অনেক কিছু সুযোগসুবিধে বাদ পড়ে যায়—বিশেষ করে আর্থিক পাওনা-গণ্ডা। বাল্‌রাম, আমি ফাইট করে আমার সহকর্মীদের জন্যে হেড অফিস থেকে একটা স্পেশাল ভি-আর-এস প্যাকেজ আনিয়েছি। কর্তারা এজন্যে আমাকে সমালোচনা করছেন, জিজ্ঞেস করেছেন এই ধরনের জেনারাস প্যাকেজ কেন? আমি বলেছি, ভেরি ভেরি শর্ট পিরিয়ডের জন্য এই সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। মানুষ যদি বুঝে-সুঝে চটপট সুযোগটা লুফে না নেয় তা হলে লোকসান তারই—কোম্পানি তখন তো যা করবার তা করবেই।"

আমি তখন বোকামি করেছি। ঝট করে ঘুড়ি কাটার জন্যে কখনও হল্কা দিয়ে ঘুড়ি ওড়ানো হয়, কখনও মাঞ্জার জোরে টেনে খেলা হয়, এসব ঠিক বুঝিনি। আমি ভেবেছিলাম, ধাওয়ান মানুষটা সত্যিই আমাদের জন্যে ভেবেছে। তাই অনুরোধ করেছি, "মিস্টার ধাওয়ান, প্লিজ, আমাকে ভি-আর-এস থেকে এবারের মতন স্পেয়ার করুন। আমার আত্মীয়মহলে, আমার শ্বশুরবাড়িতে, আমার বন্ধুসার্কেলে সবাই আমাকে ভীষণ কাজের লোক বলে জানে, অফিসে আমার হাজিরার রেকর্ড দেখুন, অফিসে নিয়মিত সময়মতো আসতে হবে এই জেদে আমি কখনও আত্মীয়দের সামাজিকতায় যাইনি। বাংলা বন্‌ধের দিনেও আমি হেঁটে হেঁটে রিপন স্ট্রিটে অফিস করেছি, রায়টের সময়ও আমি প্রাণ হাতে রিপন স্ট্রিট ধরে নিত্য যাতায়াত করেছি। আমার আত্মীয়দের ধারণা আমি একটা কাজপাগল লোক। আমার এই সুনামটা শুধু শুধু কেড়ে নেবেন না।"

ধাওয়ান আর একটা ইন্ডিয়া কিং দিয়ে নিজের মুখাগ্নি করেছেন। "বাল্‌রাম, কলকাতায় সবলোকের ঘড়ি স্লো চলছে—কবে কি করেছি তার ডিটেল তো কোনো অ্যাকাউন্টসে রাখা হয় না। বিজনেসে এখন শুধু ফিউচার নিয়ে মাথাব্যথা। ওল্ড ইকনমির ফসিল হয়ে এই শহরটা কোনোরকমে বেঁচে আছে। এখন নিউ ইকনমিতে আমরা কোম্পানিকে কী

দিতে পারছি? জানো, বম্বে বাঙ্গালোরে কোনও লোক রিটায়ারমেন্ট, গ্র্যাচুইটি, পি-এফ, পেনসন এসব নিয়ে কথাই তোলে না। ওসব জায়গায় সবাই ভীষণ ব্যস্ত বর্তমানকে নিয়ে।"

তবু আমি একটা করুণ আবেদন তুলে দিয়েছি ধাওয়ানের হাতে। পাকা অভিনেতার মতন তিনি বলেছেন আমাকে রক্ষে করবার একটা সৎ চেষ্টা চালাবেন। এসব নতুন শব্দ। আমরা জানতাম, মানুষ যখন কারও জন্যে কিছু করবার চেষ্টা করে তখন অন্তর দিয়েই করে, অনেস্ট এফর্ট-এর মধ্যে আতিশয্য আছে। কিন্তু এর মধ্যে যে কাঁচা মিথ্যে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা আছে তা গতকাল বুঝলাম। ধাওয়ান সায়েব আমাকে আচমকা বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। শুধু ইজ্জতটা নষ্ট হতে দেননি। অফিস সার্কুলারে বলেছেন, গ্রেড্ ডি অফিসার বলরাম বিশ্বাস অকাল অবসর নেবার জন্যে ইচ্ছা প্রকাশ করায় কোম্পানি সে অনুরোধ ঠেলতে পারেননি।

মসজিদ লেনে নিজের বাড়ির দরজায় বৈদ্যুতিক বেল বাজালাম। আমি ভরদুপুরে ফিরে এসেছি। আমি যা-তা লোক নই, বিশ্বসংসারে কারও নোকর নই—ফ্রি সিটিজান অফ এ ফ্রি কানট্রি বলতে যা বোঝায় আমি তাই।

উপাসনা শান্তভাবে দরজা খুলে দিল। আমার দেরি হচ্ছিল দেখে একটু চিন্তা করছিল। কি আশ্চর্য, উপাসনা আমাকে সাদরে ভাত খেতে ডাকল। ডাইনিং টেবিলে আইটেমের পর আইটেম সাজিয়ে দিল। উপাসনা আজ একেবারে অস্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিক। আদর্শ সহধর্মিণী বলতে যা বোঝায় তাই উপাসনা—আমাকে স্নান করিয়ে, সাজিয়ে পরিয়ে, খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়েই যেন ওর নিত্যদিনের পুতুল খেলা।

আদরের পুতুল অঢেল ভালবাসা পায়। কিন্তু কে আর পুতুল হতে চায় এই সংসারে? অন্তত বলরাম বিশ্বাস কিছুতেই পুতুল হতে চায় না। পুতুলরা ফ্রি কানট্রিতে বসবাস করতে পারে, কিন্তু তারা তো কখনও ফ্রি সিটিজান নয়।

পুতুল খেলায় নিজের পুতুলকে একা খেতে বসিয়েছে উপাসনা। স্বামীদেবতার ভোজনপর্বের পরে সে খাবে—কারণ তার অনেক কাজ। স্নান সারা, কাপড়কাচা, তারপর গৃহদেবীর পুজোয় বসা। এই পুজোয় বসে কত সময় যায় তা আমার ঠিক জানা নেই ; কারণ সেই সময় আমি তো রিপন স্ট্রিটের অফিসে বসে ক্যান্টিনে কী মেনু হয়েছে তার খোঁজখবর করছি। অনেকদিন আগে এক শুক্রবার বন্‌ধ থাকায় অফিস যাওয়া সম্ভব হয়নি। রাস্তায় ক্যাডারদের ধমক খেয়ে মাঝপথ থেকে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে এসে উপাসনার পুজোর বহর দেখেছিলাম। সন্তোষী মা'কে আরও সন্তুষ্ট করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে কলকাতার ধর্মপ্রাণা মহিলারা। চোখ বুজে ভজনা চলেছে তো চলেছেই। শুনেছি, এই মায়ের টক সহ্য হয় না। হতেই পারে, কলকাতার গৃহবধূরা তো এক সময় হোলসেল রেটে অম্বলের ব্যাধিতে ভুগতেন। এখন বোধ হয় মেয়েদের মধ্যে ওই রোগের প্রকোপ কম—কিংবা অম্লনাশক ওষুধগুলোর দাপট বেড়েছে, তাঁরা ঘরে ঘরে সারাক্ষণ অপেক্ষা করছেন এমার্জেন্সি ডিউটির অপেক্ষায়।

আমি সেবার লক্ষ্য করেছিলাম, টক এড়ালেও ভাজাভুজির সঙ্গে সন্তোষী মায়ের বিশেষ সম্পর্ক রয়ে গিয়েছে। আজ আমার স্ত্রী উপাসনা ভাত খাবে না, আমিষ খাবে না, ওর পাতে থাকবে তেলেভাজা পরোটা, আলুচচ্চড়ি এবং সন্তোষী মায়ের ফেভারিট আইটেম শোনপাপড়ি।

আমি ভেবেছিলাম, অবসর পাওয়া লোকের একটি উপরি পাওনা—দুপুরে একসঙ্গে একই টেবিলে বসে স্ত্রীর সঙ্গে খাওয়াদাওয়ার বিলাসিতা। কিন্তু নিষ্ঠাবতী উপাসনার কাছে মাদার সন্তোষীকে সন্তুষ্ট করা আরও বড় দায়িত্ব। আমার রাগ করার উপায় নেই। বুঝতে পারি মেয়েদের দায়দায়িত্ব অনেক বেশি। সংসারের আপনজনের এবং প্রিয়জনের মঙ্গল করার প্রবল ইচ্ছা তাদের রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে সারাক্ষণ, যদিও সোজাসুজি প্রিয়জনের পার্থিব মঙ্গল করবার ক্ষমতা এদেশের সর্বক্ষণের গৃহিণীদের আয়ত্তের মধ্যে নেই। এই পৃথিবীতে অপরের মঙ্গল করতে

গেলে যা সবচেয়ে প্রয়োজন তা হলো অর্থ ও সামর্থ্য। এই দুটি শক্তিই উপার্জনহীনা রমণীদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে ক্রমশ। সুতরাং যা তাঁদের সাধ্যের মধ্যে পড়ে থাকছে তা প্রিয়জনদের মঙ্গলকামনা।

না, আমি মোটেই রাগ করছি না বাংলার মেয়েদের ওপর। অপরের জন্যে মঙ্গল কামনাটাও কম কী? শুধু শুভেচ্ছা ও আত্মকামনায় আমাদের দেশের মেয়েরা যে ভরসা রাখে না তার প্রমাণ তো সেই ছোটবেলা থেকে মায়ের আমল থেকে দেখে আসছি। এদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী অথচ সহায়সম্বলহীন মেয়েদের যাতায়াত তাই দেবতার মন্দিরে অথবা গৃহের উপাসনাকক্ষে—ওখানে নিভৃতে পরমশক্তিমানের কাছে কেবল কাতর আবেদন-নিবেদন, প্রার্থনা ও মঙ্গলভিক্ষা। সুযোগ বুঝে নিঃশব্দে গজিয়ে উঠেছে মানত, উপবাস এবং বহুবিচিত্র আত্মনিগ্রহ! এদেশের মেয়েরা সত্যিই আশ্চর্য, প্রিয়জনের সব কষ্টকে কেড়ে নিয়ে চালান করতে চাইছে নিজের শরীরে, ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে।

রমানন্দ স্বামীও সেবার মিশনে বসে এই অধমকে একই কথা বলেছিলেন। রমণীহৃদয় নিয়ে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরও একদা অপরের পাপ, অপরের অপকর্ম, অপরের ব্যাধি পরমানন্দে নিজের দেহে ধারণ করে নিয়েছিলেন। বিদ্রোহী শরীর তাঁকে ছেড়ে কথা কয়নি। প্রথম যখন এ বিষয়ে পাঠ নিয়েছিলাম তখন আমার তখন মনে হয়েছিল, ব্যাপারটা অবাস্তব, ভক্তদের কল্পনাপ্রসূত। মানুষ তো ইচ্ছে করলেই ব্লটিং পেপারের মতন অন্যের কালিমা শোষণ করে নিয়ে তাঁকে বেদনা থেকে মুক্ত করতে পারে না। রমানন্দ মহারাজের উদার মানসিকতা। তিনি বলেছিলেন, তোমরা বোদ্ধা লোক, তোমরা ব্যাপারটা আন্দাজ করে নাও, বুঝে নাও। অতিপ্রিয়জনের সমস্ত ভ্রান্তি, সমস্ত অপরাধ, সমস্ত শাস্তি, সমস্ত যন্ত্রণা কি কোনও মুহূর্তে নিজের ওপর তুলে নিতে ইচ্ছে করে কি না।

তখন আমার বয়স কম। তার ওপর পুরুষমানুষ—সৃষ্টিকে বাইরে থেকে এবং ভিতর থেকে একই সঙ্গে বুঝে নেবার ক্ষমতা পুরুষের অনেক আগেই মেয়েরাই সাধারণত পেয়ে থাকে। মহারাজকে সবিনয়ে অনুরোধ

করেছি, "অলৌকিক থেকে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ঠাকুরকে একটু দূরে সরিয়ে রাখা যাক মহারাজ—তাতে বিশ্বসংসারের অনেক বেশি উপকার হবে। এই পৃথিবীতে ম্যাজিশিয়ান আমরা তো অনেক পেয়েছি, আমরা এখন চাই একজন পরমহংসকে।"

সস্নেহে রমানন্দ স্বামী আমাকে প্রাণখুলে যা-ইচ্ছে তা বলবার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। "যা মন চায় না, যা করতে সন্দেহ হয়, তা কেন করবে, বলরাম? খবরদার, অকারণে নিজেকে সারেন্ডার করবে না।" তখন ভেবেছিলাম, জিতে গিয়েছি। কিন্তু এখন দেখছি আমি হেরে গিয়েছি। গোহারান হেরেছি—এই কলকাতাতেই ঘরে ঘরে অচেনা অজানা মেয়েদের দেবীর ভূমিকায় দেখেছি, আর ভাবছি যত আকালই আসুক, এদেশে কখনও সারদামণিদের অভাব হবে না।

"তুমি খেয়ে নাও। আমার আরও একটু দেরি হবে। মায়ের পুজোতে সময় লাগবে একটু।" আমাকে বলছে উপাসনা।

"একটু নয়, অনেক দেরি," আমার আশঙ্কা।

আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়ে এবার হাসছে উপাসনা। "এ তো আর তোমার অফিসের ফাইল নয় যে কম সময় থাকলে ঝট করে অর্ডার দিয়ে দেওয়া যাবে।"

আমি বললাম, "উপাসনা, সব পুজোয় আচারটাই অনেক সময় নিয়ে নেয়। ঠাকুরের সামনে মানুষের চার্টার অফ ডিমান্ডে তেমন সময় নেয় না। পুজো মানে দেবতা অথবা দেবীকে সামনে বসিয়ে বলে যাও : দাও দাও, আরও দাও, ঠাকুর তুমি মানুষকে যত দেবে তত তোমার সুনামে সারা বিশ্ব মাতোয়ারা হয়ে উঠবে।"

উপাসনা সন্তুষ্ট হলো না। তার অনুরোধ : "ঠাকুরদেবতা নিয়ে তুমি ছেলেমানুষি করবে না। দেবদেবীরা মন্ত্রী নন, তোমার আপিসের সায়েবমেমও নন। ওঁরা অন্তর্যামী, চুপচাপ ঘরের কোণে থেকে মানুষের যত দুঃখ সব বুঝে নেন।"

শুক্রবারের দুপুরে নিজের বাড়িতে বসে আমি ভাবছি, পুজোর কথা

তুলে উপাসনা আজ আমার সঙ্গে খাচ্ছে না, অথচ যেদিন কলেজ ফাঁকি দিয়ে আমরা প্রথম বেরিয়ে এসেছিলাম সেদিনও তো ছিল শুক্রবার। আমার পকেটে প্রাইভেট টিউশানি থেকে পাওয়া প্রথম মাসের টাকাটা ছিল। আমরা সেই শুক্রবারে পার্ক স্ট্রিটে চাইনিজ দোকানে ঢুকেছিলাম। দোকানে ঢুকেছিলাম। দুটো আইটেম অর্ডার দেওয়া হয়েছিল—হট অ্যান্ড সাওয়ার স্যুপ এবং তারপর সুইট অ্যান্ড সাওয়ার চিকেন। অর্থাৎ জীবনযাত্রার প্রথম পর্বে টক ঝাল এবং শেষপর্বে অম্লমধুর!

দুটো চাইনিজ আইটেমই নির্বাচন করেছিল উপাসনা। যদিও তখন বলেছিল, এত লাক্সারির প্রয়োজন নেই, একটা চিকেন ফ্রায়েড রাইস নিয়ে ভাগ করে নেওয়া যাক। চাইনিজ ভোজনপর্বের পরম্পরা অঙ্কটা তখন আমার মাথার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, কটু রস দিয়ে শুরু করে, অন্নব্রহ্মে উপস্থিত হয়ে, আবার মধুর-অম্লে সমাপ্তি টানো। চিনের খাদ্য দার্শনিকরা কখনও প্রত্যাশা করেননি মধুরেণ সমাপয়েৎ। তাঁরা জানতেন, এই সংসারের শেষ পর্বে মধুর রসের অনুপস্থিতি অনিবার্য হতে পারে।

খাবারের অর্ডার দিয়ে আমরা দু'জনে মজার তর্ক করেছি। ইন্ডিয়ান এবং চাইনিজ দর্শনের মধ্যে সত্যিই অনেক তফাত। আমরা সুক্তো নামক তিক্ততা দিয়ে শুরু করে সুদীর্ঘ পথ হেঁটে মধুরে পৌঁছনোয় বিশ্বাস করি। আর চিনেদের আদি ও অন্তে অম্লরস। চিনারা যে আমাদের থেকে অনেক প্র্যাক্টিক্যাল ইতিহাসে বারবার তার প্রমাণ তখনও পাওয়া গিয়েছে এখনও পাওয়া যাচ্ছে।

সেদিন দু'জনে টেবিলে সামনাসামনি বসে একসঙ্গে খাওয়া। সেই প্রথম বুঝতে পারা, খাবারের পদগুলোই সব নয়, সান্নিধ্যও মস্ত জিনিস। জেলখানায় বসে ফাঁসির ভূরিভোজন আর নিরালায় প্রিয়ার সঙ্গে বসে দুটি কাপে উষ্ণ এবং তিক্ত কফি সেবন কোনটা বেশি আনন্দদায়ক?

পার্ক স্ট্রিটের পিপিং চাইনিজ রেস্তোরাঁয় সেই শুক্রবার আর বহু বছর পরের আজকের সন্তোষীসমৃদ্ধ শুক্রবার এক নয়। সময় সব কিছুই পাল্টে দিয়েছে। সেই সময় আমার সহপাঠিনী উপাসনা ছিল তন্বী, একটু চাপা

রং। তার মাথায় অঢেল চুল যা কোনো শ্যাম্পু কোম্পানির নজরে পড়লে বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হতে পারতো। আমি নিজেও ছিলাম স্লিমের দিকে, যদিও বাড়ির লোকদের দুঃখ, বড্ড রোগা, আমার শরীরে নাকি কিছু লাগে না। উপাসনা এই এত বছরের শীত-গ্রীষ্ম অবহেলা করে নিজের তনুদেহটি সুশাসনে রেখেছে। খুব সামান্য মেদের প্রলেপ পড়েছে তাঁর কোমল শরীরে অথচ কখনও সে ওয়ার্ক-আউট করেনি, নিয়মিত ভ্রমণ করেনি। যদিও আমার এক অভিজ্ঞ বন্ধু বলেছে, মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়েদের কোনো ব্যায়াম প্রয়োজন হয় না, সংসারের প্রয়োজনে বাড়ির মধ্যেই সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তাঁদের চরকির মতন ঘুরতে হয়। তারপর শ্বশুরবাড়ি যদি কসবায় এবং বাপের বাড়ি হাওড়া শিবপুরে হয় তা হলে তো কথাই নেই। যারাই কম খরচে রোগা হতে চায়, তাদের বলুন প্রতি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার পরে প্রাইভেট বাসে চড়ে এসপ্ল্যানেড থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেনে যেতে ভায়া গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড। ওদিন মঙ্গলাহাট বসে। ট্রাফিক জ্যাম ও যাত্রীভিড়ের চাপে এক কেজি রক্ত ও মেদ যদি জল হয়ে শরীর থেকে না বেরিয়ে যায় তা হলে ট্রাফিকের অধীশ্বর হাওড়ার পুলিশ সুপার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন!

হাওড়ায় পিত্রালয় হওয়াটা তা হলে উপাসনার মতন ওজন ও স্বাস্থ্য সচেতন মহিলার পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছে। কিন্তু নিত্য জ্যামের খারাপ দিকটা হলো, ওজন না বাড়ালেও তার চুল পেকেছে, বিশেষ করে কপালের দিকে। ওব বাবা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন উপাসনা কথায় কথায় স্বামীগৃহ থেকে হাওড়া-শিবপুরে গিয়েছে পাবলিক পরিবহনে। এতে চুলে পাক না ধরলেই অবাক হওয়ার কথা।

এই অধম, বলরাম বিশ্বাস ইতিমধ্যে সময়ের সস্নেহ প্রশ্রয়ে বিশালবপু না হলেও মধ্যবপু হয়েছে। মধ্যপ্রদেশই যে এই দেশের বৃহত্তম রাজ্য তা জানবার জন্যে ভোপালে যাবার কোনও প্রয়োজন নেই, সংখ্যাহীন মধ্যবয়সী বাঙালি তাঁদের শরীরে এই বাণী নিত্য বহন করছেন। তবে চুল পাকেনি আমার। দোষের মধ্যে শরীরের কাশ্মীর অর্থাৎ উত্তর অঞ্চলে

লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল জুড়ে গজিয়েছে বিশাল টাক, যার আদি সংস্কৃত নাম ইন্দ্রলুপ্ত। নগরবাসী বাঙালি পুরুষদের উত্তর অঞ্চলে চুলরা কেন দীর্ঘদিন বসবাস করতে চায় না, তা নিয়ে আমার স্ত্রী উপাসনা কিছুদিন আগে বিভিন্ন সূত্র থেকে মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে এনেছে। উপাসনা পরামর্শ দিয়েছে, চুল রক্ষে করতে হলে, সাবেকি স্টাইলে মগের জলে মাথা ভিজোও, না হয় গঙ্গায় গিয়ে ডুব দিয়ে স্নান করো। কলঘরের দরজা বন্ধ করে মনের সুখে ফুল স্পিডে শাওয়ার চালানোর সুখই মধ্যবিত্ত বাঙালি পুরুষকে টেকো করছে।

টাক লুপ্ত হলো না অথচ শাওয়ার সুখ থেকেও বঞ্চিত হতে হলো—এই অবস্থা চলে না, আমি তাই কলঘরের প্লাস্টিক মগ বিসর্জন দিয়েছি। নিজের মাথায় নিজের জল ঢেলে স্বয়ং শিবও আনন্দ পেতে পারেন না।

অবশেষে খাওয়ার টেবিলে আমরা মুখোমুখি বসেছি শুক্রবারের নির্জন দ্বিপ্রহরে। সুগৃহিণী সযতনে থালা সাজিয়ে দিয়েছে। উপাসনা এখন সস্নেহে আমার দিকে তাকাচ্ছে। ও কী কিছু ভাবছে? আমার আশঙ্কা মুখ না খুললেও উপাসনা বলতে চাচ্ছে, তার স্বামীর বুড়ো হওয়ার যতটুকু বাকি ছিল তা গতকাল নিঃশব্দে ঘটে গিয়েছে রিপন স্ট্রিটে গুড্‌হাউস ইন্ডিয়ার অফিসে।

আমি এক সময় ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে কিছু নাড়াচাড়া করেছিলাম। উপাসনা কি ভাবছে, তাঁর স্বামী অর্ধবৃদ্ধ ও অর্ধযুবা? ন্যায়শাস্ত্রমতে অর্ধকুক্কটীন্যায়—অর্থাৎ মুরগির অর্ধেক যুবক এবং অর্ধেক বৃদ্ধ অগ্রাহ্য।

আমি নিজেও অনেকদিন এইভাবে দিনের আলোয় উপাসনার একান্ত সান্নিধ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠিনি। আমার কাছে উপাসনা মানে একদিন ছিল বল্গাহীন প্রেম।

উপাসনা মুখার্জি ব্রাহ্মণ-তনয়া এবং এই বলরাম বিশ্বাস কুলীন কায়স্থ সন্তান। জাতপাতের বহুবিচার ভেঙেচুরে কোনোক্রমে বেরিয়ে আসা গিয়েছে আমাদের, আপনজনরা এই ধরনের বিবাহ সম্পর্কে অস্বস্তিবোধ

করলেও তেমন কোনো দুর্লঙ্ঘ বাধার রোড-ব্লক তৈরি করেননি। অনেকদিন পরে আলোচনা প্রসঙ্গে উপাসনার বোন একবার রসিকতা করেছিল, "জামাইবাবু, জাতসংক্রান্ত শাস্ত্রে কোথাও কিন্তু কায়স্থর উল্লেখ নেই—চারটে অরিজিন্যাল জাত হলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র!" এর পরেই শ্যালিকার সচতুর প্রশ্ন : তা হলে কায়স্থরা কোন গ্রেডে ঢুকছে?

আমার জাতিভেদ সম্পর্কে জ্ঞান নিতান্তই সীমাবদ্ধ। নিরুপায় হয়ে এক কায়েত বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, সে উত্তর দিল, আমরা ক্ষত্রিয়, অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের রণংদেহি সেক্টার আজকাল যাকে মিষ্টি করে বলা হয় প্রতিরক্ষা অথবা জাতীয় নিরাপত্তা! আমার শ্যালিকা আইনবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী—সে বললো, "খোঁজ করে দেখবেন বহুবছর আগে ক্যালকাটা হাইকোর্ট আপনাদের চার নম্বর তালিকায় স্থান দিতে চেয়েছে।"

আমিও কম যাই না, উত্তর দিলাম, "জেনে রেখো, একশো বছর আগে এই কলকাতার কয়েকটা অঞ্চলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থর রায়ট বন্ধ করতে পুলিশকে হিমসিম খেতে হয়েছে। বিশ্বাস না হয় খিদিরপুরের ইতিহাস পড়ো। এইসব মজার ব্যাপার নিয়ে আমাদের মধ্যে একসময় খুব হাসাহাসি হয়েছে। উপাসনা নিজেও তখন রসরসিকতায় উচ্ছল হয়ে উঠত।

এখন অবশ্য অন্য কথা। ওর কমনীয় শরীরে ইদানীং একজন লাবণ্যময়ীর উপস্থিতি ঘোষিত হচ্ছে, আবার চুলের সামনের অংশ শাদা হয়েছে। ন্যায়শাস্ত্রে এই ধরনের উল্টো অবস্থার বিস্তারিত আলোচনা আছে—অর্ধজরতীন্যায়। স্তন শৈথিল্যহেতু স্ত্রী তরুণী নয় অথচ কৃষ্ণকেশহেতু তাঁকে কিছুতেই জরতী বলা যায় না। এই পর্যায়ের রমণীদের ন্যায়শাস্ত্রীয় নাম : অর্ধজরতী।

আজ আমার কী হলো! কত নতুন এবং পুরনো কথা একই সঙ্গে মনের মধ্যে ভেসে উঠছে। অথচ এসব নিয়ে জমিয়ে তর্ক একসময় রিপন স্ট্রিটে নিজের অফিস ছাড়া আর কোথায় করা যেতো? এখন মনে রাখা প্রয়োজন ন্যায়শাস্ত্রের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—অরণ্যরুদিতন্যায়। অরণ্য জনশূন্য সুতরাং অরণ্যে রোদন অবশ্যই বিফল।

আমি এবার টেবিলে সাজানো খাবারের দিকে তাকাচ্ছি। এতদিন পরে দু'জনে একসঙ্গে খাওয়ার আনন্দের কথা তুলে উপাসনাকে অযথা বিব্রত করে লাভ নেই। অথচ সেবার এই একত্রাহার থেকেই তো সব গোলমাল পাকাল। আমরা সেবার ঢুকছি পিপিং-এ, আর উপাসনার অধ্যাপক পিসেমশাই সেইসময় সপরিবার লাঞ্চ শেষ করে একই রেস্তোঁরা থেকে বেরুচ্ছেন।

"পিসেমশাই, এর নাম বলরাম, আমাদের ক্লাসের ভাল ছাত্র", আচমকা ধরা পড়ে বুদ্ধিমতী উপাসনা প্রতিকূল পরিস্থিতি সামলে নেবার চেষ্টা করেছিল।

আমার অবশ্য একটু খারাপ লেগেছিল। আমাকে ক্লাসের ভাল ছাত্র বললো কেন উপাসনা? অথচ আমি তো নিতান্ত সাধারণ। ফার্স্ট সেকেন্ড হই না, আবার ফেল করি না এই পর্যন্ত। পরিস্থিতি সামাল দেবার পরে আমার আপত্তি মন দিয়ে শুনলো উপাসনা। "তুমি একটু মন দিলেই সেরা হতে পারো", এবার মৃদু বকুনি দিয়েছিল উপাসনা। আর আমি সংসারের নির্মম সত্যটা বুঝেছিলাম, মাঝারিদের কোনও সামাজিক স্বীকৃতি নেই, এমনকী ব্যাকরণেও মধ্যপদলোপী সমাসের জয়জয়কার!

অধ্যাপক পিসের সঙ্গে হেড-অন-কলিশনটা রেস্তোঁরায় বসে খাবারের আনন্দটা নষ্ট করে দিল। উপাসনার সেদিনের মুড দেখেই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম। তার প্রশ্ন : "এত রেস্তোরাঁ থাকতে আমাদের এখানে আসা কেন?"

প্রত্যেকটা রেস্তোরাঁ যে পাবলিক প্লেস তা ওকে বুঝিয়ে লাভ নেই। পিসেমশাই সংস্কৃতের অধ্যাপক—নিষ্ঠাবান অধ্যাপকের বোঝা উচিত এইসব রেস্তোরাঁয় হ্যাম পিগ বিক্রি হয়। বেচারা উপাসনা আমাকে বলেছিল, পিসেমশাই ভীষণ মডার্ন। বৈদিক যুগে ভারতীয় বাজারে নাকি এসব বিক্রির জন্যে আলাদা দোকান ছিল, নাম শুকরিকা!

সেই উপাসনা মুখার্জি এখন হ্যাম বেকন ইত্যাদি স্পর্শ করে না। আমিও

ওসব মাংস খাই না স্বাস্থ্যের কারণে। উপাসনা বলে, "বড্ড নোংরা। সায়েবরাও একদিন এসব মাংস খাওয়া ছেড়ে দেবে, তুমি দেখে নিও।" খাওয়ার ব্যাপারে বহুদিন আমি উপাসনার অন্ধ অনুরাগী। ও যা খেতে বারণ করে তা আমি খাই না। পৈতৃক শরীরটাকে নোংরা জীবজন্তুর কবরখানা করে তুলে লাভ যে নেই তা সঠিকভাবে বুঝতে মানুষের পাঁচটা মিলেনিয়াম লেগে গেল।

বরাহমুক্ত হলেও উপাসনা আজ অনেক রকম আকর্ষণীয় রান্না করেছে। উপাসনা শান্তভাবে তাকিয়ে দেখছে স্বামীর মাধ্যমিক আহারপর্ব যার নাম লাঞ্চ। আমি অনেকদিন বাজার-হাট করি না, শুনেছি যাঁরা রিটায়ার করেন তাঁদের বাজারে যেতে হয়, স্কুলে যেতে হয়, সিইএসসি ক্যাশ অফিসে লাইন দিতে হয়, টেলিফোন অফিসেও ঢুঁ মারতে হয়। আরও যেতে হয় সরকারি পোস্টাপিসে প্রত্যেক মাসে। অর্থাৎ দুনিয়ার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ার জন্যেই রিটায়ার করা লোকদের বেঁচে থাকা

উপাসনার দেওয়া খাবারগুলো খেতে খেতে এই অধমের মাথায় নানা চিন্তা আসছে। সদ্য অবসর পাওয়া স্বামীকে ঝপ করে আর্থিক পরিবর্তনটা বুঝতে না দেওয়ার জন্যেই একটু বেশি পদের আয়োজন। আমি উপার্জন এবং ব্যয়ের হিসেব ভুলে যাইনি। কোন ডিপোজিট থেকে কত পার্সেন্ট হারে কত সুদ অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে তা প্রথমে মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে হবে। তারপরের হিসেবটা কষ্টকর—কীভাবে ঐ সুদের পয়সায় কী জিনিস কেনা যাবে তা ঠিক করে ফেলা। আজ উপাসনা যা আয়োজন করেছে তা যে আমার সাধ্যের অতীত তা বুঝেও মনের আনন্দে খেয়ে চলেছি।

হিসেবের টাকা আনা পাই মাথায় ঢুকিয়ে নিয়ে ভাবতে ভাবতে কখন একটু হেসে ফেলেছি। ব্যাপারটা উপাসনার নজর এড়ালো না। হাসছি কেন জানতে চাইছে সে।

অস্বস্তি এড়াবার চেষ্টায় আমি বললাম, "আজকের কাগজে লিখেছে, ৫৫ বছর থেকে প্রত্যেক মানুষের প্রতি দশকে দশ পার্সেন্ট কম ক্যালরি

খাওয়া উচিত। তার মানে, ভগবান আন্দাজই করেছিলেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যত ইচ্ছে কেনাকাটার সঙ্গতি এদেশের বৃদ্ধদের থাকবে না।"

আমার কথায় খুশি হলো না উপাসনা। তার মন্তব্য : "কী যে সব বলো তুমি!"

প্রত্যুত্তরের চেষ্টা না করে আমি চুপ করে গেলাম। কারণ পয়সাকড়ি নিয়ে উপাসনা কখনও তেমন আগ্রহ দেখায়নি। আমি অফিস থেকে যা আনতে পেরেছি তাতেই সে সন্তুষ্ট হয়েছে।

মধ্যাহ্নভোজনপর্ব সেরে আমি শিবঠাকুরের মতন ডাইনিং চেয়ারেই হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রামসুখ উপভোগ করছি। মদীয় সহধর্মিণী ইতিমধ্যেই নিষ্ঠাভরে এ ঘরের কোণে সন্তোষী মায়ের ভজনা শুরু করেছেন। প্রাচীন ভারতীয়দের মস্তিষ্ক সত্যিই উর্বর ছিল, সুখেশান্তিতে বেঁচে থাকতে হলে সন্তুষ্টি যে নিত্যপ্রয়োজনীয় তা বুঝেই দেবী সন্তোষীর সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা। কি সীমাহীন বিস্তৃতি এই সব স্পেশাল ব্রান্ডের। সময়ের সীমানা, ভূগোলের সীমানা পেরিয়ে যুগে যুগে মানুষের বুকের মধ্যে এইসব দেবদেবীর নিত্য বসবাস, অথচ কোথাও কোনও বিজ্ঞাপন নেই, বিপণনের সামান্য প্রয়াসও নেই। স্পনসরও নেই আজকাল। মুদ্রণমাধ্যম, ইলেকট্রনিক মাধ্যমও কোনও সাহায্য করে না, বরং চান্স পেলেই একটু ব্যঙ্গোক্তির কটুরস ছড়িয়ে দেয়, তবু ব্রান্ডের বয়স বাড়ে না, দাপট কমে না, জয় মা সন্তোষী। তাঁর মহিমা ছড়িয়ে পড়েছে হৃদয় থেকে হৃদয়ে, সংসার থেকে সংসারে, দেশ থেকে দেশান্তরে, একাল থেকে অনাদিকালে।

স্ত্রীর ধৈর্যকে মনে মনে প্রশংসা করলেও আমি কিন্তু অল্প অধীর হয়ে পড়ছি। ঘরের এককোণে বসে, শরীরকে দীর্ঘ সময় ধরে অভুক্ত রেখে সন্তোষী মায়ের কাছ থেকে কী চাইছে উপাসনা যা এতোবছর ধরে চাওয়া হয়নি?

তাছাড়াও অন্য সন্দেহর অবকাশ আছে। দেবতারা আজকাল অত্যন্ত সাবধানী হয়ে উঠেছেন! করজোড়ে প্রার্থনা করলেই যদি পাওয়া যেত! এতো বুদ্ধিমতী হয়েও উপাসনা কেন বোঝে না ব্যাপারটা?

এদেশে উপাসনার মতন ধীরস্থির মেয়েরা অনেক শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সে হয়তো জানে, চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। চাওয়াটাই এক ধরনের আত্মচিকিৎসা, এক ধরনের সাধনা যা মানুষকে ধীরে ধীরে আত্মশুদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

উপাসনা ঘরের কোণে বসে পুজো করছে আর আমি ভাবছি বহুদিন আগের এক কমবয়সী কুমারী উপাসনা মুখার্জির কথা। যে কলেজে আমার সহপাঠিনী ছিল। সুন্দরী ও সুদেহিনী বালিকার সুনজরে পড়বার জন্যে আমাদের পুরুষ বন্ধুদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অভাব ছিল না।

প্রতিদ্বন্দ্বী বলে নিজেকে জাহির করবার মতন শক্তি তখন আমার ছিল না। আমি যে একজন অতি সাধারণ সীমিত সামর্থ্যের মানুষ তা আমি মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারতাম না। তবে কেন জানি না উপাসনা নামক সহপাঠিনীকে আমি মনেপ্রাণে চেয়েছিলাম। ইচ্ছাপূরণের সাধনায় শেষ পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে পাড়ি দিয়েছি, মন্দিরে মাকে বলেছি, মা আমাকে উপাসনার যোগ্য করে দাও। আমি শুনেছি শক্ত শক্ত কেসগুলোতে মন্দিরের দেবদেবীরা কিছুই মন দিয়ে শুনতে চান না, কিন্তু নিরাশ হবার অবকাশ নেই, যে চায় সে লাজলজ্জা হারিয়ে মায়ের কাছে নিরন্তর চেয়ে যেতে চায়।

মায়ের কাছে চুপিচুপি চাওয়া ছাড়া আর কী করেছি আমি? বইতে পড়েছি পবিত্র প্রেমের জন্যে মানুষ কত ত্যাগ করে, কত অসাধ্য সাধন করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। আমি কোনোরকম কষ্টের পথে যাইনি। পড়াশোনার বাইরে আমার করার মধ্যে একটা প্রাউভেট টিউশনি। সেই টাকাটা নিয়েই মাসে একদিন সামান্য একটু অ্যাডভেঞ্চার। উপার্জিত এই অর্থ আমি উপাসনার পায়ের কাছেও রেখে দিতে পারতাম। উপাসনা জানতো, আমি বাড়ি থেকে কলেজের মাইনে এবং গাড়িভাড়া পাই। উপাসনা জানতো, বহুবছর আগে আমার দাদু জেলা ইস্কুল থেকে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এসে মেসে উঠেছিলেন। প্রথমদিনে তাঁর বাবা টাকা দিয়েছিলেন টুইলের দু'খানা রেডিমেড শার্ট

কিনতে, ইস্টবেঙ্গল সোসাইটিতে মোট দাম পড়েছিল তিন টাকা। তারপর বিশ্বাসদের একটা বংশধারা গড়ে উঠেছিল, বাবা কাকা আমি সবাই ভর্তি হওয়ার দিনে কলেজ স্ট্রীটের সেই দোকান থেকে একই আইটেম কয়েকবছর অন্তর কিনেছি। যা তিন টাকা ছিল তাই দুই প্রজন্মে বাড়তে বাড়তে সাড়ে চারশো টাকা হয়েছে শুনে দাদু বেশ কিছুটা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

দাদু বলেছিলেন আমাকে, "এই নাও তিনটে রুপোর টাকা। তোমার ছেলেকেও প্রথম দিনে আমাদের চেনা ওই দোকানে পাঠাবে। তুমি দেখবে, টুইল শার্ট তখনও চলছে!"

তিন টাকার ধুতি শার্টের গল্প শুনে উপাসনা মুখার্জি খুব হেসেছিল। ওর ধারণা, ধুতি এবং টুইল শার্ট পরার রেওয়াজ ইতিমধ্যেই উঠে গিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত উপাসনা যে আমার কাছেই আসবে তা আমার কল্পনার মধ্যেও ছিল না। আমাদের ক্লাসের এক নম্বর ছাত্র শারদ সেনগুপ্ত তখন উপাসনা বলতে পাগল। বিদ্যাস্থল থেকে বেরিয়ে কর্মক্ষেত্রে শারদ সেনগুপ্ত একদিন যে খুব বড় হবে তা অনেকেই আন্দাজ করেছিল। কিন্তু বান্ধবী মহলে তখন অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা ছড়িয়ে পড়ছে। ভাল ছাত্র হলেই ভাল হাজবেন্ড হয় না। ব্রিলিয়ান্ট স্বামী নির্বাচন করার নেশায় অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এবং শেষ পর্যন্ত সফল হয়েও কেউ কেউ পরবর্তী জীবনে হাতে ফোস্কা নিয়ে পতিগৃহ থেকে পিত্রালয়ে ফিরে এসেছে। রমলা সেনের কথাই ধরা যাক, দু'জনে রাজযোটক মিল, বিমলেন্দু সেন যদি গোল্ড মেডালিস্ট হয়, রমলাও ফার্স্ট ক্লাস। রমলা দিল্লিতে চাকরি করে। বিমলেন্দুর রিসার্চের কাজ এগিয়ে দিয়েছে, তারপর তার সন্তান ধারণ করেছে। কিন্তু খ্যাতিবান হয়ে, বিত্তবান হয়ে, দেশে-বিদেশে সম্মানিত হয়ে সাফল্যের মধ্যগগনে পৌঁছোবার আগেই বিমলেন্দু সেন ত্যাগ করেছে রমলাকে।

"পুওর রমলাদি!" উপাসনা একসময় খুব দুঃখ করেছে। পৃথিবীতে সব সময় সবচেয়ে দামি বস্তুটি নিজের আঁচলে বাঁধবার জন্যে মেয়েরা কেন

এমন পাগল হয়ে ওঠে তা উপাসনা কিছুতেই বুঝতে পারে না। তাই ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত বলরাম বিশ্বাসকেই নির্বাচন করেছে। ওই যে মাসে একদিন বলরামের নিজস্ব টিউশনির টাকায় দু'জনে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো, ওখানেই বলরামকে থরে থরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে আবিষ্কার করেছে উপাসনা মুখার্জি।

ঘরের কোণে বসে যে রমণীটি এই মুহূর্তে সন্তোষী মায়ের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণের আপ্রাণ চেষ্টা করছে, সে একবার বন্ধুবান্ধবীদের নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিল। তখন পারস্পরিক টেনশন অনেকখানি কেটে গিয়েছে, কে কাকে স্থায়িভাবে গ্রহণ করবে তা ঠিক হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছে করলে উপাসনা হয়তো একজন হাই অফিসারের স্ত্রী হতে পারত, কিন্তু ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে সে আর এক বান্ধবীকে বলেছিল, "আমি ভাই অল্পে সন্তুষ্ট হওয়া মানুষ। বলরাম তো ঘরে বসে নেই, একটা কাজ তো পেয়েছে কলকাতা শহরে, ওতেই আমাদের চলে যাবে।"

কিন্তু তখন আমার মানসিকতা অন্য ধরনের। আমি জানি আমার সহপাঠী এবং বন্ধুদের অনেকে ঢের ভাল কাজ জোগাড় করেছে। দৌড়ের এই তো শুরু। সদ্যনির্বাচিতা সহধর্মিণীদের অনুপ্রেরণা যথেষ্ট পরিমাণে পেলে আমার বন্ধুরা যথাসময়ে আরও ভাল লাভ করবে।

সেদিন উপাসনার বাড়িতে একটু পরেই ভারতী মুখার্জি তার স্বামী শুভময়কে নিয়ে হাজির হয়েছিল। বান্ধবীরা দুষ্টুমি করে প্রশ্ন করেছিল, "অত টাকা নিয়ে তোরা কী করবি, ভারতী?" ভারতী ইতিমধ্যেই অধ্যাপনা শুরু করে দিয়েছে আর শুভময় তো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। ভারতী সকৌতুকে বলেছে, "এ জীবনে নো রিস্ক নো গেইন। মালাবদল না করেই নিজের প্রাণের লোকটিকে বিলেতে পাঠাতে হয়েছিল বিলিতি চার্টারের জন্যে। প্রবাসে দৈবের বশে যদি কিছু অঘটন ঘটে যেত, তা হলে আমাকে সারাজীবন জ্বলেপুড়ে মরতে হত।"

উপাসনারা বলেছে, "ভারতী, তুমি সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার। একটি সন্ন্যাসীসাধিকার মতন মুখের ভাব করে আটপৌরে শাড়িপরে

নিতান্ত সাধারণভাবে তুমি সারাক্ষণ পড়াশোনায় ডুবে থাকতে, কোথাও চঞ্চলতা ছিল না। আমরা ভাবতাম, ঋষিরা ছাত্রদের ভাবগতিক সম্পর্কে সেযুগে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু ছাত্রীদের তপস্যা সম্বন্ধে কোনো ফতোয়া নেই, কোথাও তো তাঁরা বলেননি, ছাত্রীনাম অধ্যয়নং তপঃ।"

ভারতী উল্টোচাপ দিয়েছে, বলেছে, "তোমরা নিজেদের দোকলাটি সামলাতে এমন ব্যস্ত থাকতে যে আমার গতিবিধির দিকে ভালভাবে তাকাবার সময়ই পাওনি। উপাসনা, তোর মনে আছে? একবার কলেজ থেকে বেরিয়ে তোকে নিয়ে আমি ডালহৌসির টেলিফোন অফিসে গেলাম।"

"ইয়েস, আমি তখন লন্ডন কল করলাম। কেন? সেদিন ছিল শুভময়ের জন্মদিন—বিছানা ছেড়ে গ্রীনউইচ টাইমে আপিস যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। উঃ কলকাতার টেলিফোনটা তখন যে কী ভীষণ সমস্যা ছিল। জন গ্রাহাম বেল ক্যালকাটা টেলিফোনের অবস্থা সেসময় দেখলে তৎক্ষণাৎ ফেইন্ট হতেন। তা উপাসনা, বাড়ি ফেরার সময় তুমি সারা রাস্তা শুধু বলরাম বিশ্বাসের নির্লজ্জ গুণকীর্তন করলে, বললে 'জেম অফ এ পার্সন।' তুমি কিন্তু আমাকে একবারও আমার মানুষটি সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করলে না।"

"উঃ ভারতী! তোমার উচিত ছিল ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসে জয়েন করা—টেলিফোন হাউসে পাবলিক কল বুথে আমাদের নিয়ে গেলে কিন্তু কিস্‌সু বুঝতে দিলে না। বাইরে ভীষণ আওয়াজ হচ্ছে বলে এই ছুতো করে তুমি টুক করে কাঁচের বাক্সের মধ্যে ঢুকে গেলে। বুথের দরজাটা পর্যন্ত ভেজিয়ে দিলে, ওখানে যে তুমি ওভারসিজ প্রেম নিবেদন করছ তা বুঝব কী করে?"

"এটিকে জোটালে কী করে ভাই?" সুরসিকা উপাসনা সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল বান্ধবী ভারতীকে।

"দাদার বন্ধু! একই কোচিং-এ দাদার সঙ্গে পড়ত। কিন্তু বুঝতেই পারছ, এক্সপোর্ট কোয়ালিটির মেটিরিয়াল!"

"উঃ দাদার বন্ধুগুলো না থাকলে কলকাতার মেয়েগুলোর যে কি দুর্গতি হত!" উপাসনা কপট উদ্বেগ প্রকাশ করল।

"রাখ রাখ, উপাসনা। যাদের দাদা নেই তাদের আর ভাল বর সিলেকশন হচ্ছে না, সবাই আইবুড়ো পিসি হয়ে বাপের বাড়িতে রান্নাবান্না সামলাচ্ছে!"

বান্ধবীদের মধ্যে তখন ভারতীরই সবচেয়ে বেশি গ্ল্যামার। ভারতীই আবার মিলিত হবার প্রস্তাব দিয়েছে। কিছুদিন পরেই ভারতীর স্বামীর পাওয়া কলিন স্ট্রিটে কোম্পানির ফ্ল্যাটে ওরা আবার কয়েকজন জড়ো হয়েছে। তখনও ওদের টু-চেক নো-কিড ফ্যামিলি, বিলাসিতার ছোঁয়া একটু ছিল। ঘর সাজানো, ছবি কেনা এটসেটরার দিকে নজর।

এতো টাকা নিয়ে ভারতী, কী করবি? বন্ধুদের হাল্কা প্রশ্ন। ভারতীর উত্তর: তোরা ভাবছিস বহু টাকা জমিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনকে যথাসর্বস্ব উইল করে দিয়ে কেওড়াতলায় চলে যাব। আমিও একসময় তাই ভাবতাম। কিন্তু এখন দেখছি, মনের মতন শাড়ি কিনে কিনে একটা পয়সা জমাতে পারছি না। শুভময়ের অবশ্য ইচ্ছে, আমি যত ইচ্ছে শাড়ি কিনে যাই। যদি হঠাৎ মরে যাই, ও একটা ভারতী শাড়ি মিউজিয়াম স্থাপন করে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসকে দিয়ে যাবে।

আমি অবশ্য বলেছি, ওখানে দাঁত ফুটোতে যেও না! ওখানে স্যর বীরেন মুখার্জির বউ, রবি ঠাকুরের স্নেহধন্য লেডি রানু রয়েছেন, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান হয়ে বসে আছেন। ওঁর শাড়ি সংগ্রহের সঙ্গে লড়তে গেলে শুভময় মুখুজ্যে দশ জন্ম ট্রাই করেও কিছু করতে পারবে না।

এর পরে ভারতী মুখার্জি আমার দিকে একটু নজর দিয়েছিল। তার মিষ্টি প্রশ্ন "তা বলরাম, হাউ ইজ লাইফ?"

"সাধ আহ্লাদ সামনে রেখে কোনওরকমে একঘেয়ে জীবনটা চালিয়ে দেওয়া, ভারতী।"

"ওসব ইয়ারকি ছাড়ো। তুমি চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়। চুপচাপ থেকে, কারও নজরে না পড়ে, টুক করে বল পেয়েই গোল করেছিলে! উপাসনা,

তোমার বর সত্যিই এক্সপার্ট, আমরা কোনওদিন ভাবিনি উপাসনা মুখার্জির গোল্ড মেডেলটা ওই বলরাম বিশ্বাস অমনভাবে তুলে নেবে।"

চাকরির ব্যাপারে আলোচনা আমার পক্ষে চিরকালই অস্বস্তিকর। আমি ভারতীকে এই আলোচনায় কোনোরকম উৎসাহ দিইনি। উপাসনা বলেছিল তার বান্ধবীকে, "আমরা দু'জনেই হলাম জাত কুঁড়ে। জীবন সম্বন্ধে, কেরিয়ার সম্বন্ধে, ইনকাম সম্বন্ধে বেশি ভাবতে আমাদের ভাল লাগে না।"

ভারতীর প্রতিবাদ : "সে বললে তো হবে না, উপাসনা।"

উপাসনার উত্তর : "ও বলে, আমাদের কত পূর্বপুরুষ এই পৃথিবীর বসবাস করে গিয়েছেন, তাঁরা বিষয়-আষয়, এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কতসব চিন্তা করেছিলেন কিন্তু কে সেসব মনে রেখেছে?"

সেবার কলিন্‌স স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে একটু খারাপ লেগেছিল। মাসের শেষ সময়। ট্যাক্সি খরচ বাঁচিয়ে বাসের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া পথ ছিল না। আবার সম্পন্ন গৃহস্থের আতিথ্য গ্রহণ করার পরে পাবলিক বাসের খোঁজ করলে গৃহস্বামীর মানসম্মান বিপন্ন হয়। আমি ও উপাসনা একটু বেশিক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম বোধ হয়। আর একজন অতিথি ফিয়াট গাড়ি নিয়ে বাস স্ট্যান্ডের সামনে এসে দাঁড়াল। ফিয়াট চালাচ্ছে অসীম চ্যাটার্জি। সে বিয়ে করেছে শালিনী ব্যানার্জিকে। ওরা কোনো কথা শুনলো না, আমাদের দু'জনকে লিফ্‌ট দিতে চাইল। অসীম বললো, কখন বাস আসবে ঠিক নেই।

এই অসীমই এক সময় উপাসনার কৃপাদৃষ্টির ব্যাপারে ভীষণ আগ্রহী হয়েছিল। উপাসনাকে সে ব্যক্তিগত একটা চিঠিও লিখেছিল।

এই প্রেমপত্রের খবর আমার অজানা নয়। উপাসনা আমার কাছ থেকে কখনও কিছু লুকিয়ে রাখতো না। অসীমের নতুন গাড়িতে চড়ে আমি ড্রাইভারের পাশে-বসা সুবেশিনী শালিনী চ্যাটার্জিকে দেখছি। শালিনী মানেই তো সুন্দরী। আমি অস্বস্তিতে পড়ে যাচ্ছি—পরের গাড়িতে চড়ে উপাসনার মনটা খুঁজবার চেষ্টা করছি। সবই তো ওর হাতে ছিল। ইচ্ছে

করলে উপাসনা চ্যাটার্জি হয়ে আজকে স্বামীর পাশের সিটে পরম সুখে বসতে পারত, এইভাবে বাসের জন্যে ব্যর্থ অপেক্ষা করে অপরের লিফ্‌ট নিতে হতো না।

মেয়েরা সত্যিই আশ্চর্য! নিজের পছন্দ অনুযায়ী কখন যে কী সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে দুম করে।

ড্রাইভারের পাশে বসে শালিনী পথ নির্দেশিকার কাজ করছে, সারথি স্বামীকে বলছে জোরের সঙ্গে টার্ন নেবার সিগন্যালটা দাও, টেম্পোর অত কাছে যেও না, ওরা বাহাত্তুরে বুড়োর মতন সারাক্ষণ কাঁপে। ড্রাইভারের সীটে বসে অসীম চ্যাটার্জির রসিকতা : বুড়ো নয়, পথের মাতাল ওরা, একটা চাকা কম বলে ওদের কোনো কিছু হারানোর ভয় নেই!

উপাসনা কি এই মুহূর্তে সত্যিই অসীম চ্যাটার্জির কথা ভাবছে? তুলনা চলেছে কি এই অধম বলরাম বিশ্বাসের সঙ্গে? ওকে দোষ দেবার কেউ নেই। এই পৃথিবীতে মেয়েরা এখন অনেক স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। অসীম চ্যাটার্জিকে গ্রহণ করেনি উপাসনা মুখার্জি ; কিন্তু দু'জনের কেউই নিজের ডিগনিটি হারায়নি। উপাসনা একদিন টুক করে আড়ালে ডেকে ওকে চিঠি দুটো ফেরত দিয়ে দিয়েছে। আমি ভেবেছি, ছেলেরা হলে প্রিয়ার চিঠি ফেরত দিত না। লুকিয়ে রেখে দিত সুভেনির হিসেবে।

ফিয়াট গাড়ির পিছনের সিটে বসে আমি মনে মনে বলেছি, অসীম, আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। উপাসনার মতন মেয়েকে দেখে, তার কথাবার্তায় আকৃষ্ট হয়ে, তাকে আরও কাছে পাবার স্বপ্ন দেখার মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। আমি জানি, অসীম চ্যাটার্জির মতন তরুণরা ভীষণ সলিড এবং নির্ভরযোগ্য হয়। মাত্রাধিক ইমোশনের ধাক্কায় এরা নড়বড়ে হয়ে যায় না। জীবনসঙ্গিনী নির্বাচন করাটা সংসারের অনেকগুলো কর্তব্যকর্মের একটা বলে মনে করে এই ধরনের পুরুষেরা। একজন যুবতী হ্যাঁ বলতে পারেনি বলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে নিজেকে তছনছ করে ফেলাটা এরা বোকামি বলে মনে করে। জীবনের এমন কি পরীক্ষা আছে যা দু'বার দেওয়া যায় না? উপাসনার ব্যাপারটা ক্লিক করেনি, কিন্তু শালিনী

ব্যানার্জির সঙ্গে সম্পর্কটা মধুরভাবে গড়ে উঠেছে। যৌবনকালের প্রেমের প্রতিযোগিতার মধ্যেও ঠাণ্ডামাথার সিদ্ধান্ত রয়েছে। অসীম চ্যাটার্জি, উপাসনা মুখার্জি, শালিনী ব্যানার্জি। নাম্বার টু ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ নাম্বার ওয়ান। সামাজিক ডিরেলমেন্টের সুযোগই দেয় না উচ্চাভিলাষী পুরুষরা। বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরা জীবনের সব পরীক্ষাতেই সাবধানী হয়, তারা এইভাবেই নিরাপদ নির্বিঘ্ন প্রেম করে। এক এক সময় সন্দেহ হয়, এরা বোধ হয় জন্মপত্র মিলিয়ে সব বুঝেসুঝে কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে সংসারের মসৃণ রাজপথ ধরে সবসময় এগিয়ে যেতে চায়।

অসীম চ্যাটার্জি, শালিনী ব্যানার্জি শান্তভাবে পড়াশোনা করেছে, সান্নিধ্যসুখের পরে ভাবের আদান-প্রদান করেছে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিন্তু সম্পর্কের কোনো পর্যায়েই তড়বড় করেনি। শালিনী বি. এ. অনার্সের পর যখন এম. এ. দিয়েছে, তখন অসীম চ্যাটার্জি বেরিয়েছে কমপিটিশন সাগরে চাকরির তিমি মাছ ধরতে। যথাসময়ে মনের মতন মাছ উঠেছে, তারপর ব্যক্তিজীবনে যা হবার তা হয়েছে।

আমি যদি উপাসনা হতাম, এইভাবে বাসস্ট্যান্ডের বিফল প্রতীক্ষায় মনটা আরও তিক্ত হতো, তারপর এইভাবে যদি প্রাক্তন প্রিয়জনের গাড়িতে বসতে হতো তা হলে কী করতাম? একটু দুঃখ, একটু হতাশায় একটু বিরক্তিতে মনটা ভরে উঠত কি? একবার নিশ্চয় মনকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করতাম না, ভুলটা কেন হলো?

শালিনী চ্যাটার্জি এই যে ভারিক্কিচালে স্বামীকে প্রতি মুহূর্তে ড্রাইভিং ইন্সট্রাকশন দিচ্ছে তাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করতাম, অসীমের লেখা চিঠিগুলোর কথা কি শুনেছ? ওগুলো তো তোমাকেই যথাসময়ে প্রেজেন্ট করাটা ছিল আমার কর্তব্য। আমি মাঝখান থেকে জীবনটাকে সহজ-সরল রাখতে চেষ্টা করলাম, অন্যের ব্যাপারে অকারণে জড়িয়ে পড়ে কোনও লাভ নেই এই সংসারে।

সেদিন অসীমের গাড়িতে বাড়ি পৌঁছে আমার কেমন একটু কিন্তু-কিন্তু লেগেছিল। মনে হচ্ছিল, নিজের গাড়ি না-থাকার জন্যে যে অসুবিধা হলো

তার জন্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত উপাসনার কাছে।

কিন্তু আমি দেখলাম, উপাসনা ওই ব্যাপারে একটুও মাথা ঘামাচ্ছে না। আসলে একালের মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়েরা অনেক প্র্যাক্টিকাল হয়ে উঠেছে। ইমোশনকে সারাক্ষণ ওরা পাত্তা দিতে চায় না!, কয়েকটা বছর কয়েকজন সহপাঠী বন্ধু ও বান্ধবীদের নিয়ে সামান্য হৈচৈ করা, তারপর সংসার জীবনে প্রবেশ। মাথায় সিঁদুর চড়িয়েই চঞ্চলা চপলা মেয়েরাও একটা গণ্ডি কেটে দেয় নিজেকে একটা বৃত্তের মধ্যে রেখে, সেখানে নিষিদ্ধ কাউকে ঢুকতে দেবার আগে হাজার ভাবে আমাদের মেয়েরা।

এসব অনেকদিন আগেকার কথা। এতদিন পরে চাকরি থেকে ভি-আর-এস নেওয়া আমি বলরাম বিশ্বাস অবসর জীবনের প্রথম দ্বিপ্রহরে বসে ব্যাপারগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

সম্পর্কের সমস্ত পরীক্ষা সময়ের ওপর দিয়ে। যেখানে যত চিড় খায়, ভাঙন ধরে সব সময় বাড়বার আগেই। বন্ধু-বান্ধবদের সব সম্পর্ক ডেনড্রাইটে জোড়া হয়নি, দু'একটা যে আদৌ জোড় খায়নি তা যথা সময় বোঝা গিয়েছে। পুওর রমলাদি, বিখ্যাত স্বামী বিমলেন্দু সেনকে বিদেশের নীলনয়না এক বিদেশিনীর কাছে জমা রেখে ফিরে এসেছেন স্বদেশে, নিজের সন্তানটিকে নিয়ে। ডাইভোর্স হয়েছে, কিছু খোরপোষ মিলেছে, কিন্তু এখনও রমলাদির অ্যাডমিরেশন কমেনি বিমলেন্দু সেনের প্রতি।

মাঝে মাঝে রমলাদি আসতেন আমাদের বাড়িতে লুচি খেতে। যতক্ষণ এখানে থাকতেন ততক্ষণ শুধু বিমলেন্দুর গুণগান। সেবার যখন কী এক অ্যাওয়ার্ড পেলেন বিমলেন্দু সেন। রমলাদি উৎসাহভরে ভূতপূর্ব স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। উপাসনাকে বললেন, "সৌজন্য ডিম্যান্ড করে ওকে একটা কংগ্র্যাচুলেশন পাঠানো।" বিমলেন্দু তো আর এক স্ত্রীর সঙ্গে দিব্য সুখে ঘরসংসার করছে, মাসোহারার কয়েকটা টাকা তার ব্যাঙ্ক থেকে চলে আসে রমলাদির ব্যাংকে, বিমলেন্দু ওছাড়া কোনো খোঁজখবর রাখে না।

সেবার আমার মাথায় গপ্পো লেখার ভূত চেপেছে। কলকাতার হরিপদ

কেরানি খ্যাতিমান হবার আর কোনও পথ খুঁজে না পেয়ে গল্পলেখক হবার লড়ায়ে নেমেছে। আমার প্রচেষ্টায় উপাসনার আগ্রহের অভাব নেই। উপাসনা ততদিনে বোধ হয় বুঝে নিয়েছে, সাধারণ কর্মজীবনের মন্থর লোকাল ট্রেনে উঠে পড়েছি আমি। প্রত্যেক স্টেশনে থামতে থামতে আমার ঢকঢকে গাড়ি যতক্ষণ হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল পৌঁছবে ততক্ষণে অন্যেরা আমাকে পেরিয়ে আসানসোল পৌঁছে গিয়েছে। কী অদ্ভুত অঙ্কবুদ্ধি এই গুড্‌হাউস কোম্পানির, এখানে কারুর কোনও উন্নতি হয় না। এরই মধ্যে ধোঁকা খেয়েছি আমি। আদিতে ছিলাম কর্মী ইউনিয়নের সভ্য, একজন সাধারণ অফিস কর্মী, গুড্‌হাউস কোম্পানির এক ঝানু সায়েব অনেক লোভ দেখিয়ে অনেককে ডিঙিয়ে আমাকে জুনিয়র অফিসার করে দিলেন। মাইনে এক পয়সাও বাড়ল না, কিন্তু সম্মান বাড়ল কর্মক্ষেত্রে এবং সমাজে। কিন্তু কোম্পানির কাছ থেকে দলবদ্ধ হয়ে কিছু চাইবার অধিকার চিরতরে চলে গেল। কত মাইনে পাও এখন থেকে প্রকাশ্যে তাও বলা চলবে না। ধৈর্যধরে কাজকর্ম করে আমি আমি জাতে উঠেছি শুনে উপাসনা খুশি হয়েছিল। পয়সাটাই সব নয় এই জীবনে। একজন কেরানি ও একজন জুনিয়র অফিসার তো এক জিনিস নয়। কিন্তু পয়সাটা তো অনেকটা, উপাসনা তখন বলেছে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক একটা গল্প লিখে ক'পয়সা পেয়েছেন? পয়সার ওপরেও এখনও কিছু আছে এই পচে যাওয়া হেজে যাওয়া কলকাতা শহরে।

অতএব সাহিত্যযশপ্রার্থী বলরাম বিশ্বাসকে বিশেষ মদত দেওয়ার জন্যে উপাসনা প্রস্তুত। স্বামী কিছু লিখলে উপাসনা দুপুরবেলায় সাংসারিক কাজকর্ম ফেলে রেখে তা সযত্নে কপি করে দেবে। যেমন স্বামীর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি কপি করতেন টলস্টয়ের বউ। এযুগে বউদের কাজগুলো ক্যানন কপিয়ার মেশিনে হয়ে যায়, আমি যখন লেখক হতে চেয়েছিলাম তখন জেরক্সের বিন্দুমাত্র দাপট ছিল না এই দেশে।

কিন্তু, পাণ্ডুলিপি কপি করবার আগে তো গল্পটা শেষ হওয়া দরকার। রমলা সেন এবং বিমলেন্দু সেনের গল্পটা নিয়ে আমি চিন্তা করেছি,

উপাসনার সঙ্গে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাও হয়েছে। আমি একটা হেরে যাওয়া মেয়ের প্যাথেটিক গল্প লিখতে পারি। এমন এক অভাগিনী স্ত্রী যে প্রাক্তন স্বামীকে ভুলতে পারছে না। উপাসনা এই দৃষ্টিকোণে উৎসাহিনী নয়। যদি লিখতেই হয় তা হলে লিখলে ওই বিমলেন্দু সেনকে একটা স্বার্থপর বাঁদর হিসেবে আঁকতে হবে, যে একজন ফেথফুল স্ত্রীকে ঠকিয়ে স্রেফ স্বার্থের লোভে অন্য এক মেয়েকে বিয়ে করলো। উপাসনাকে আমার প্রশ্ন, এই ধরনের গল্পে পাঠকের মনে কী প্রতিক্রিয়া হবে? উপাসনার বক্তব্য : "এফেক্ট এই হবে যে এদেশের মেয়েরা বোকার মতন বাঁদরদের পিছনে ছুটবে না। মস্ত উপকার হবে সংসারের।"

"শোনো উপাসনা, মানুষের উপকারের জন্যে আজকাল গল্পলেখার রেওয়াজ নেই। ওই মানসিকতা নিয়ে কলম ধরলে কথাসাহিত্য তার স্বধর্ম হারিয়ে নোটিশবোর্ডের বিজ্ঞপ্তি বা ক্যালকাটা কর্পোরেশনের প্রচার হয়ে যায় : যেমন ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচতে হলে মশারি টাঙান!"

উপাসনা তবুও একমত হচ্ছে না। তার আবেদন, "তুমি আঁতেলদের খপ্পরে পোড়ো না, প্লিজ। রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্করের হাতে পড়লে ওই মশারি, মশা এবং ম্যালেরিয়া অনুভূতির এমন পর্যায়ে উঠে যাবে যে পাঠকরা অভিভূত হবে।"

সেবার শনি-রবি দু'দিন ধবে আমি রমলাদি ও বিমলেন্দু সেনের কথা সংখ্যাহীন দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করেছি। আমার গল্পে অতি সহজে দেখাতে পারি, প্রাক্তন স্ত্রীর অভিনন্দনপত্র পেয়ে বিমলেন্দু সেন বিদেশের বসতবাটিতে বিব্রত বোধ করলো—অনেক ভেবে প্রখ্যাত সেন মহাশয় চিঠিটা ফেলেই দিয়েছিল, শেষে তাঁর মেমসায়েব স্ত্রীর অনুরোধে জানালো, আমি উত্তর দিচ্ছি না, তুমি বরং আমার হয়ে একটা উত্তর পাঠিয়ে দাও।

গল্পটার নাম কী হবে জানতে চাওয়ায় উপাসনাকে বললাম, "সতীন! আগেকার বহুবিবাহের দিনে মেয়েরা যেমন বহুকষ্টে সতীন-সামলানোর ব্যাপারটা শিখত, আজকাল ডাইভোর্স এবং পুনর্বিবাহের যুগে পশ্চিমি মেয়েরাও স্বামীর ভূতপূর্ব জীবনসঙ্গিনীদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন

করতে শিখছে।"

উৎসাহ দেখায়নি উপাসনা। ওর ধারণা, রমলা সেনের দুঃখ যতক্ষণ পাঠকের হৃদয়ে না পৌঁছুচ্ছে ততক্ষণ গল্পটা লিখে ফেলে একটা ভাল প্লট নষ্ট করা ঠিক হবে না।

রমলাদি এই সময়ে বেশ কয়েকবার আমাদের বাড়িতে এসেছেন, দুপুরবেলায় আমার স্ত্রীর সঙ্গে প্রাণভরে গল্প করেছেন। সমস্ত ব্যাপারটা জেনেও উপাসনা আমাকে কিছু বলেনি।

আরও কয়েকটা বছর পরে অঘটন ঘটেছে। বিখ্যাত বিমলেন্দু সেনের দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ প্যারিস থেকে কলকাতায় এসেছিল। তারও কিছুদিন পরে রমলাদি আমাদের বাড়িতে এসে উপাসনার কোলে মাথা রেখে হাউ হাউ করে কেঁদেছেন। কারণ বিমলেন্দু সেন নাকি আবার বিয়ে করেছেন। এতে প্রথমা স্ত্রীর কাঁদবার কী আছে, জিজ্ঞেস করায় আমার ওপর খুব বিরক্ত হলো উপাসনা। টপ সিক্রেটটা অবশেষে প্রকাশিত হলো। রমলাদি ডিভোর্স হবার পর দেশে ফিরে এসে শিবপুরের তান্ত্রিক গণক ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন। জন্মপত্র খুঁটিয়ে দেখে এই তান্ত্রিক স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, বিমলেন্দুকে আবার ফিরে পাওয়া যাবে। তাঁর ভাষাটি এই রকম : তোমার হারানো মাণিক আবার ফিরে আসবে তোমার কাছে, তখন যত্ন করে তাকে আঁচলে বেঁধে রেখো। এই শব্দগুলির কী তাৎপর্য হতে পারে তা নিয়ে রমলাদি গোপন সাহায্য চেয়েছিলেন উপাসনার। কিন্তু দিব্য করা ছিল। তাই উপাসনা নিজের স্বামীকেও কিছু বলতে পারেনি।

এবার একটা চমৎকার নিটোল গল্প আমার হাতের মধ্যে এসে যাচ্ছে, যার পিছনে রয়েছে দাম্পত্য সংগ্রামে পরাজিতা এক বিচ্ছিন্না মহিলার এক দশকের অধীর প্রতীক্ষা। কিন্তু ততদিনে আমি গল্প লেখক হবার স্বপ্ন গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়েছি। ভীষণ শক্ত এই অপরের জীবন নিয়ে মাথা ঘামানো। একটা মনের মতন পরিবেশ তৈরি করতেই মাথা ধরে যায়।

"এ আমার ভাল লাগে না, উপাসনা। আপিস থেকে ফিরে এসে টি-ভি দেখলে শরীরটা শান্ত হয়, ওখানেও চ্যানেলে চ্যানেলে ঘণ্টায় ঘণ্টায়

কত জীবন নিয়ে কতরকম টানাটানি—কিন্তু আমি একজন বাইরের ভদ্রলোকমাত্র, আমার কোনও দায়দায়িত্ব নেই। অথচ দ্যাখো, সামান্য রমলাদি ও বিমলেন্দুর কথা। একজনের প্রতি সিমপ্যাথি দেখাতে গিয়ে হয়তো অপরজনের প্রতি মস্ত অবিচার হয়ে যাচ্ছে। আসলে জোড়ে জোড়ে সেঁটে থাকবার জন্যেই নিখিল বিশ্বে পুরুষ ও রমণীর সৃষ্টি হয়েছিল কি না সেটাও তো একটা বড় প্রশ্ন। জুড়ে না থেকে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে থেকেও তো গাছেরা ডালপালার তরঙ্গ ছাড়ায়।"

উপাসনা শুনেছে, কিন্তু তর্ক করেনি। কেউ না চাইলে তো তাকে লেখক করা যায় না। আমার এক এক সময় গভীর কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে। উপাসনা ইজ এ ম্যাচিওর্ড পারসন। আমাকে সে আমার মধ্যে থাকতে সাহায্য করেছে।

খুটখাট আওয়াজ হচ্ছে। উপাসনার সন্তোষীসেবার একপর্ব এবার শেষ হলো বোধ হয়। এখনই আরম্ভ হবে পূজার দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বটা সাধারণত একটু ছোট হয়।

উপাসনা পুজো করছে, আর আমি ঠুঁটো জগন্নাথ ভি-আর-এস হয়ে বসে বসে ওর যুদ্ধটা দেখছি। যুদ্ধ কিনা বলুন, এই দুনিয়ায় কয়েক কোটি দেবদেবী উপস্থিত রয়েছেন, মর্তের মানুষদের সম্বন্ধে ইদানীং তাঁদের চিন্তাভাবনা একটু কম, কারণ ওঁদের তো ইলেকশনে দাঁড়িয়ে জনগণের ভোট ভিক্ষা করতে হয় না—এঁরা পরমসুখে হাউস অফ লর্ডসের লাইফ পিয়ার হয়ে বসে আছেন। এঁদেরই তাই দেবদেবী ভজনা করে সংসারের সমৃদ্ধি এবং শান্তি নিশ্চিত করা এ যুগে সোজা কাজ নয়। যে কোনও প্রতিষ্ঠানের সেলস্ ম্যানেজারের থেকে দুরূহ দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে আমার সহধর্মিণী উপাসনাকে।

উপাসনার সঙ্গে আমার সম্পর্কের শুরুটা আপনারা জানেন। কিন্তু তারপর এই ক'বছর কী হয়েছে, কেমন করে সুন্দরী সুদেহিনী উপাসনার সামনের চুলগুলো নিঃশব্দে শাদা হয়ে গেলো তার বিবরণ সংক্ষেপে সেরে

নিই।

আমি একজন নিতান্তই অর্ডিনারি পার্সন—একজন সুশিক্ষিতা রমণী আমাতে মুগ্ধ হয়ে তার মহামূল্যবান শরীর ও জীবন আমাকে সমর্পণ করেছে। বৈবাহিক জীবনে আমি তার জন্য বিশেষ কোনও সুখ বা সুবিধে সুনিশ্চিত করতে পারিনি। দাম্পত্যজীবনে আদিতেই একটা গয়ংগচ্ছ চাকরিতে ঢুকে জীবনযাত্রার গোরুর গাড়ি কোনোক্রমে চালিয়ে দিয়েছি। তবে উপাসনার দৈনিক পুজোর জোরে আমাকে কেউ হরিপদ কেরানি নামে উত্ত্যক্ত করতে পারবেন না, কেননা আমি একজন জুনিয়র অফিসার। এই পদের আধিকারীদের অদ্ভুত জীব বলতে পারেন, আমরা হাঁসও নই সজারুও নই। জুনিয়রও নই অফিসারও নই। পাকা আমটির মতন বয়োবৃদ্ধ মানুষ জুনিয়র কিন্তু কচি অফিসার হয়ে আমাদের রিপন স্ট্রিট আপিস আলো করে বসে আছেন, এবং অর্ডার সাপ্লাই করছেন কয়েকজন খেয়ালি, মেজাজি এবং অপদার্থ মনসবদারের।

আমার কেরানি সহকর্মীদের অনেকে ইদানীং বেশ চালু হয়ে গিয়েছে। শেষ বয়সে অফিসারপদে প্রমোশন দিলে অনেকে তা নিতে চায় না। জাতও যাবে পেটও ভরবে না। আমাদের অফিসে সেবার যখন 'খাসি' হলাম—অর্থাৎ কোয়াসি-এগজিকিউটিভ, অর্থাৎ আধা-অফিসার, তখন মাইনের দিনে মাথায় হাত। সত্যিই প্রমোশন হয়ে মাইনে বাড়া তো দূরের কথা, পরিমাণ কিছু কমেছে। সহকর্মী সুরেনবাবু তো সঙ্গে সঙ্গে চিঠি ফেরত দিয়ে দিলেন, অফিসার হতে চাইলেন না। আর আমি? কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে উপাসনাকে ফোন করলাম। সব শুনে সে বললো, "কোনও কিছু নিয়ে তা ফিরিয়ে দেওয়াটা ভাল দেখায় না। মনে আছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজকে নাইটহুড ফেরত দিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে কীভাবে নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন।"

কোথায় রবীন্দ্রনাথ, কোথায় স্যর উপাধি, আর কোথায় বলরাম বিশ্বাস এবং গুড্‌হাউস ইন্ডিয়া লিমিটেড।

আসলে আমার এবং উপাসনার দু'জনেরই কিছু অলিখিত অনালোচিত

সমস্যা রয়ে গিয়েছে। সহধর্মিণীকে তখনি প্রাণভরে দিতে চাই, জীবনসঙ্গিনীর সব প্রত্যাশাকে পূরণ করতে চাই, কিন্তু সামর্থ্যে কুলোয় না। আমি পদে পদে হেরে যাই। আমি জানি, যদি আমি জুনিয়র থেকে অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার পদে উঠতে পারতাম তা হলে উপাসনা কতটা আনন্দ পেতো। ওই লোকটা—অসীম চ্যাটার্জি দ্রুত প্রমোশনের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে কোথায় উঠে গেলো। বলাবাহুল্য, এদেশে স্বামীর উন্নয়ন হলে স্ত্রীরও অটোমেটিক প্রমোশন হয়। একবার গুজব রটলো, আমাদের গুড্‌হাউস কোম্পানি কিনে নিচ্ছে খৈতানরা, আর খৈতানদের প্রতিনিধি হিসেবে অসীম চ্যাটার্জিই হবেন আমাদের কোম্পানির সর্বেসর্বা। আমি ওই একটা দিনই কোনও জানাশোনা মানুষের অমঙ্গল কামনা করেছিলাম। সন্তোষী মায়ের সামনে বসে প্রার্থনা করেছিলাম, অসীমকে তুমি বড় করো, শালিনীকে তুমি রাজরানি করো, কিন্তু আমাদের কোম্পানিতে পাঠিও না। উপাসনার মানসিক কষ্ট আমি দেখতে পারবো না, মা।

ঠিক সেই সময় উপাসনা ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে ঠাকুরের সামনে প্রার্থনারত দেখে অবাক। আমি ধরা পড়ে গিয়েছি!

"কী প্রার্থনা করছিলে হঠাৎ?"

আমতা আমতা করতে করতে বললাম, "কিছুই প্রার্থনা করিনি, উপাসনা। আমি শুধু চাইছিলাম তোমার কষ্ট না হোক, তুমি ভাল থাকো।"

এই ভাল থাকার তখন অনেক মানে। উপাসনা তোমাকে সেদিন ঠকিয়েছিলাম, যাতে ভুলেও তুমি কষ্ট না পাও।

উপাসনা তখন ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। ব্যাপারটা নিতান্তই ব্যক্তিগত, কিন্তু বলে ফেলা ভাল। আমি যেমন উপাসনাকে সুখ সমৃদ্ধি স্বাচ্ছন্দ্য দিতে চেয়েছি, উপাসনাও পাগল হয়ে উঠেছিল আমাকে দিতে। বুঝতেই পারছেন এতক্ষণে, সে কী দিতে চাইছিল। বংশধর। বলরাম বিশ্বাসের শেষ অংশটা যাতে এই পৃথিবীতে থেকে যায়। কেন যে মানুষের নিজেকে অক্ষয় করার এমন ইচ্ছে হয় তা আমি কখনও বিশ্লেষণ করে দেখিনি। আমাদের বিবাহ আনন্দময়, কিন্তু নিষ্ফলা। এই নিষ্ফলা কথাতেও আমার প্রবল

আপত্তি। মেয়েমানুষ কিছু কাঁঠাল গাছ নয় যে জগৎসংসারকে খুশি করার জন্যে সারাক্ষণ ফলের ভারে নুয়ে পড়তে হবে।

উপাসনা আমার কথায় সন্তুষ্ট হয়নি। আমি একদিন টেলিফোন গাইডটা বাড়িতে এনে দেখিয়ে দিয়েছি, শত শত বিশ্বাস এইটুকু শহরের মধ্যে আলো করে বসে আছে, আমরা নিঃসন্তান হলে বিশ্বাসদের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

কিন্তু উপাসনা তখন আমার কথার উত্তর দিতো না। চুপ করে শুনে যেতো। সৃষ্টির বাসনা, নিজেকে পুনঃপ্রকাশিত করার ইচ্ছা যে মেয়েদের মধ্যে এতো প্রবল তা আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল না। এটিকে আদিম বাসনার স্বাভাবিক প্রকাশ বলে উড়িয়ে দেবার উপায় থাকতো না উপাসনার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে। পিপিং রেস্তোরাঁয় ওকে খাওয়াতে নিয়ে গিয়ে আবার সেই অধ্যাপক পিসেমশায়ের পরিবারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। এবার আর আগেকার মতন ধরা পড়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তা নেই। স্ত্রীকে নিয়ে স্বামী পার্ক স্ট্রিটে ডিনার করতে আসবে এতে কার আপত্তি থাকতে পারে? কিন্তু পিসিমা বেশ কিছু কথা উপাসনাকে শুনিয়ে দিলেন, "আর কতদিন কপোত-কপোতীর মতন দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াবে? এবার কিছু হোক, ছেলেপুলে মানুষ হতে আজকাল ভীষণ সময় লাগে, উপাসনা!"

পরিস্থিতির কী দ্রুত পরিবর্তন হয়। আমরা ইদানীং মোটেই চাইনিজ রেস্তোরাঁয় ঘুরে বেড়াই না। উপাসনা ওইসব ডিশ রান্না নিজেই শিখে নিয়েছে। শুক্রবারে রেস্তোরাঁয় এলেও আমরা ভেজিটারিয়ান—আমরা ভাতও খাই না। মাদার সন্তোষী আমাদের কাছে ভীষণ ইম্পর্টান্ট, সুতরাং খাওয়ারও নানা বাধানিষেধ!

বিবাহপূর্ব প্রেম পিসেমশায়ের পরিবারের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল একজোড়া যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশা—প্রকৃতি এই সুযোগে কোনও ফাঁদ পেতে বসলে পারিবারিক পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার আশঙ্কা। স্রষ্টার পুতুলরা সারাক্ষণ খেলতে চায়, কিন্তু ধরা দিতে চায় না,

আর সৃষ্টির মালিক যে পুতুলদের আচমকা ধরে নেবার জন্যে ফাঁদ পেতে চলেছেন ভুবনে ভুবনে তা সংসার অভিজ্ঞদের কে না জানে? বিশ্বসংসারের পিসিমারা কিন্তু ব্যস্ত মানুষ, বিবাহ নামক জংশন স্টেশনের পর মাতৃত্ব নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন আছে, সেখানে মেয়েরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত পিসিমাদের প্রত্যাশার অবসান নেই। মুশকিল এই যে, পিসিমারা যে সাংসারিক টাইমটেবিল অনুযায়ী তাঁদের গাড়িগুলো চালাতে চান, আজকালকার গাড়িগুলো সেই গতিতে নড়তে চায় না।

কে একজন দুঃখ করেছিল, মেয়েদের আমরা যন্ত্র মনে করি। ব্রেক ডাউন হোক চাই না, কিন্তু কর্তব্য ছাড়া ওদের কোনো মূল্যায়ন নেই। আবার আমার কখনও কখনও মনে হয়, মেয়েরাও পরস্পরের ব্যক্তিত্ব মেনে নেয় না, ভাবে মেয়ে মানেই একটা সিস্টেম। এই সিস্টেমে এরা সংসার চালায়, রান্নাবান্না করে, ভবিষ্যৎ নাগরিক উৎপাদন করে, তারপর সেই নাগরিককে গড়েপিটে রেডিমেড মানুষ হিসেবে সংসারের সেবায় সমাজের হাতে তুলে দেয়।

এ-কথা মুখ ফুটে উপাসনাকে বলিনি, কিন্তু বুঝেছি সন্তানধারণে অযথা বিলম্ব তাকেও ভয় ধরিয়ে দিয়েছে, সিস্টেমটা কাজ করছে না। এধার ওধার কয়েকজন ডাক্তারের কাছে ঘুরেছি আমরা, প্যাথলজিস্ট এবং গাইনোকলজিস্ট আমাদের শরীর নিয়ে নানাভাবে নাড়াচাড়া করেছে, তারপর হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে উপাসনা—অবশেষে সে মা হতে চলেছে। ওর চিন্তামুক্তি এবং আমার চিন্তার শুরু। মাতৃত্বের মাঝপথে প্রকৃতি আচমকা বেঁকে বসবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নানা ওষুধ, নানা ইঞ্জেকশনে ওর দুর্বল ও অসহায় শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করেও প্রত্যাশিত পথের শেষে পৌঁছনো যায়নি। গর্ভধারণকাল আর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কালের মধ্যে যে এমন দুর্গম দূরত্ব রয়েছে তা আমার বা উপাসনা কারও কাছে এর আগে স্পষ্ট ছিল না। ঈশ্বরকে নমস্কার জানিয়ে, একদিন ওকে শূন্য কোলে মাতৃত্বভবন থেকে বাড়ি ফিরিয়ে এনেছি। খেয়ালী মা সন্তোষী কখন কীভাবে যে তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করেন তার ঠিক নেই।

আগন্তুক আসবো আসবো করেও এলো না, একজন মাতৃত্ববিলাসিনীর সমস্ত দৈহিক এবং পারিবারিক আয়োজন-ই নষ্ট হলো—ব্যর্থ মাতৃত্বের যে কী চাপ তা বোঝাতে গেলে শতসহস্র শব্দ লিখতে হয়। সৌভাগ্য এই যে, এমন পরিস্থিতির কথা বঙ্গীয় জননীমহলে নিতান্ত অপরিচিত নয়। পাঠকরা সহজেই সবটা বুঝতে পারেন, এর জন্য রচনা-চাতুর্যের প্রয়োজন হয় না। কাব্য-নির্ভর হতে হলে বলা যায়, যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে, এটসেটেরা এটসেটেরা।

বিখ্যাত কবিতার লাস্ট লাইনে, মহাকবি নির্ভর করেছেন এক মহাসত্যের ওপরে--জানি হে জানি তা হয়নি হারা। একটাই বিনীত নিবেদন, যা প্রস্ফুটিত হয়নি বা যা সময়ের সীমানা স্পর্শ করেই ঝরে পড়েছে, তাও তো হয় না হারা। তবু না ফোটার দুঃখটা গাছের কাছে বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে জৈবিক কারণে অথবা ব্যর্থসৃষ্টির অসম্মানে।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে মনের মধ্যে একটাই উত্তর খুঁজে পাবেন। গাছ যখন রয়েছে, বাসনা যখন উপস্থিত, তখন আবার ফলবতী হতে বাধা কোথায়।

সামান্য কিছুদিনের মধ্যে বেচারা উপাসনা তার হৃতস্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে, তাই আবার ফিরে আসছে মাতৃত্বের ব্যাকুলতা যা আমাদের ধৈর্যকে ডিঙিয়ে যেতে ব্যস্ত।

আমি অবশ্যই প্রধান দুটি চরিত্রের একটি, কিন্তু আমি যেন অপরের ইচ্ছাপূরণের যন্ত্র। উপাসনা আবার সন্তানসম্ভবা হয়েছে। পূর্ণপাত্র তৈলের ন্যায় গর্ভবতীকে আচরণের উপদেশ দিয়েছেন আমাদের দূরদর্শী পূর্বপুরুষেরা। দ্বিতীয়বারে সে চেষ্টার কোনো ত্রুটি হয়নি, কিন্তু মাতৃত্বের মধ্যপথে আবার বিপর্যয়ের ইঙ্গিত।

সেই বিপর্যয়ে উপাসনার শরীরটা ধ্বংস হতে বসেছিল। সেবার মধ্যরাতে কলকাতার অভিজ্ঞ ডাক্তাররা ট্রলিতে শুয়ে থাকা উপাসনাকে মাতৃত্বাগারে নিয়ে যাবার জন্যে চলমান হয়েছিল। আমি কাছে থেকে বেচারা উপাসনার বিধ্বস্ত বিব্রত শরীরটা লক্ষ্য করেছিলাম। তার নাকে

নল। মোটা একটা ছুঁচে দেহটা তীরের মতন দেহকে বিদ্ধ করে রেখেছে। বিছানার রেলিং-এ কয়েকটা বোতল ঝুলছে। যেন অন্য কোনও গ্রহের মানুষ আমার এই উপাসনা। মাতৃত্বের পরীক্ষায় পাশ করে সাফল্যের সার্টিফিকেট পাবার জন্যে উপাসনা তবুও ব্যাকুল।

সেদিন চৈত্রমাস, তখনও শেষযামিনীর শুরু হয়নি। আমি অসহায়ভাবে অপারেশন থিয়েটারের সামনে পায়চারি করছি, আর ভাবছি জায়গাটাকে থিয়েটার কেন বলা হয়। ইংরেজিতে অন্য যা মানেই থাক, জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে এখানে কত নাটকই তো অভিনীত হয়, সায়েবদের সত্যিই রসবোধ আছে।

অপারেশন থিয়েটার থেকে যথাসময়ে ডাক্তাররা বেরিয়ে এসেছেন। আমি শঙ্কিত পদক্ষেপে নিতান্ত দ্বিধাভরে বিচারপ্রার্থী আসামির মতন ওঁদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। ডাক্তার নিচুগলায় জানিয়েছেন, ফল নষ্ট হয়েছে। তবে...

না, আর সেই পুরনো লেকচার, গাছ থাকলে আবার ফল ধরে আমি শুনতে চাই না। আমি গাছ চাই, ফলে সব আগ্রহ আমার নষ্ট হয়ে গিয়েছে চিরতরে। আমি তোমাকে চাই, উপাসনা, আর কিছুই চাই না।

যাকে এসব কথা বলা উচিত ছিল, সে তখন ইঞ্জেকশনের তেজে ঘুমের দেশে বিচরণ করছে। সে তখনও বিপন্মুক্ত হয়নি। সারারাত তার ওপর সতর্ক নজর রাখা হবে। আমি ঐ নজর রাখার উপযুক্ত নই, তাই আমি নজর রেখেছি নার্স ও ডাক্তারদের ওপর।

একজন প্রবীণ চিকিৎসক রাত্রে আমার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, "প্রেগন্যানসিটা অসুখ নয়, রমণী শরীরের স্বাভাবিক বিবর্তনমাত্র, প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীতে কয়েক হাজার নবজাতক মাতৃগর্ভ থেকে মুক্তি নিয়ে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। তবে কোনো কোনো জননীশরীর এর সঙ্গে তাল রাখতে পারে না। অথচ মানুষ তো ধানগাছের মতন ওষধি নয়। ওষধি জানেন তো? একটি ফল দিয়েই যার পরমায়ু শেষ হয়ে যায়।"

আমার স্ত্রীর পরমায়ু অতো শস্তা নয়। মাই ওয়াইফ ইজ মোর প্রেসাস

দ্যান মাই বংশধর। ডাক্তার, ওকে এবারের মতন ফিরিয়ে দিন, আমি কথা দিচ্ছি, সে আর কোনোদিন এই মাতৃসদনে জননী হতে আসবে না।

উপাসনা, তারপরেও তো আমাদের যুগলজীবনের কতদিন অতিবাহিত হয়েছে। সন্তানহীনতা আমরা নতমস্তকে মেনে নিয়েছি। উপাসনা আছে, আমি আছি, আমাদের বাইরে সুবৃহৎ বিশ্বাসংসারও আছে। দ্যাট ইজ এনাফ। আমরা এককোটি মানুষের এই কলকাতা শহরে কেন নিঃসঙ্গ বোধ করবো? যারা এখানে একাকীত্বের বেদনায় কাতর হয়ে ওঠে, তারা বোকা। রক্তের সম্পর্ক ধরে সম্পর্ক গড়ে তুলতে যারা ব্যগ্র তারা এখনও অ্যানিম্যাল। অমোঘ ইন্‌সটিংট-এর বাইরে যাবার কোনও চেষ্টাই নেই তাদের।

এসব অনেক আগেই ঘটেছে। উপাসনা সব মেনে নিয়ে, তার পিতৃদত্ত নামমাহাত্ম্যে ফিরে গিয়েছে। এখন নিত্য উপাসনাই তার জীবনপথের পাথেয়। সমাজের চোখে আমরা ওয়ান-চেক নো-কিড ফ্যামিলি হয়েছি, আর আমাদের কলেজজীবনের বন্ধু ও বান্ধবীরা টু-চেক নো-কিড ফ্যামিলি থেকে কেউ কেউ ওয়ান-চেক টু-কিড ফ্যামিলির সৃষ্টি করেছে। আমার এবার স্পেশাল স্ট্যাটাস নো-চেক নো-কিড। মাইনেও নেই, সন্তান পালনের দায়িত্বও নেই। মনকে সান্ত্বনা দিলাম, পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারতো। নো-চেক অথচ কিড্‌স।

দুপুরের পুজোর পরে উপাসনা টিভি দেখার ব্যবস্থা করছে। এই সময় কী একটা মেগাসিরিয়াল দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মেয়েরা কীভাবে সংসারের সব বিষ নিজেদের শরীরে গ্রহণ করে স্বামীর সংসারকে সচল রেখেছে তার গল্প। আমি তো একসময় গল্প পড়তাম, গল্প লেখারও ব্যর্থও চেষ্টা করেছি, কিন্তু একই গল্প প্রতিদিন আধঘণ্টা ধরে বছরের পর বছর কীভাবে চলতে পারে তা আমার বোধগম্য নয়।

উপাসনা কিন্তু মোটেই বিস্মিত হচ্ছে না। তার বক্তব্য : "মনে রেখো, এটা অর্ডিনারি সিরিয়াল নয়, মেগাসিরিয়াল। মেগা মানেই তো

মস্ত—যেমন ভারত নিয়ে মহাভারতের গল্প।"

"ইন্টারেস্টিং কথা বলেছো উপাসনা।" ওর কি মনে পড়ছে, বিয়ের আগে এক একসময় আমরা এই রকম বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডুবে থাকতাম।

"ভাল বলেছো তুমি উপাসনা। অর্ডিনারি ভারতীয়গুলোই রাইটার মিস্টার ভিয়াসার কলমের খোঁচায় মহাভারতের মহানায়ক হয়ে গিয়েছে।"

"মিস্টার নয়, মহাঋষি, ভিয়াস নয়, বেদব্যাস", উপাসনা কথাগুলো সংশোধন করে দিল। আমাদের অতীতকে ইদানীং সে ভীষণ শ্রদ্ধা করে।

আমি ভাবছি টিভির মেগাসিরিয়ালের কথা। বেদব্যাস কি তা হলে টিভি কোম্পানির দৌলতে আবার বেঁচে উঠছেন?

"একটা উপন্যাস, তা যত বড়ই হোক, তারও তো একটা শেষ আছে, উপাসনা।"

উপাসনা হাসলো। সে বললো, "এবার তো দুপুরে দু'একটা পর্ব দেখার সুযোগ পাবে। দেখো, তখন খুব ভাল লাগবে।"

আমি ভাবছি, দুপুর বেলায় বাড়িতে বসে থাকা ছাড়া যাদের কোনও উপায় নেই, তাদের তো টিভি-র মেগাভক্ত হতেই হবে। নিশ্চয় এই দেশের ঘরে ঘরে এমন মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, ফলে অদূর ভবিষ্যতে মেগাসিরিয়ালের বৃহত্তম মার্কেট হয়ে উঠবে এই বঙ্গভূমি।

আমার জানাশোনা এক বন্ধু সুকৃৎ সেনগুপ্ত মার্কেট রিসার্চে কাজ করে। মাঝে মাঝে কাজের সূত্রে ফ্রি স্কুল স্ট্রিট অফিস থেকে অনেকদিন রিপন স্ট্রিটে চলে আসতো। ধাওয়ানের সঙ্গে দেখা করার প্রতীক্ষাকালে সুকৃৎ আমার সঙ্গে গল্প করতো। মনে পড়ছে বটে, সুকৃৎ বলতো, টিভি দেখবার লোক ক্রমশই বেড়ে যাবে এই শহরে। মনে রাখবেন, বয়োজ্যেষ্ঠ লোকের সংখ্যাও বেড়েই চলবে। সামনে টিভি সেট না থাকলে অকর্মণ্য ও কর্মহীন লোকরা সমস্ত দুপুর কাটাবে কীভাবে?

সুকৃৎ সেনগুপ্তকে ওর মহলে সবাই সারকিট সেন বলে ডাকে। কোন্

সিরিয়ালের সঙ্গে কোন্ বিজ্ঞাপন জুড়ে দিলে কোন্ প্রোডাক্টের চাহিদা হুড়মুড় করে বেড়ে যাবে তা আগাম আন্দাজ করে দিতে আমাদের সারকিট সেনগুপ্ত অদ্বিতীয়।

আমার ঘরের দেওয়াল ঘড়িটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চারটের ঘরে এসে পৌঁছেছে। আমি এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি, সময় এই শহরের সব জায়গায় সমান বেগে চলছে না। রিপন স্ট্রিটের অফিস ঘড়িটার স্পিড আর আমাদের এই ফ্ল্যাটের ঘড়ির গতি অবশ্যই এক নয়।

নব পর্যায়ে সময়ের এই গতিপার্থক্য যদি অঙ্ক কষে আমি প্রমাণ করে দিতে পারি, তা হলে সামনের বছরে সুইডিস নোবেল পুরস্কার কে রোখে?

উপাসনা তার উপবাস সামলাতে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। চোখ বন্ধ করে আমার সোহাগিনী বিছানায় শুয়ে আছে। সেই একই বিছানা যা বিয়ের উপহার হিসেবে সঙ্গে নিয়ে উপাসনা স্বামীগৃহে এসেছিল। আমরা অবশ্য বেশ কয়েকবার এই বিছানার ঠিকানা পাল্টিয়েছি। অর্থাৎ এতোবছর ধরে শয্যার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন নেই। ধৈর্যহীন পশ্চিমদেশ হলে কয়েকবার শয্যার পরিবর্তন হতো, সেইসঙ্গে শয্যাসঙ্গিনীরও পরিবর্তন হতো। আমি বেঁচে গিয়েছি।

কিন্তু বিকেলের পড়ন্ত আলোয় ঘুমন্ত উপাসনাকে দেখে আমার মনে প্রশ্ন উঠছে, সত্যিই কি কিছুই পরিবর্তন হয়নি? বিছানা এবং মানুষগুলোর নাম এক রয়েছে, তবু যেন আলাদা। সেই যে উপাসনা ও আমি কলেজের বকুলতলায় প্রথম কথা বললাম, তারপর যুগলজীবনে একটা স্বপ্ন মনের পটে তিলে তিলে আঁকলাম, তারপর কিছু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ছবিটিকে সম্ভব করলাম, তারপর অনেক কিছু ঘটেও যেন কিছু ঘটল না।

না, আর বাড়িতে এইভাবে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকা যায় না। আমি এবার অফিস থেকে উপহার দেওয়া স্পিড শুটা পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম শরীরের ও মনের হাওয়া বদলের জন্যে।

আমাদের ছোটবেলায় নতুন জুতো পরাটা ছিল আনন্দ-বেদনার মিশ্র অনুভূতি। পায়ে ফোসকা পড়বেই, ব্যথা লাগবেই, তখনকার নতুন জুতো বাগ মানতে বেশ সময় নিত। এখন চর্মবিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য উন্নতি হয়েছে। এখন নতুন অবস্থা থেকেই সুখ। এখন আর ভাল কোম্পানির জুতোকে ধৈর্য ধরে বাগ মানাতে হয় না—মানুষের মতন নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গেই হনিমুন! স্পিড সুয়ের যে এতো সুখ তা কে জানতো? জয় হোক সায়েব মুচিদের। এরা পারেও বটে। যখন সায়েবরা ঠিক করল পায়ে হাঁটা এবং ছোটাছুটিতেই মানুষের ভবিষ্যৎ, অমনি শুরু হলো গবেষণা। ইতালিয়ানরা, জার্মানরা নিত্য নতুন পাদুকাচিন্তায় কামাল করে দিল—পদসুখ দেবার জন্যে তাঁদের কত গভীর গবেষণা। আমরা অবশ্য যে তিমিরে সেই তিমিরে। সেই কোন্‌কালে খড়ম আবিষ্কার করেছিলাম, তারপর আর টেকনলজির দিক থেকে একপা এগোইনি। অথচ আমাদের কবিরা যে পাদপদ্ম শব্দটি সৃষ্টি করেছিলেন তাকে অনুসরণ করেই যেন জার্মানিতে নিউ জেনারেশন জুতোর সৃষ্টি, যা কুসুমের মতো মৃদু, অথচ বজ্রাদপি কঠোর! ভাল জিনিস উপহার দিয়েছে আমার অফিসের ছেলেরা।

এপাড়ায় এখন পথচারীর সংখ্যা বেশ কম। আমি হাঁটছি, আর ভাবছি, নো-চেক নো-কিড হলেও তো আমাকে একটা পরিবার চালাতে হয়। চেক না থাকলে খরচের কিছু পরিবর্তন তো চাই! কিছু খরচ কমলেও মাসিক রোজগার তো প্রয়োজন। উপাসনা এতদিন এইসব বিষয়ে নাক গলায়নি, এখনও তাকে এই অপ্রিয় বিষয়ে কেন টানাটানি করবো?

শুনেছি, হাঁটার সময় মাথায় কোনও চিন্তা রাখলে হাঁটার সুফল পাওয়া

যায় না। মস্তিষ্কের সঙ্গে পেশির কোনো রেষারেষি আছে, পেশি যখন সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন ব্রেন একটু ফাঁকি দিতে চায়। কিন্তু সদ্য ভি-আর-এস পাওয়া মানুষের যদি কোনও চিন্তা না থাকবে তা হলে তো স্বর্গ ও মর্তে কোনও পার্থক্য থাকে না।

"হ্যালো, বিশ্বাসদা", উঁচুগলায় রাস্তায় কে যেন আমাকে ডাকছে।

স্বয়ং সারকিট সেনগুপ্ত রাস্তার অপর পারে দাঁড়িয়ে আছে। সুকৃৎ নামটা আমার মনে আসতে একটু দেরি হলো। রিপন স্ট্রিট অফিসে তো এমন হতো না! পরিণত বয়সে মানুষের ব্রেন তা হলে সত্যিই শুকোতে থাকে, ঠিকানা, টেলিফোন-নম্বর, নামধাম সব মাথার মধ্যে থেকেও মালিকের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে আরম্ভ করে।

সারকিট সেনগুপ্ত জানতেন না যে আমি এপাড়ায় বসবাস করি। এ-অঞ্চল ইদানীং জাতে উঠেছে। যে ধরনের বিত্ত থাকলে এ-পাড়ায় ভাড়াটিয়া হওয়ার গৌরব অর্জন করা তা আমার যে নেই তা সারকিট সেনগুপ্তর অজানা নয়।

সারকিট জানতে চাইছেন, পারিবারিক বাড়ি কি না? না, এখানে আমার পৈতৃক সম্পত্তি মোটেই নয়। মনোহরপুকুরের পৈতৃক আশ্রয় নিঃশব্দে ত্যাগ করতে হয়েছে এই মুখুজ্যে বাড়ির মেয়ে বিয়ে করে। আমার বিয়েতে বাবার তেমন আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাঁর শরিকরা কী বলবেন? সংসারে গৃহদেবতা সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন, তাঁর নিত্য সেবায় অসবর্ণ বিবাহের শাস্ত্রীয় বাধা টেনে এনে কী লাভ? তাই আমি বিয়ের আগেই ঘরভাড়া করেছিলাম। উপাসনাকে ধর্মীয় আচরণের বাধাবিপত্তিগুলো গোড়ার দিকে ঠিক বুঝতে দিইনি।

নানা জায়গায় বাসা বাঁধতে বাঁধতে শেষ পর্যন্ত একদিন যে এপাড়ায় ওয়ান বেড-রুম ফ্ল্যাটে হাজির হয়েছি তা সারকিট সেনগুপ্তকে জানিয়ে দিতে দ্বিধা হলো না। রিটায়ার্ড হবার আগে এতো বিবরণ অপরকে দেওয়ার এই মানসিকতা ছিল না।

সারকিটকে বললাম, "তখন প্রচণ্ড সস্তাগণ্ডার বাজার, মিস্টার

সেনগুপ্ত। বাড়িটা ছাড়িনি। তাই চিরকালই আমার যা আর্থিক সঙ্গতি তার থেকে একটু ভাল জায়গায় বসবাস করতে পেরেছি। এক একজনের স্টারে এমন সুযোগ এসে যায়। আমার এক নিতান্ত গেরস্ত বন্ধুর ব্যক্তিগত অ্যাড্রেস চৌরঙ্গি রোড, আমাদের বন্ধুদের ওতেই আনন্দ, বন্ধুর লেটারহেড দেখলে বুকটা ফুলে উঠতো।"

সুকৃৎ সেনগুপ্ত বললেন, "আপনি দেখবেন, এই শহরের মানুষ ক্রমশ আরও ঠিকানা সচেতন হয়ে উঠবে। বাড়িভাড়াও সেই অনুযায়ী ওঠানামা করবে। রাখাল বোস স্ট্রিট, মদন জানা লেন আর ম্যান্ডেভিলা লেন কখনও এক জিনিস থাকবে না।"

ঠিকানা সচেতনতা থেকে সমাজের কী উপকার হবে তা জানবার আগ্রহ আমার।

সুকৃৎ সেনগুপ্ত উত্তর দিলেন, "সিনিয়র সিটিজানদের উচিত এ বিষয়ে মেয়রকে নিয়মিত চিঠি পাঠিয়ে যাওয়া। স্রেফ রাস্তার নাম পাল্টে মেয়রমশাই অতিসহজে কলকাতার ভ্যালুয়েশন বাড়িয়ে যেতে পারেন। কত দামি রাস্তার আজেবাজে নাম দিয়ে কতকগুলো অশিক্ষিত লোক শহরটার ভ্যালুয়েশনের সর্বনাশ করছে।"

সারকিট সেনগুপ্তর এইপাড়ায় ছোট্ট একটা অফিসঘর আছে। সেখানে আমাকে নিয়ে গিয়ে হিটারে জল গরম করলেন, তারপর প্লাস্টিক গ্লাসে একচামচ নেসকাফে মিশিয়ে এগিয়ে দিলেন।

"একেবারে আমেরিকান সিস্টেম, বলরামদা! থ্রো অ্যাওয়ে প্লাস্টিক চামচ এখন মুরগিহাটায় ডজনদরে বিক্রি হচ্ছে। ধোওয়াধুইয়ির কারবার নেই, প্লাসটিক ব্যাগ পেতে রেখেছি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। অফিস বন্ধ করে নিজে ব্যাগটা গার্বেজ কালেকশন বক্সে ফেলে দিয়ে যাই।"

সুকৃৎ বললেন, "হাউ লাকি ইউ আর, বাতাইতলার রেটে আপনি সাউথে ভাড়া থাকেন।"

"আমাদের এক আশ্চর্য বাড়িওয়ালা, বুঝলেন সুকৃৎবাবু। বর্ধমানের ডাক্তার, কলকাতায় একসময় কিছু সম্পত্তি করেছিলেন। কারুর ওপর

কখনও ভাড়া বাড়াবার চাপ দেননি। উল্টে দু'একজন বুদ্ধিমান ভাড়াটিয়ারা স্পেশাল অ্যাপ্লিকেশন করে নিজেদের ভাড়া কমিয়ে নিয়েছে। বিশ্বচরাচরে এমন ঘটনা এখনও ঘটে!"

সুকৃৎ হেসে বললেন, "ভাগ্যবান, আপনারা। আমার এই অফিসঘরে এগারো মাসের লিজ। বছর পুরো হওয়ার আগেই বাড়িওয়ালা আমাকে হটিয়ে দেবে, না হলে মর্জি মতন ভাড়া বাড়াবে।"

আমার সবিনয় নিবেদন, "আমরা ভাগ্যবান ছিলাম, সুকৃৎবাবু। বাড়িওয়ালার লংলাইফের জন্যে সন্তোষী মায়ের কাছে অনেক প্রেয়ারও করেছি। কিন্তু সম্প্রতি তিনি দেহ রাখলেন। ডাক্তারের ওয়ারিশনরা অন্য জিনিস—তাঁরা হাঙ্গামা বাধাবেন মনে হচ্ছে।"

সুকৃৎ বললেন, "মাথা আছে, কিন্তু মাথা খাটাবে না বাঙালিরা। না হলে, ভ্যালুয়েশনের দিকে নজর না দিয়ে ভাল ভাল পাড়ার এতো আজেবাজে নাম দেয়? আপনি ভাবুন, ভবানীপুর গাঁজাপার্কের নাম যদি আমরা মারলিন মনরো পার্ক দিই, তা হলে রাতারাতি কী কাণ্ডটা ঘটে যায়। এরজন্যে তো কোনো টাকা খরচ নেই। মনরোর বংশধররা তো আর রয়ালটি দাবি করতে পারবে না। মাথা খাটিয়ে দিন না শিয়ালদহ স্টেশনের নাম চেঞ্জ করে সিলিকন সেন্টার!"

মার্কেট রিসার্চের তাগিদে সারকিট সেনগুপ্ত দিনরাত নানারকমের সংস্থায় চষে বেড়ান। বললেন, "বলরামবাবু, আপনার কি মনে হয় মানুষ ক্রমশ আরও টিভি দেখবে?"

উৎসাহ না দেখিয়ে বললাম, "আমি অর্ডিনারি লোক, মানুষ টিভি বেশি দেখলো না খবরের কাগজ পড়লো তাতে আমার কিছু এসে যায় না।"

সারকিটের গলার স্বরে উদ্বেগ। "কিন্তু আমার প্রচণ্ড এসে যায়, বলরামবাবু। মানুষ টিভি বেশি দেখা মানেই টিভিতে বিজ্ঞাপন বাড়বে। তার মানে বুঝতে পারছেন?"

বাংলার দর্শকরা যে টিভিকে ডোবাবে না সে-বিষয়ে বিরাট প্রত্যাশা সারকিট সেনগুপ্তর। তাঁর পরবর্তী ব্যাখ্যা, "অন্য মেট্রোতে মানুষের টিভি

দেখার সময় কোথায়? ওই ঘেমে নেয়ে সুবার্বন ট্রেন থেকে নেমে রাতের ডিনার খাওয়ার সময় পর্যন্ত ঘণ্টা দেড়েক দু'এক। দুপুর বেলায় শুধু মুমবাইয়ের হাউসমেডরা টিভির দর্শক, কারণ বড় বড় শহরে হাউস ওয়াইফরাও তো মুখে দুটো গুঁজে হাঁপাতে হাঁপাতে কাজে বেরিয়েছেন।"

"আর এখানে?" আমি সরাসরি জিজ্ঞেস করি।

সারকিট সেনগুপ্তর নিবেদন : "এখানে টিভির দুপুরবেলাটা রক্ষে করছিলেন আমাদের গৃহবধূরা এবং তাঁদের কুমারী মেয়েরা। বিয়ের সুযোগও নেই, চাকরিও নেই। সুতরাং টিভি ইজ দ্য বেস্ট অবলম্বন। সামান্য কয়েক ইউনিট ইলেকট্রিকের খরচে সারা পরিবারের সীমাহীন আনন্দ। এতোদিন এখানকার কোম্পানিগুলো বিজ্ঞাপনে তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছিল না—কারণ কলকাতার পুরুষমানুষদের টিভি সেটের সামনে পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে—প্রত্যেক সমীক্ষায় হিসেব পাচ্ছি পুরুষরাও দুপুরের টিভি সিরিয়াল গিলে খাচ্ছে। এ ব্যাপারে ইন্ডিয়ার মধ্যে ফার্স্ট হতে বাধ্য আমরা।"

"কেন মশাই? এই সাকসেসের কারণ কী?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"বুঝছেন না? বুড়ো হবার অনেক আগেই অকাল ভি-আর-এস নিয়ে বাঙালিরা যে যার বাড়িতে বসে যাচ্ছে। আর টিভি নিজের স্বার্থেই নিয়মিত প্রচার করছে দিবানিদ্রা কারুর শরীরের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।"

"হ্যাঁ মশাই, এই মেগাগুলোর গল্প ওদের মাথায় কী করে আসে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

সারকিট সেনগুপ্ত বললেন, "মিস্টার দাস মিস্টার ওঝা এঁরা আমাদের এই বেঙ্গলেই জন্মেছিলেন। এমনকী লিও টলস্টয় উনিও তো হাফ আমাদের।"

কী বলতে চাইছেন সারকিট? "দাস মানে কাশীরাম দাস, আর মিস্টার কৃত্তিবাস ওঝা—ভেবেচিন্তে দু'খানা থান হিট মহাভারত আর রামায়ণ পাঠকমহলে ছেড়েছিলেন।"

সারকিট সেনগুপ্ত বললেন, "মেগা সিরিয়ালগুলো ধীরে ধীরে মানুষের

জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়, দর্শকরা কাতর হয়ে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন যেন এগুলো অনন্তকাল ধরে চলে, কখনও শেষ না হয়।"

তা কী করে সম্ভব হতে পারে? জানতে চাইলাম সবিনয়ে। সেনগুপ্তর বিনয়বিগলিত ব্যাখ্যা : "যাঁরা লিখছেন অনন্তকাল লিখে যাবার ক্ষমতা রাখেন। মনে রাখবেন, এগুলো স্রেফ গল্প নয়, এগুলো চলমান জীবনধারা, সারাক্ষণ প্রবাহিত হয়েই চলেছে।"

সারকিট সেনগুপ্ত খুব খুশি আমার সঙ্গে যোগাযোগে। "বয়োজ্যেষ্ঠদের নাড়ির খবর এবং হাঁড়ির খবর দুটোই আমার দরকার, মিস্টার বিশ্বাস। আপনি ওদের সঙ্গে যত পারুন কথা বলুন, জানেন তো এক একটা এজগ্রুপ নিজের বয়সীদের বাইরে মুখ খুলতে চায় না। বৃদ্ধরা জীবনে কী চাইছেন এসব জানা আমাদের পক্ষে খুব প্রয়োজন, তবে তো টিভি প্রোডিউসারকে সময়মতো সাবধান করে দিতে পারবো।"

আমার মুখ দেখেই সারকিট সেনগুপ্ত বুঝছেন আমি চিন্তিত। বয়োজ্যেষ্ঠরা সময় কাটায় কী করে? তাদের সংসার চলবে কী করে? স্বাস্থ্যরক্ষা হবে কী করে এইসব প্রশ্ন সারাক্ষণ মনের মধ্যে উঁকি মারছে।

সারকিট সেনগুপ্তর ঝটপট উত্তর : "পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান, সময়কে সামলানো আপনার মতন মানুষের পক্ষে কষ্টকর হবে না। আপনি নগেন চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এই নিন নগেনবাবুর ঠিকানা। ঠিকানারও দরকার নেই—যেকোনো দিন সকাল ছ'টায় ত্রিকোণ পার্কে গিয়ে তাঁর খোঁজ করতে পারেন।"

দু'নম্বর চিন্তাটা যে একটু কঠিন তা সারকিট সেনগুপ্ত নিজেও অস্বীকার করতে পারছেন না। সেনগুপ্ত বলছেন, আমার সঙ্গে বসতে হবে আপনাকে। তারপর কানে কানে যা বললেন তাতে কানে মধু বর্ষিত হলো। "আপনি চুপচাপ থাকুন।" ওঁর পরামর্শ।

আমি ভীষণ উৎফুল্ল বোধ করছি। সারকিট বললেন, "আপনি শুধু দাদা আমার কথাটা মনে রাখবেন। মানুষ বয়স বাড়লে টিভি গল্প থেকে কী চায় তার দিকে নজর রাখবেন। আগে আমাদের ধারণা ছিল, বুড়োরা সারাক্ষণ

ধম্মোকথা শুনতে চায়। মরণের পরে কী আছে তা জানতে বয়োবৃদ্ধরা ভীষণ আগ্রহী। এখন দেখছি গুজবটা ডাহা মিথ্যে—মরণের আগে ও পরে সিরিয়ালটা শুরু থেকে ফ্লপ করলো, বোঝা যাচ্ছে মৃত্যুকে যদি কেউ সত্যিই অপছন্দ করে সে হলো এদেশের বৃদ্ধরা।

"তা হলে হিন্দি ছবির মালিকরা যা বলে থাকেন তাই কি সত্য? যে মানুষ যেখানে আছে সেখান থেকে সাময়িকভাবে বেরিয়ে আসতে চায়। এই মানসিকতাকেই সমাজের নাক উঁচু লোকরা বলেন এসকেপেজিম। সোজা বাংলায়, পলায়নী মনোবৃত্তি! যা অপছন্দ তার থেকে দূরে সরে যাও, যা পছন্দ তা মুড়মুড়কে দেখো।"

সারকিট সেনগুপ্ত বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলেন। বললেন, "এক একসময় মাথা খারাপ হয়ে যায়, বলরামবাবু। অনেকে বলছে কমবয়সী ছেলেমেয়েদের অনন্তসুখ এযুগের বয়স্করা সবসময় বরদাস্ত করতে পারেন না, একটা চাপা অজানা হিংসা এঁদের মনকে আপ্লুত করে রাখে। ওরা সেই জন্যে বলে, ব্রেক দাও, এমনভাবে মনের খাদ্য পরিবেশন করো যাতে মানুষের মনে পড়ে যায় প্রত্যেক ভাতে কাঁকর আছে। সেই সঙ্গে এক আধটা সামাজিক অবিচার অন্যায় ঘটলে মন্দ হয় না—কারণ সব মানুষেরই ধারণা বিশ্বাসংসার কখনও তার ওপরে সুবিচার করেনি।"

আমি এসব কথা কখনও গুছিয়ে ভাবিনি। হতাশ হয়ে ভাবছি, সত্যিই আমি তা হলে বুড়োদের দলে পড়ে গেলাম। এতোদিন তো সুকৃৎ সেনগুপ্ত এসব প্রশ্ন আমাকে করেননি।

তবু সুকৃৎ সেনগুপ্তর কাছে আমি ঋণী হয়ে রইলাম। তিনি ভাল পথ দেখিয়েছেন। তবে সমস্ত ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে। প্রথমে উপাসনাকেও বলা ঠিক হবে না। পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাইজের সঙ্গে কিছুটা সারপ্রাইজ মেশাতে পারলে ভীষণ আনন্দদায়ক ফল হবে। যা প্রত্যাশা করা হয়নি তার প্রাপ্তি কেন যে বাড়তি সুখ দেয় তা খুঁটিয়ে দেখে না কেন মানুষ? সুকৃৎ সেনগুপ্ত হয়তো মার্কেট রিসার্চ করতে গিয়ে মাথা ঘামান।

ওদের টিভি প্রোগ্রামে সাসপেন্স এবং সারপ্রাইজ, যারা দক্ষভাবে

মেশাতে পারে তাদেরই জয়জয়কার। কিন্তু সারকিট সেনগুপ্ত সেবার বলেছিলেন, মানুষ কিন্তু আজকাল মহাসমুদ্রে নাকানি-চোবানি খেতে চায় না। মনে রাখতে হবে, যা কিছু করা হচ্ছে সব বিজ্ঞাপনগ্রাহকের মুখ চেয়ে করা হচ্ছে।

আমি নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এসে উপাসনার তৈরি এক কাপ গরম চা সেবন করেছি। আগে এই সময়ে এই চা কোম্পানির খরচে নিজের অফিসে বসে খেতাম। এখন চায়ের খরচও বাড়লো। এইসব ভেবেচিন্তেই বোধহয় সৃষ্টিকর্তা স্থির করেছিলেন যত বয়স বাড়বে তত খাবার কমিয়ে যাও। খাবার হজম করাটা খাবার সংগ্রহের মতনই কঠিন করে দিয়ে সৃষ্টিকর্তা বোধহয় বৃদ্ধদের, বিশেষ করে পেনসনারদের মুখ রক্ষা করতে তৎপর হয়েছিলেন!

আমি আবার বাড়ি থেকে বেরুচ্ছি দেখে উপাসনা একটু অবাক হলো। সে বললো, "সত্যি, অনন্ত তোমার এনার্জি।"

অর্থাৎ কোনো লোক আমাকে হঠাৎ দেখে বুঝতে পারবে না যে রিটায়ার্ড বলরাম বিশ্বাস বার্ধক্যের পথ ধরে নিজের খেয়ালে এগিয়ে চলেছেন।

পুরো একদিন আমি রিপন স্ট্রিটের বন্দিশালায় হাজির না দিয়ে বহির্বিশ্ব থেকে কম শিখলাম না। এই হারে প্রতিদিন কিছু না কিছু শিখলে আমি বোধহয় জরদগব হয়ে যাবো?

আচ্ছা জরদগব কথাটার আসল অর্থটা কী তা কখনও খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে? লেকে একবার জেনুইন বুড়োদের আড্ডা দিতে দেখে আমার কলেজের কয়েকজন বন্ধুরা নাম দিয়েছিল, জরদগব ক্লাব। উপাসনার দয়ার শরীর। সেই তরুণী বয়সেই নামকরণের প্রতিবাদ করেছিল, আঃ ঐ রকম বোলো না।

বন্ধুরাও তেমনি। তারা উত্তর দিয়েছিল, "উপাসনা, তোমার রাগের কারণ তো দেখি না। কারণ মেয়েদের তো এর মধ্যে ইনক্লুড করা হয়নি।

জরদগব শব্দটার অর্থ বৃদ্ধ ষাঁড়, আরও ভদ্র ভাষায় জীর্ণ বৃষ।"

পরে একদিন বাংলা অভিধান খুলে দেখেছিলাম। বিয়ের পরে প্রায়ই আমরা দু'জনে অভিধান নিয়ে খেলা করতাম। তখন দেখলাম বৃদ্ধ শকুনিও এই দলে পড়ে যায়। তখনই ঠিক করেছিলাম, জরদগব শব্দটা আর কখনও ব্যবহার করবো না। দু'-একটা নিষ্ঠুর শব্দ দীর্ঘকাল অব্যবহারে অভিধান থেকে উঠে গেলে বাংলা ভাষার এমন কিছু ক্ষতি হবে না। জরদগব সম্পর্কে উপাসনা আমার সঙ্গে একমত হয়েছিল।

"এই যে কথায় কথায় মানুষকে খোঁচা মারা, অস্বস্তিতে ফেলে দেওয়া, এর কোনও মানে হয় না।" উপাসনা তার মতামত দিয়েছিল।

সারকিট সেনগুপ্ত আরও একটা নতুন কথা বলেছেন—ফিল গুড্ ফ্যাক্টর। মন্দ নেই আমি, এমন একটা সুখকর মিষ্টি অনুভূতি। এতে মন প্রসন্ন হয়, শরীরটাও উৎসাহ পায় নতুন কিছু করবার।

আমি উপাসনাকে বাড়িতে চিয়ারফুল রেখে হাঁটতে হাঁটতে হাজরা রোডের ধারে পণ্ডিতিয়া প্লেসে ঢুকে পড়েছি। ঠিকানাটা খুঁজে পেয়েছি। জিজ্ঞেস করলাম মিস্টার বিনয় সুখানি আছেন? একটা ঘর থেকে পক্ককেশ ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। সবিনয়ে জানালেন, মিস্টার সুখানি নেই, ইণ্ডালের ই-জি-এম-এ গিয়েছিলেন ওখান থেকে জেনকিনস কোম্পানির ফ্যাক্টরি ভিজিট, এইসব সেরে আজ আর অফিসে ফিরবেন না।

কর্মচারী ভদ্রলোক আমার পরিচয় জেনে নিয়ে সানন্দে বললেন, "আরে বলরামবাবু নয়?"

ভদ্রলোক এবার জানালেন, "আমি সুরেন ভট্চাজ্যি, উপাসনার মাসতুতো দাদা। আপনার বিয়েতে দেখেছি, তারপরে মেসোমশায়ের শ্রাদ্ধে দেখেছি, মাসিমার বাৎসরিক কাজেও আপনাকে দূর থেকে দেখেছি।"

আমি কেন মিস্টার বিনয় সুখানির কাছে এসেছি তা সুরেন ভট্চাজকে অবশ্য বলতে পারছি না। আমার মনে পড়ছে, এই ভদ্রলোক উপাসনার আপন মাসতুতো দাদা নয়, সম্পর্কে কোনো মাসির ছেলে।

"আপনি একসময় গেস্টকিনে কাজ করতেন না?" আমি জিজ্ঞেস করি সুরেন ভট্টাচার্যকে।

সুরেন ভট্টাচার্য কিছু চেপে রাখলেন না। বললেন, "সে অনেকদিন আগেকার কথা। গেস্টকিন পরের পর ডিপার্টমেন্ট বন্ধ করলো।"

সম্পর্কে শ্যালক সুরেন ভট্টাচার্য হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "বড় বড় শিল্পপতিদের তো কোটি কোটি টাকা। ওঁরা কেন হুট করে কলকারখানা অফিস এসব বন্ধ করে দেন বলুন তো?"

আমি বললাম, "কারণটা জানলে তো আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যেতাম, সুরেনবাবু। শুনেছি, ইন্ডিয়াতে এক লাখ কোম্পানি অসময়ে লোক ছাঁটায়ের জন্যে উঁচিয়ে রয়েছে।"

সুরেনবাবুর প্রশ্ন : "আচ্ছা, মালিকদের কখনও ছাঁটাই হতে বা লে-অফ হতে দেখেছেন? কোম্পানি খারাপ চলছে বলে কোনও মালিককে কখনও বাসে বা রিকশ চড়তে দেখেছেন, বলরামবাবু?"

ওসব তো উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা! ট্রেড ইউনিয়ন সাপ্তাহিকে, অফিসে এসব বিষয়ে অনেক কথাবার্তা শুনেছি, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। এখন চাচা আপন প্রাণ বাঁচা! আমাকে যেভাবেই হোক একটা কাজে লেগে থাকতে হবে, এছাড়া বিশ্বসংসারের যা হয় তা হোক। মিস্টার বিনয় সুখানিকে আমার বিশেষ দরকার। আমাকে আবার এখানে আসতে হবে।

সুরেন ভট্চাজ্যি কিছু খবর দিলেন সুখানি সম্পর্কে। "পিকুলিয়র লোক মশাই। পৈতৃক টু-পাইস অবশ্যই আছে। ঠাকুর্দার শেয়ারগুলোও বিনয় সুখানি সরাসরি পেয়েছে। তাছাড়া নিজের টুকটাক ব্যবসা। কিন্তু আসল শখ হলো, বড বড় কোম্পানির টাটা বিড়লাদের ছাপানো রিপোর্ট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টসে হিসেবে ভুল ধরা। আর বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার-হোল্ডারদের বার্ষিক সভায় লম্বালম্বা বক্তৃতা করা। ওইসব করতে করতেই সময় কেটে যায়। নিজের ব্যবসায়ে অতটা মন নেই।"

আমার কী দরকার বিনয় সুখানির সঙ্গে তা জানবার আগ্রহ দূর হয়নি দূরসম্পর্কের শ্যালক সুরেন ভট্চাজ্যি মশায়ের। উদ্দেশ্যটা আমি ওঁকে

খোলাখুলি বলতে পারলাম না, একটু লজ্জা হলো। হাজার হোক শ্বশুরবাড়ির লোক।

আমি আবার হাঁটতে হাঁটতে ফিরে চললাম বন্ডেল রোডের দিকে। এখন আমার একটু ক্লান্তি লাগছে। আগে হলে ঝট করে রিকশ চড়ে বসতাম। ক্লান্ত পথিক দেখলে সওয়ারিসন্ধানী রিকশওয়ালাগুলো এমনভাবে ঘণ্টি বাজাবে যে হিসেবী পথিকের সংযমের ব্রেক ফেল হতে বাধ্য। রিকশওয়ালা একশ বছর ধরে কলকাতার মেয়েমদ্দকে যেভাবে চিনেছে তা আর কেউ পারেনি। বিজ্ঞানের যত উন্নতিই হোক রিকশওয়ালাকে এই শহর থেকে চলে যেতে দেবেন না, নগর কলকাতার নমস্য হে পৌরপিতাবৃন্দ।

দেখছেন, আমার মধ্যে মাত্র একদিনের অবসর যাপনেই বৈপ্লবিক বেশ মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে।

আগে আমি রিকশওয়ালাদের সুখ-দুঃখের কথা ভাবলেও ওদের জন্যে পৌরপিতাদের কাছে এইভাবে আবেদন করতে পারতাম না।

সিনিয়র সিটিজানদের এমনই আবেদন-উৎসাহী হওয়া উচিত, কোথায় যেন পড়েছিলাম। আমরা বয়সী মানুষরাই এই পৃথিবীকে বেশ কিছুদিন ধরে কঠোর পরিশ্রমে সমৃদ্ধ করেছি, এই দেশ এবং এই শহরের সব সম্পদ আমরাই সযত্নে রক্ষা করে সেগুলো অন্য এক প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়েছি, এখন অবশ্য আমাদের চাকরিবাকরি কাজকর্ম নেই, কিন্তু বিশ্বসংসার থেকে বিদায় নেবার আগেই আমাদের সদস্যপদ ঝটপট খারিজ করে দেবেন না। তরুণ তরুণীগণ মনে রাখবেন, জন্ম ও যৌবনের মধ্যে যেমন একটা সময়পার্থক্য থাকে তেমন বার্ধক্য ও মৃত্যুর মধ্যেও একটা প্রতীক্ষাসময় আছে, দুটোর মধ্যে সামান্য একটু দূরত্ব রেখে দিয়েছে প্রকৃতি। এই প্রতীক্ষাসময়টা কষ্টকর হলেও এটা যে ভীষণ ইন্টারেস্টিং তা আমি বলরাম বিশ্বাসও এতোদিন চাকরিহারা হবার আগে তেমনভাবে বুঝিনি।

আমাদের পাড়ায় তেকোণা পার্কের কাছে এসে হঠাৎ পশ্চিম আকাশের দিকে একবার মুখ তুলে তাকালাম। পার্কের কাছে নতুন নতুন ফ্ল্যাট মাথা তুলে এই পশ্চিম দিকের দৃষ্টি ঢেকে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। একটা কংক্রিটের দেওয়াল তুলে কারা যেন পশ্চিমের কাণ্ডকারখানাকে সিনিয়র সিটিজানদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করতে চাইছে। কিন্তু পুব-পশ্চিম-এর রাজপথ এখনও যেন পুরনো সিটিজানদের মানসিক ফাইফরমাস খাটতে আপত্তি করছে না, পড়ন্ত সূর্যের আলোয় আমি ওই পথ ধরে দূরদিগন্তের দিকে তাকিয়ে আকাশে কোনও ঐশ্বর্যবতী এয়োতির সাধের সিঁদুরখেলা প্রাণভরে দেখে নিলাম। এমন ঐশ্বর্যের প্রদর্শনীকে পণ্ডিতরা কেন যে একে অস্তরাগ বলেছেন! জীবনের বিকেলবেলায় দাঁড়িয়ে তরুণী উষার অনুরাগের সঙ্গে আমি তো এর কোনও পার্থক্য লক্ষ্য করছি না। তবে এসব বিষয়ে আমার মন্তব্যের কী গুরুত্ব আছে, একজন ভি-আর-এস সিটিজানের কাছে এই শহরের কোন মানুষ এখন জ্ঞানের কথা শুনতে চায়?

"দাদা, একটু পা নামিয়ে!" পার্কের মধ্যে একটা গার্জেনি অথচ স্নেহময় গলা এই অধম বলরাম বিশ্বাসকে সংশোধনী নির্দেশ দিচ্ছে।

আমি তেকোণা পার্কে ঢুকে পুরনো অভ্যাসমতো একটা বেঞ্চিতে জুতো সমেত পা তুলে বিশ্রামসুখ উপভোগ করছিলাম। এই বিশ্রামসুযোগ আমি তো কোম্পানির কাছে চাইনি, আমাকে জোর করে চিঠি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথচ সবাইকে বলা হয়েছে আমি স্বেচ্ছা-অবসর নিয়েছি।

পার্কের স্বেচ্ছানিযুক্ত গার্জেনের কথাগুলো আমার ভাল লাগছে না,

যদিও সামাজিক ভব্যতা অনুযায়ী অন্যায়টা আমারই। বয়োজ্যেষ্ঠদের একটাই মানসিক মুশকিল, সহায়সম্বলহীন হলেও কারও গার্জেনি অথবা উপদেশামৃত সহ্য করতে মন চায় না। বলতে পারেন, দাদুর ওপর দাদুগিরি ব্যাপারটা জেনুইন দাদুদের ঠিক হজম হতে চায় না।

এই মুহূর্তে আমার মানসিক রিঅ্যাকশনের একটি ই-সি-জি গ্রাফ আমাদের দিচ্ছি। মনে মনে · "মহাশয়, আমি জুতো নামিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আপনারও বোঝা উচিত ছিল, অনেকক্ষণ হেঁটে হেঁটে, এই বয়স্ক পদযুগল তার মালিকের কাছ থেকে একটু তোল্লাই প্রত্যাশা করছিল। মহাশয়, এই পদযুগল বহুবছর এবং নীরবে মালিকের সার্ভিস দিয়েছে, কিন্তু মালিক নিজেই বাধ্যতামূলক স্বেচ্ছা অবসরের কোপ গ্রহণ করায়, পদযুগলও ভি-আর-এস ভদ্রলোকের ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট থাকতে উৎসাহ দেখাচ্ছে না।"

দাদুস্য দাদু এবার বললেন, "যত ইচ্ছে পা তুলুন, কিন্তু দয়া করে জুতোটা তলায় খুলে রেখে।"

আমার নিঃশব্দ ডায়ালগ : "মহাশয়, আমি জুতো খুলতে পারি ; কিন্তু ভি-আই-এস-এ উপহার পাওয়া স্পেশাল ওয়াকিং শু-র ফিতে এই পার্কের অন্ধকারে বসে বাঁধতে পারবো না।"

টাকায় যেমন টাকা বাড়ে তেমন কথায় কথা বাড়ে। আমি এই বচ্ছরকার দিনে পৃথিবীতে আর একটা শত্রু বাড়াতে চাই না।

উপদেশ মতন আমি যথাবিহিত স্টেপ নিচ্ছি, পদযুগলের সহায়তায় আমি অবশ্যই সংঘর্ষের পথ এড়িয়ে যাবো। নিলাম সেই স্টেপ। তারপর ঐ বেঞ্চি ছেড়ে দিয়ে অন্য একটা বেঞ্চির সন্ধানে এগিয়ে চললাম। কিন্তু তবু বোধহয় শান্তি পাওয়া গেলো না।

লোকটা এবার আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলছে, "আরে মশাই, আপনি তো বেশ লোক! আপনাকে শুধু বেঞ্চ থেকে রাস্তার জুতোটা নামিয়ে রাখতে রিকোয়েস্ট করেছি, অন্য লোকরা এসে বসবে পরিষ্কার জায়গায়, আর আপনি রেগেমেগে আমাদের বেঞ্চি বয়কট করে অন্য একটা

বেঞ্চিতে একলা বসে আছেন।"

ভদ্রলোক কোনোকথা শুনলেন না, জোর করে এবং আদর করে আমাকে পুরনো বেঞ্চিতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "মশাই, পার্কটা আমার পৈতৃক প্রপার্টি নয়। তবু এরই মধ্যে এই বেঞ্চটা আমরা দেখাশোনা করি। দত্তক নেওয়া বলতে পারেন। দেখভালের দায়িত্বটা আমার। একটু ঝাড়াপোঁছা, একটু নোংরা সরিয়ে ফেলা এসব না করলে বন্ধুরা কোথায় এসে বসব বলুন তো?"

ভদ্রলোক আরও বললেন "কিছু মনে করবেন না, আপনার স্পেশাল জুতোর ফিতে বাঁধার সমস্যাটা আমি দেখে নিয়েছি। এই দেখুন, আমার ফিতেবিহীন মোকাসিন। পা ঢোকানো, পা বের করা এগুলো কোনও ব্যাপারই নয়।"

আমি দেখলাম, কিন্তু পার্কে বসার জন্যে আমি আর নতুন জুতোয় টাকা ইনভেস্ট করছি না। অফিসের লোকরা ইচ্ছে করলে, এইরকম একটা আমাকে জুতো দিতে পারতো।

নতুন পরিচিত ভদ্রলোক এবার নিজের পকেট থেকে একটা ঝাড়ন বার করলেন। বললেন, "এখানকার মেয়েটা কাজে ফাঁকি দিচ্ছে।" তিনি সযত্নে সিট ঝাড়ছেন। মানুষ এখনই এসে বসবে। এবার পার্কের ধারের একটি মেয়ে ওঁর কাছে এসে হাজির। ভদ্দরলোকের বুকপকেটে ঠিক পঁচিশটি টাকার নোট ছিল। তা ওই মেয়েটিকে দিলেন, সেইসঙ্গে বললেন, "বুড়োমানুষরা চিরকালই একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে চায়, আর ছোটরা চিরকালই একটু নোংরা থাকতে চায়। তা বাছা, একটু যত্ন করে বেঞ্চিটা মুছে দিও। দ্যাখো, ওই কোণের বেঞ্চিটা কত পরিষ্কার।"

মেয়েটি বেশ মুখরা। বললো, ঝাড়পোঁছের টাকা বাড়াতে হবে। ওরা আমাকে একশ দেয় মাসে মাসে, ওদের বেঞ্চি তো বেশি পরিষ্কার থাকবেই।

মেয়েটি চলে যেতে ভদ্রলোক বললেন, "বুড়োমানুষরা দু'দণ্ড এসে বসবে, পার্কের হাওয়ায় সংসারের আগুনে ঝলসানো শরীর একটু শান্ত

করবে, কিন্তু সেখানেও প্রতিযোগিতা। ওখানে এই বেঞ্চিতে কয়েকজন সিন্ধি বৃদ্ধরা বসেন, ওঁদের কাছে একশ টাকা আর কি।"

এবার আমাদের নিজেদের মধ্যে খবরের আদান প্রদান। ভদ্রলোক বললেন, "আপনাকে তো আগে পার্কে দেখিনি।"

"দেখবেন কী করে? গতকালই তো বুড়ো হলাম।"

আমার কথা শুনে এক প্রস্থ হাসলেন ভদ্রলোক, "আপনার তো মশাই সেন্স অফ হিউমার খুবই প্রবল। প্রত্যেক দিনেই কেউ না কেউ নতুন বৃদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু দিনক্ষণ দেখে, ক্যালেন্ডার পরামর্শ করে কেউ বুড়ো হয় তা আগে কখনও শুনিনি।"

আমার সবিনয় ব্যাখ্যা, "মানুষ হয়তো ধীরে ধীরে বুড়ো হচ্ছে, কিন্তু রোগটা হঠাৎ একদিন ধরা পড়ে যায়।"

"আপনি বার্ধক্যকে একটা রোগ বলছেন? তা হলে তো মশাই, যৌবনটাও একটা কঠিন রোগ।"

আমি বললাম, "যৌবন সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করতে পারবো না, মশাই। ওটা পুরুষ স্ত্রী সবাই এনজয় করে।"

"সে তো অনেক রোগও মানুষ প্রথম পর্বে এনজয় করে। যেমন ধরুন চুলকুনি। প্রথম অভিজ্ঞতাটা তো খারাপ লাগে না, তা বলে ওটা কি রোগ নয়?"

"আপনার রসবোধের প্রশংসা না করে পারছি না, মশাই।" আমি এবার ভদ্রলোককে বললাম।

আর ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "দেখতে পাচ্ছি, ভগবান বুড়োদের নিয়ে একটু বেশি হাসাহাসি করতে ভালবাসেন। আর কলকাতার বৃদ্ধদেরও বলিহারি, আমাদের মধ্যে রসরসিকতার বেশ অভাব। কেন রে বাবা?"

ভদ্রলোক জানালেন, "আমার নাম নগেন চৌধুরী।"

তা হলে ইনিই সেই নগেন চৌধুরী, যাঁর কথা বলছিলেন সারকিট সেনগুপ্ত।

নগেন চৌধুরীও উৎসাহী হয়ে উঠলেন, "সুকৃৎ সেনগুপ্ত! চিনি মশাই।

মাঝে মাঝে কীসব মতামত সংগ্রহ করতে আসেন। আমি যত বলি, মশাই, বৃদ্ধদের মতের কোনও মূল্য নেই, তত উনি মতামত জানার জন্য নাছোড়বান্দা হয়ে ওঠেন।"

আমি বললাম, "সুকৃৎ বাবুর মার্কেট রিসার্চ কোম্পানির সন্দেহ বুড়োদের স্বাস্থ্যবল না থাকলেও ধনবল আছে! আর যাদেরই অর্থ আছে আজকের যুগে তাদেরই মতামতের মূল্য আছে। ঠিক ধরেছে নিশ্চয়। যেমন, মেয়েদের অর্থবল বেড়েছে খবর পেয়ে বড় বড় কোম্পানিগুলো ওঁদের মনোরঞ্জনের জন্যে কী কাণ্ড করছে!"

নগেন চৌধুরী বললেন, "চলুন পার্কেই একটু ঘুরপাক খাই দু'জনে। আজ সকালে একটুও হাঁটা হয়নি।"

"বুড়োদের নিয়ে এই এক রসিকতা করেছেন ওপরওয়ালা। নিজে তো নিরাকার, সুতরাং শরীরের তদারকির প্রয়োজন নেই, কিন্তু বুড়োদের গতরটাকে খাটিয়ে নিতে চান। হাঁটো, হাঁটো, না হলে বডি বেঁকে বসবে।"

নগেন চৌধুরী যে একসময়ে আমাদের রিপন স্ট্রিট অফিসে কাজ করতেন তা জানতাম না। বললেন, "বহু বছর আগে ওখানকার একটা বদমায়েস সায়েব অযথা খটমট ব্যবহার করলো। তখন রক্ত গরম ছিল, বললাম, রইলো চাকরি, চললো নগেন। তারপর মশাই, একটা ছোট বাঙালি কোম্পানিতে মন দিয়ে কাজ করতাম। কম মাইনে কিন্তু বেশি সুখ—মালিকরা সম্মানটম্মান করত। ভেবেছিলাম, টি-কে-সি চাকরি হবে। ওটা কি জানেন তো! আমৃত্যু চাকরি—টিল খাটিয়া কাম্‌স্‌। কোনও কোনও কোম্পানিতে বলে সি-সি অর্থাৎ চিতা-চুক্তি!"

নগেন চৌধুরী দুঃখ করলেন, "তাতো সুখ মশাই, ভাগ্যে লেখা ছিল না। বাঙালি মালিকের বাঙালি ছেলে পড়াশোনায় হীরের টুকরো, এম. এ. পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট টার্স্ট হয়ে ফরেনে গিয়ে পি-এইচ ডি করে, লাল টুকটুকে মেমসায়েবের পাণিগ্রহণ করে বাবাকে লিখিতং জানিয়ে দিল পৈতৃক বিজনেসে তার আগ্রহ নেই। আগেকার যুগে বিজনেসম্যানদের ছেলেরা মুখ্যু হতো, সেইটাই অনেক ভাল ছিল, মশাই। এখন বিদ্যের

জাহাজ হলেই বিজনেসে বাঙালিদের অরুচি জন্মে যায়। তা মশাই, আমার মালিক মনের দুঃখে বনে চলে যাবেন বলে কলকাতার বিজনেস গুটিয়ে লক্ষ্মীর পাট তুলে দিলেন। এই বয়সে চাকরি খুইয়ে অথৈ জলে পড়ে যেতাম! নেহাত হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়া বইলো।"

"মানে?" নগেনবাবুর বক্তব্য ঠিক স্পষ্ট হচ্ছে না।

"উইন্ডফল, জানেন তো মশাই ঝড়ে আম পড়ে যায়। আমার ওয়াইফের পৈতৃক বাড়িতে কিছু শেয়ার ছিল। মদীয় শ্যালকটি কিঞ্চিৎ ভদ্দরলোক, আদরের বোনকে পৈতৃক সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাইল না, বাড়ি থেকে যা পেলো তার কিছুটা চেকে কিছুটা ক্যাশে বোনকে দিয়ে গেলো। আর নিজে এখানে কম ভাড়ায় এক চিলতে ঘর নিয়ে রেখেছিলাম। সেই সৌভাগ্যটা কাজে লেগে গেলো।"

"তারপর, নগেনবাবু?"

"পরের খবরাখবর যথাসময়ে জেনে নেবেন এখানকার বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে। শুধু শুনে রাখুন, আমরা কর্তাগিন্নি দু'জনে অঙ্কটঙ্ক শিখে হিসেব করতুম সুদের টাকায় ফুটো পেট কী ভাবে চলবে? আমি বলতাম, বুড়ো বয়সে খাওয়া কমেছে, আরও কমবে। ওয়ান প্লাস ওয়ান=টু খাই খরচ আর নয়, ওটা হাফ+হাফ=ওয়ান। তা ম্যারেড বাঙালি মেয়েরা মশাই বয়স বাড়লে ভীষণ সুরসিকা হয়।"

কথা সম্পূর্ণ না করে নগেন চৌধুরী বললেন, "রেখে দিন আমার প্রেমিকা শ্রীমতী ভাগ্যবতী চৌধুরীর কথা! বলুন আপনার কিছু খবর।"

আমার কথা কিছুটা শুনলেন নগেন চৌধুরী। বললেন, "ছেলেপুলে না থাকলে বুড়ো বয়সে বেশ কিছু মানসিক, আর্থিক এবং দৈহিক কষ্ট—যেমন আপনার এবং উপাসনা দেবীর। কিন্তু বংশ রক্ষে করতে গিয়ে নিজের স্ত্রীকে যে মেরে ফেলেননি, এই যথেষ্ট। আর ছেলেপুলে থাকলেও বুড়ো বয়সে আজকাল কী রকম সুখ তা এখনই জানতে পারবেন। ওই আসছেন বিশ্বপতিবাবু!"

বিশ্বপতিবাবু নতুন একজন বাগান-বন্ধুকে দেখে খুব খুশি হলেন। নামটা শুনে রসিকতা করলেন, "এই অবিশ্বাসের যুগে কিছু কিছু বিশ্বাস এখনও টিকে রয়েছেন ভাবতে খুবই ভাল লাগছে, বিশ্বাসমশাই।"

ওঁর গুহরায় টাইটেলটা যে ভুবনবিদিত তা জানিয়ে দিলেন বিশ্বপতিবাবু। তারপর সদর্পে জিজ্ঞেস করলেন, "বলুন তো হিসট্রির সবচেয়ে ফেমাস গুহরায়টি কে?"

সঠিক উত্তর দিতে পারলাম না। আমি শুধু সরস্বতী প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা প্রাক্তন বিপ্লবী শৈলেন গুহরায়ের কথা শুনেছি।

বিশ্বপতি গুহরায় হুঙ্কার ছাড়লেন, "উনি ফেমাস। কিন্তু আরও ফেমাস একজন রয়েছেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র গুহরায়, যদিও উনি ওই গুহটা ড্রপ করেছিলেন পরিবর্তনের চাপে। যেমন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়চৌধুরী, বাবার উইলেও ওই রায়চৌধুরী নাম লেখা আছে, কিন্তু তিনি চৌধুরীটা ড্রপ করেছিলেন।"

"ভাগ্যে করেছিলেন বিশ্বপতিবাবু, না হলে কর্পোরেশনের কি অবস্থা তো ভাবুন, সব এ-পি-আর-সি রোড লিখতে হতো।"

বিশ্বপতিবাবু আগে অডিটে কাজ করতেন। বিনা নোটিশে প্রচণ্ড দুঃখ করলেন, "দেশটা ক্রমশই উচ্ছন্নে যাচ্ছে, মিস্টার চৌধুরী। গোটা কয়েক অডিটর কী করে এই বিশ্বসংসারের সমস্ত অনিয়ম সামলাবে?"

নগেন চৌধুরী রসিক লোক। সুযোগ বুঝে জানতে চাইলেন, স্বর্গে অডিট বা হিসাবপরীক্ষক আছে কি না?

বিশ্বপতি গুহরায় পাকা অডিটরের মতো বললেন, "যতক্ষণ নিজে না জানছি ততক্ষণ বলতে পারবো না, কানে শোনা কথায় তো অনেকের ধারণা স্বর্গে কাউকে হিসেব রাখতে হয় না। যেখানে হিসেব নেই সেখানে বেহিসেবও নেই।'

"ঠিকই বলেছেন, মিস্টার গুহরায়! তহবিল থাকলে তবে তো তহবিল তছরুপের সম্ভাবনা। মাথা থাকলে তো মাথাব্যথা!"

বিশ্বপতির দুঃখ কমছে না। তিনি বললেন, "শুধু অফিস নয়, প্রত্যেকটা

ফ্যামিলিও নিয়মিত অডিট করানো হলে বিশ্বসংসারটা অন্যরকম হয়ে যাবে!"

"ফ্যামিলি অডিট হাতে পেলে আপনাদের অডিটর জেনারেল তো ঈশ্বরের থেকেও পাওয়ারফুল হয়ে উঠবেন, মিস্টার গুহরায়।" বেশ সিরিয়াসলি কথা বলছেন আমাদের নগেন চৌধুরী।

"তা আপনার কথা ভাবছিলাম, কী হল? পরপর দু'দিন আপনার দেখা নেই। বার্ধক্যে বন্ধুবান্ধব এবং আপনজনদের সঙ্গে মেলামেশাটাই তো ওষুধ।"

বিশ্বপতিবাবুকে এবার একটু বিহ্বল মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ নিরুত্তর রইলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন "আমাকে বাইরে থেকে দেখে আপনি কি সব বুঝতে পারেন?"

নগেন চৌধুরী বললেন, "আপনি অনেকের থেকে আলাদা, অনেকের থেকে ভাগ্যবান। আপনার পুত্র রয়েছে, পুত্রবধূ রয়েছে, কলকাতা শহরে নিজস্ব টু-রুম ফ্ল্যাট রয়েছে, আপনার সুখ নিশ্চিত করবার জন্যে ভগবান তো কোনও ব্যবস্থাই বাদ রাখেননি।"

বিশ্বপতিবাবুর চোখদুটো এবার যেন ছলছল করে উঠল। আমাকে দেখে বোধ হয় মুখ খুলতে একটু ইতস্তত করছিলেন। ওঁর ব্যাপারটা বুঝে নগেন চৌধুরী ওঁকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের বেঞ্চি থেকে একটু দূরে সরে গেলেন।

একটু পরেই আবার ওঁরা ফিরে এলেন। আমি কেবল শুনতে পেলাম, বিশ্বপতি গুহরায় মরতে চাইছেন। বলছেন, "আমি একসময় রীতিমতো ছিমছাম পোশাকি বাবু ছিলাম। অফিসে সবাই আমাকে বিউটিফুল গুহরায় বলে ডাকতো।"

নগেন চৌধুরী এবার বললেন, "লাস্ট পয়েন্টটা আমি বিশ্বাস করি না। আমাকে আজই খোঁজ করে দেখতে হবে। সিনিয়র সিটিজানদের হেয় করার জন্যে এটাও এক ধরনের জঘন্য ষড়যন্ত্র হতে পারে।"

অডিটর মশাই একটা মোক্ষম প্রশ্ন তুললেন। "আপনার ক্লাবে সবরকম প্রফেশনের বয়োপ্রাপ্তদের দেখি, কিন্তু অনুপস্থিত উকিল এবং ডাক্তার।"

নগেন চৌধুরী ছাড়বার পাত্র নন। বললেন, "আর অনুপস্থিত

ভাগ্যরেখাবিদ!"

বিশ্বপতি গুহরায় মাথা ঘামিয়েও এই খামতির এবং ঘাটতির কোনও সম্ভাব্য কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না। একটু ভেবে তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি বলতে চান উকিল এবং ডাক্তাররা অন্যের তুলনায় ক্ষণজীবী হন? কিন্তু মশাই, দ্য স্টেটসম্যানের পার্সোনাল কলাম পড়লে তো সেরকম মনে হয় না। বরং মৃত্যু কলমে যাঁদের নাম ছাপা হয় তাঁরা তো দেখি বেশ দীর্ঘজীবী। আরে মশাই, আপনি বলবেন, এদের ব্রেন একটু বেশি খাটাতে হয়, আর পেশির তুলনায় মগজ বেশি পরিশ্রম করলে শরীব সে ধকল সহ্য করতে পারে না।"

অভিজ্ঞ নগেন চৌধুরী হাসলেন। "এই অধম কর্মজীবনে উকিলের পিছনে এবং প্রাইভেট লাইফে ডাক্তারের পিছনে কম ছোটেনি। মনের মধ্যে চিরকালই একটা প্রশ্ন ছিল, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কেন উকিল-ডাক্তারের অন্ন গ্রহণ করতেন না? তা ও-বিষয়ে তেমন এগোতে পারলাম না, তবে দেখলাম আপনার সমগোত্রীয় ডাক্তার বিধানচন্দ্র গুহরায় পয়সার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও স্পেয়ার করতেন না, জোড়াসাঁকোয় গেলে প্রতিবার ষোলো টাকা ভিজিট আদায় করতেন।"

"এটা রুগি-ডাক্তারের স্পেশ্যাল ব্যাপার, এবিষয়ে আমরা মন্তব্য করার কে?" মতামত দিলেন বিশ্বপতিবাবু। গুহরায়দের বিরুদ্ধে কোনও বিরূপ মন্তব্য তাঁর ভাল লাগবার কথা নয়।

নগেন চৌধুরীর সবিনয় বক্তব্য : "আপনার অরিজিন্যাল প্রশ্নের উত্তরে বলি, উকিল ডাক্তাররা বোধ হয় কখনও বুড়ো হন না!"

"কী বলছেন মশাই!" ভগবান ওঁদের স্পেয়ার করে দিয়েছেন?

"স্যরি।" নগেন চৌধুরী নিজেকে এবার সংশোধন করে নিলেন। বললেন, "উকিল ডাক্তারের বয়স বাড়ে, কিন্তু ওঁরা কাজ থেকে অবসর নেন না। আর কে না জানে, কাজ থেকে রিটায়ার না করলে মানুষ কখনও অফিসিয়ালি বুড়ো হয় না।"

"উঃ আপনার মাথা বটে! ঠিক লক্ষ্য করেছেন, অভিজ্ঞতা বাড়লে পুরনো

ঘিয়ের মতন কদর বাড়ে উকিলের, ডাক্তারের এবং ভাগ্যগণকদের। সুতরাং স্বাভাবিক কারণে তাঁরা কেন আমাদের এই রিটায়ার্ড পার্সনদের আসরে এখানে হাজির হবেন?" তবে, বিশ্বপতি গুহরায়ের সাফ বক্তব্য, জীবনের অপরাহ্নবেলায়, উকিল ডাক্তার এবং জ্যোতিষী ছাড়া বৃদ্ধদের চলে না।

এরপরে বিশ্বপতি গুহরায় নিজের খেয়ালেই বেঞ্চি ছেড়ে উঠে পড়লেন। ওঁর মধ্যে একটু অন্যমনস্কতা ও দুশ্চিন্তা যে রয়েছে তা সহজেই নজরে পড়ে যায়।

বিশ্বপতি গুহরায় বিদায় নেবার পরে নগেন চৌধুরী আমাকে প্রশ্ন করলেন, "বুড়োমানুষের শরীর দিয়ে কোনও বিশেষ দুর্গন্ধ বেরোয়? এমন কথা আপনি শুনেছেন?"

আমি উত্তর দিলাম, "বার্ধক্য সম্বন্ধে এমন কথা তো কেউ আমাকে বলেনি। আমি বুড়োবয়সের চামড়ার অবস্থার কথা পড়েছি, শুনেছি, এই দেহের ত্বকের পরিমাণ ১৮ বর্গফুট! একপিস চামড়া হিসেবে মন্দ নয়, তবে মনুষ্য চর্মের ওজন মাত্রা চার কেজি!"

নগেন চৌধুরী বললেন, "দেখুন মানুষের সমস্যা নিজে অভিজ্ঞ অডিটর হয়েও বোকার মতন নিজের ফ্ল্যাট লিখে দিলেন ছেলেকে। এখন নিজগৃহে পরবাস। বাড়িতে একটি মাত্র কলঘর। পুত্রবধূ কথায় কথায় ভীষণ বিরক্ত, জোরগলায় বলেছে, দুর্গন্ধে বাথরুম ঢোকা যাচ্ছে না। এ নাকি একধরনের নরকযন্ত্রণা। এতোদিন পরে একটা বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষকে শিখতে হবে কেমন করে বাথরুম ব্যবহার করতে হয়। ভীষণ লজ্জার ব্যাপার।"

এই বয়সে নিজের বিছানা, নিজের ঘর, নিজের বাথরুম কেন প্রয়োজন তা বোঝা যাচ্ছে। এগুলো কোনও বিলাসিতা নয়।

তা হলে কী ঘটল আমি এবার জানতে চাই নগেন চৌধুরীর কাছ থেকে।

"অপমান।" উত্তর দিলেন নগেন চৌধুরী। "এই বয়সে শরীর নিয়ে যে কোনও ইঙ্গিত মানুষের বুকে বিঁধে যায়। না হলে, বিশ্বপতি গুহরায়ের মতন মানুষ হঠাৎ কেন ভাববেন আত্মহননের কথা?"

নগেন চৌধুরী নিজের মনেই বললেন, "এই জন্যেই বারবার বয়োবৃদ্ধ

বন্ধুদের বলি, টাকাপয়সা বাড়িঘর সম্পত্তি বেঁচে থাকতে কাউকে হস্তান্তরিত করবেন না। যাকে যা দিয়ে যেতে চান তা লিখে রাখুন, নিজের সিদ্ধান্ত ব্যাপারটা গোপন রাখুন এবং টাকাকড়ি বিষয় সম্পত্তির হস্তান্তরটা হবে আপনার শ্রাদ্ধশান্তিব পরে।"

অডিটিং-এ বিশেষজ্ঞ বিশ্বপতি স্বীকার করছেন তাঁর মস্ত ভুল হয়েছে। এখন জানতে চাইছেন, আইন তাঁকে কিছু হেল্প করতে পারে কিনা। কিন্তু একবার ফল পড়ে গেলে গাছ তা ইচ্ছে করলেও ফিরিয়ে নিতে পারে না। এইটা প্রকৃতিরও নিয়ম, উকিলেরও নিয়ম। এদিকে গুহরায় মশায়ের ইচ্ছে জমানো টাকা থেকে দামি পাবফিউম কিনে আনেন, কিন্তু লজ্জায় সে সাহসও পাচ্ছেন না।

নগেন চৌধুরী বললেন, "আমাদের তথাকথিত সুখের সংসারের কী অবস্থা বুঝুন। পছন্দমতন একটা পারফিউম বা গন্ধনাশক কিনবেন এবং ব্যবহার করবেন সে স্বাধীনতা পর্যন্ত আপনার নেই, কারণ আপনি সিনিয়র সিটিজান। এই পৃথিবীর দায়িত্বভার ইতিমধ্যে আপনার কমবয়সী বংশধররা অকুপাই করে নিয়েছে, তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আপনার প্রস্থানের জন্যে।"

আপনার প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নেই। স্কালবোনের সঙ্গে যুক্ত তিরিশটা মাংসপেশির সহায়তায় আপনি যে মুহূর্তের জন্যে মুখের অভিব্যক্তি পাল্টাবেন তারও উপায় নেই, সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে হই হই পড়ে যাবে। অনেক দুঃখে বিশ্বপতি গুহরায়মশায় বললেন, "এই যে সায়েবরা নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে একই ছাদের তলায় বসবাস করতে চান না, পরাশ্রিত হবার চেয়ে একলা মরে পড়ে থাকা যে ওঁরা প্রেফার করেন, তার যথেষ্ট যুক্তি আছে। বিশ্বপতিবাবু দুঃখের সঙ্গে বলেছেন, আগে ভাবতাম সায়েবরা বোকা, হৃদয়হীন, এবং আত্মকেন্দ্রিক, এখন বুঝছি আমরাই বোকা, ভীতু এবং আত্মবিশ্বাসহীন। আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরার সময় গঙ্গাজল সাপ্লায়ের ব্যবস্থা যে বেশি ইম্পর্টান্ট হতে পারে না তা আমাদের মতন বোকচন্দররাই বুঝতে পারে না।"

নগেন চৌধুরী এবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। বললেন, "ঘড়ি ছাড়া আমার চলে না, মশাই। রাত্রেও আমি ঘড়ি পরে শুই শুনে বন্ধুদের কেউ কেউ অবাক হয়ে যান। ভাবেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি সময়বিচার করি কীভাবে? আরে মশাই, মেয়েদের ওই কথাটা বলো দিকিনি, হাতের বালাটি রাত্রে খুলে শোও, তখন বুঝবে অবস্থা!"

এরপর দুঃখ করলেন নগেন চৌধুরী। বললেন, "ঘড়িটা পরি, কিন্তু রাত্রে শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে ঠিক দেখতে পাই না। ঘড়ির বাহার বাড়ছে, কিন্তু বয়স্থদের কথা ভেবে ডায়ালগুলো তেমন ব্রাইট হচ্ছে না।"

"সময়ের মালিকই যখন বয়স্থদের দেখতে চাইছেন না, তখন সময়ের গোমস্তা আমাদের তোয়াক্কা করবে কেন, নগেনবাবু।"

"উঃ মশাই, আপনার চোখা চোখা বাংলা! আপনি কি মন দিয়ে বাংলা কাগজের এডিটোরিয়াল পড়েন?"

ওই অভ্যাসটা সত্যিই আমার কাছে অনেকদিন। নগেন চৌধুরী অবশ্য বললেন, "আমাদের বন্ধু সারকিট সেনগুপ্তর কিন্তু ধারণা একমাত্র বুড়োরাই বাংলা সম্পাদকীয় কলমের বিশ্বস্ত পাঠক। ফলে এই শহরে বুড়োরাই কেবল ওঁদের নীতিকথায় অনুপ্রাণিত হচ্ছে, কমবয়সীরা নিজেদের খেয়ালখুশি মতন যা করবার করে যাচ্ছে।"

আমি বললাম, "এডিটোরিয়াল হয়তো পড়ে, কিন্তু কেউ উপদেশগুলো কাজে লাগায় না। যদি লাগাতো তা হলে তো কলকাতা শহরের নাম এতোদিনে নন্দন কানন হয়ে যেতো।"

নগেন চৌধুরীর চোখদুটো এবার যেন জ্বলে উঠল। আবার আমার হাত ধরলেন। "শুনুন মশাই, আজীবন অফিসের অন্নদাতাদের কাছে মিন মিন করে লাইফটা অপচয় করেছি। এখন আর ওপথে আপনারা কেউ যাবেন না। সুযোগ হলেই প্রতিবাদ করে যান। লুজ বল পেলেই ফুল ফোর্সে পিটিয়ে দিন। প্রত্যেকটি অন্যায়ের প্রতিবাদে, প্রত্যেকটা ফেলিওরের বিরুদ্ধে কর্তা ব্যক্তিদের কাছে চিঠি লিখে যান। খামে বেশি ডাকখরচ লাগে, তাই কয়েকডজন পোস্টকার্ড কিনে রেখেছি।"

আমি তো ওঁর কথা শুনে অবাক। নগেনবাবু বললেন, "এখানকার প্রত্যেক বন্ধুকে বলি, ভুলেও লোয়ার লেভেলে কমপ্লেন করবেন না, বা সাজেশন পাঠাবেন না, ওই স্তরের মানুষ শুধু কানা এবং হাবা হয়ে নয় ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে মন্দির আলো করে বসে থাকছে। নৌকো যদি বাঁধতে হয় তো বড় গাছে বাঁধুন। এই দেখুন, আমি চিঠি লিখছি ইন্ডিয়ার বৃহত্তম ঘড়ি কোম্পানির বড়সায়েবকে—আপনার কোম্পানির ডায়ালটা রাত্রে জ্বলে না কেন? দেখবেন, একটা উত্তর আসবে। যদি উত্তর না আসে, তা হলে কোম্পানির মালিকদের লিখবো। হ্যাঁ মশাই, এই কোম্পানির মালিক কি টাটারা? জামশেদজী টাটা?"

"সে তো কবেকার কথা, নগেনবাবু। স্বামী বিবেকানন্দর সঙ্গে এক জাহাজে জামশেদজী টাটা জাপান গিয়েছিলেন, দেশলাই আমদানি করবার জন্যে। বিবেকানন্দ মতলব দিলেন, ইমপোর্ট না করে নিজেই দেশলাই তৈরি করো না কেন? এইভাবেই ভদ্রলোকের মাথায় এক সময় টাটা স্টিলের আইডিয়া খেলে গেলো।"

"ওহো, এখন টাটা কোম্পানির কর্তা তা হলে জে আর ডি টাটা।"

"কী যে বলেন। উনিও তো যথাসময়ে দেহ রেখেছেন।"

"কী আশ্চর্য দেখুন। সাধারণ মানুষের কী রকম ধারণা যে এঁরা বেঁচে আছেন, না হলে প্রতি বছরে কাগজে এখনও এঁদের ছবি এবং বাণী ছাপা হয় কী করে?"

নগেনবাবুর মাথায় স্পেশাল বুদ্ধি এসে গিয়েছে। উনি বোধহয় জামশেদজী টাটাকেই চিঠি লিখবেন কেয়ার অফ এখনকার টাটা। পূর্বপুরুষদের মুখ চেয়ে ওঁরা অ্যাকশন নিতে বাধ্য হবেন।

আমার দুঃখের ইতিহাসটা নগেন চৌধুরীর কাছে অজানা রাখার উপায় নেই। এই ভদ্রলোক এই অঞ্চলে বসুধৈব কুটুম্বকম্ নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে চলেছেন।

আমি না চাইলেও প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আমার সম্বন্ধে সব কিছু জেনে

নেবার পথ প্রশস্ত করে নিলেন। তারপর নগেন চৌধুরী বললেন, "রিটায়ার হবার পর প্রথম ক'টা দিন একটু কঠিন। ওই যে ডাক্তারবাবুরা শারীরিক কোনো বিপর্যয় হলে বলেন, পাক্কা সেভেনটিটু আওয়ারস্ না যাওয়া পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না। সুখের সময়েও বোধ হয় একই নিয়ম। আমাদের গৃহপ্রবেশেও দেখবেন, তিনদিন তিনরাত নতুন ছাদের তলায় কাটাতে হয়। শুধু দয়া করে আপনি এবং মেমসায়েব ঘাবড়ে যাবেন না। ওষুধটা হল, ভয় পাবো না, ভয়ের কথা চিন্তা ও করবো না। তারপর দেখবেন, ক'দিন পরে সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।"

মানুষটাকে আমার ভাল লেগেছে। এই পাড়ায় এতো কাছে এতোদিন থেকেছি কিন্তু এঁকে খুঁজে পাইনি।

উপাসনা অবশ্য অবাক হবে না। ওর বিশ্বাস যে যেমন চায় সে তেমন পায়। ও তারপর বলবে, যার যেমন প্রয়োজন ঠাকুর তার জন্যে তেমন ব্যবস্থাই করেন।

এইখানেই উপাসনার সঙ্গে মতদ্বৈধ—যার যাকে প্রয়োজন তা যদি মিলতো তা হলে মানুষের অনেক দুঃখই তো কবে মিটে যেতো।

এরপর ক'দিন আমি গৃহবন্দি হয়েছিলাম। সুযোগ বুঝে কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাইরাস একজন অসহায় ভি-আর-এসকে ভয়ানক আক্রমণ করেছে।

আজকাল কলকাতার জেনুইন নাগরিকরা প্যারাসাইট, জার্ম, ভাইরাস এসবের তোয়াক্কা করে না। জ্বরটা বুঝেই, অনেকদিন আগে ডাক্তারের লেখা পুরনো প্রেসক্রিপসনটা ঘুরিয়ে আনলাম। একই রোগে উপাসনার জন্যে এই প্রেসক্রিপসন এনেছিলাম চেম্বার থেকে, তখন ডাক্তারের কড়ি

জুগিয়েছিল রিপন স্ট্রিট। আধা-চেনা ওষুধের দোকানে এবারে জ্বর নিয়ে গিয়েছিলাম। ওরা আমাকে হতাশা করে বললো, অনেক দোকান এখন নামকরা ডাক্তারের রিপিট নির্দেশ স্বাক্ষরিত না থাকলে রিপিট ওষুধ দেয় না। ডাক্তারের সই ছাড়া সব ওষুধ বিক্রি না হলে এ শহরের প্রত্যেক ডাক্তারের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে হতো না কোন্ বনেগা ক্রোড়পতি?

এবারের অসুখে আমার মানসিক অভিজ্ঞতাটা একেবারে আলাদা। আগে অসুখ হলে সিক্‌লিভ, নো ওয়ার্ক কিন্তু ফুল পে। আমি অফিস যাচ্ছি কিনা সে সম্বন্ধে সমস্ত উদ্বেগ আমার কোম্পানির। আর এবারে নিজের সময়ে নিজের শরীর নিয়ে কেবল ভোগান্তি। দুটোয় পার্থক্য গৃহবধূদের বোঝানো কঠিন। উপাসনা আমাকে মৃদু ভর্ৎসনা করলো, দুটো পরিস্থিতির মধ্যে কোনও পার্থক্য সে খুঁজে পাচ্ছে না। শরীরটা যখন আমার, তখন রোগটা মা সন্তোষী যত তাড়াতাড়ি তাড়িয়ে দেন ততই মঙ্গল। সেই জন্যেই তো তার সমস্ত পুজো-আচ্চা।

বিছানায় শুয়ে এবং চেয়ারে বসে আমি সহধর্মিণী উপাসনার স্পিরিচুয়াল জীবন লক্ষ্য করছি, আর ভাবছি, মেয়েরা কত সহজে মেটিরিয়াল ও স্পিরিচুয়াল ম্যানেজমেন্টের মিলন ঘটিয়ে নিয়েছে—পরমার্থ ও পার্থিবকে একে আসনে বসিয়ে দেবার দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারিণী আমাদের দেশের উপাসনারা। আমার মাথায় কখনও ঢোকেনি, মোক্ষের পিছনে ছোটাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব না দিয়ে, বুদ্ধিমতী বঙ্গমণীরা প্রিয়জনের মঙ্গলকামনাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন, এবং তাকেই মোক্ষের পথ হিসেবে ধরে নিয়েছেন। সংসারের মঙ্গল ও নিজের মুক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পায় না এদেশের মেয়েরা।

অথচ এই উপাসনাই কলেজে লেখাপড়া করার সময় অন্যরকম ছিল। আমার মনে হতো বিলেত-আমেরিকার মেয়েদের সঙ্গে আমাদের মেয়েদের মূল্যবোধের কোনও পার্থক্য থাকবে না।

এই আত্মবিশ্বাস আমাদের উপাসনারা কোথা থেকে পায় বলুন তো?

আমি শুনেছি, পরমার্থ থেকে অর্থ যে অনেক বেশি মূল্যবান তা পশ্চিমের মেমসায়েবদের বোঝাতে হয় না। যৌবন, দেহদান, বিবাহ, যৌবনরক্ষা, বিচ্ছেদ, অ্যালিমনি সবই আর্থিক হিসাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করে এগিয়ে চলে। ব্যক্তিগত সম্পর্কটা একটা বড়ধরণের ফিনানসিয়াল ডিসিশন। ফলে কর্মক্ষেত্রে বিপর্যয় এলে কিংবা চাকরি হাতছাড়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় ওদেশের পুরুষ প্রায়ই অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

কিন্তু এখানে উপাসনা সমস্ত ধাক্কা নিজেই সামলে নেবার জন্যে শান্তভাবে সবরকম চেষ্টা নিঃশব্দে চালিয়ে যাচ্ছে। যখন আমি চাকরি করতাম আর যখন আমি অকাল-অবসর নিতে বাধ্য হয়ে বেকার অবস্থায় বাড়িতে বসে আছি, তার মধ্যে কোনও পার্থক্য ঘটতে দেয়নি উপাসনা। বরং অসুস্থ অসহায় স্বামীর জন্যে সারাক্ষণ তার হাজার চিন্তা। উপাসনা উদ্বেগ চেপে রেখে বলছে, একবার যতীন ডাক্তারকে খবর দিই। আমি বাধা দিচ্ছি, কারণ যতীন ডাক্তারের পদধূলি মানেই নগদ আড়াইশ টাকা উধাও। আগে প্রতিবার যতীন ডাক্তার এই টাকা নিয়েছে, তখন বিনা প্রতিবাদে কোম্পানি সেই বিলের বিষ হজম করেছে! উপাসনা কোথায় শুনেছে, আজকাল রসিদ দিতে না হলে, যতীন ডাক্তার পঞ্চাশ টাকা কম নেন। কিন্তু আমি উপাসনাকে আশা দিচ্ছি, এই ভাল হয়ে গেলাম বলে। যতীন ডাক্তারের নতুন প্রেসক্রিশনে নতুন ওষুধ আসবার আগেই জ্বর আমাকে ছেড়ে পালাবার পথ পাবে না।

আমার কথাই শেষপর্যন্ত সত্যি হলো। যতীন ডাক্তার আসতে পারেন এই আশঙ্কাতেই শরীর সুশীতল হলো। তবু ভাইরাস জ্বরকে বিশ্বাস করে না উপাসনা, কোনও একটা ছুতোয় পুনরাক্রমণ হলেই হলো।

আমি আধশোয়া অবস্থায় এক নতুন নেশার সন্ধান পেয়েছি। একটা ফাউন্টেন পেন হলে মন্দ হতো না, আমার অফিসের বন্ধুরা ইচ্ছে করলেই একটা চলনসই পেন দিতে পারতো বিদায়দিনের ঝুলিতে। যাই হোক, আমি একটা ডট পেনেই এখন কিছু লেখার কাজ সারছি।

কত কথা এই কলম থেকে লেখা যাবে জানেন? আগে বলতো এতো পাতা বা এতো শব্দ, এখন এই কোম্পানি তাদের বিজ্ঞাপনে দিয়েছে দশ কিলোমিটার লেখার প্রতিশ্রুতি। দূরত্বের মাপে লেখা! ব্যাপারটা মন্দ নয়! বিজ্ঞাপন স্রষ্টাদের এবার হয়তো কয়েক লিটার দুঃখ কিংবা কয়েক শ গ্রাম সুখকেও কল্পনা করা সম্ভব হবে।

আমি দেখছি, আমার সুখ-দুঃখের মাপ নিতে মেড ইন ক্যালকাটা ডট পেন সাদা কাগজের ওপর মিটারের পর মিটার এগিয়ে চলেছে আপন উচ্ছ্বাসে। আমি লিখছি এই জন্যে যে সব কথা মনে থাকে না, অথচ কিছু কথা ভুলে যেতে ইচ্ছে হয় না। আজকাল এও মনে হয়, অনেক কিছু ভুলতে গেলে এ সংসারে যতখানি দিলদার হওয়া প্রয়োজন তা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অনেক কিছু ছোট ছোট ঘটনা, অনেক ছোট ছোট দেনাপাওনার হিসেব, মানুষকে অকারণে বইতে হয় মৃত্যু পর্যন্ত। তারপর কী হয়, তাও যে জানতে ইচ্ছে হয় না হয় এমন নয়, কিন্তু যতদূর জানি দেহমুক্ত আত্মা আজও স্মৃতির বোঝা বইতে উৎসাহ দেখায় না। দেহবন্ধন থেকে আত্মা সরে পড়ছে বুঝতে পারলে ফাঁকিবাজ কর্মীর মতন স্মৃতির ভাইরাসগুলোও দেহ থেকে সরে পড়াব ব্যবস্থা করে। একবার ভাবছি, স্মৃতিছাড়া কার এই পলায়নী নানাবৃত্তি আছে? বোধ হয় মন। এই মনকে দেহর মধ্যে ফেলে রেখে আত্মার পক্ষে তো সরে পড়ার কোনো উপায় নেই।

আমার এইসব টুকরো টুকরো লেখা আমারই জন্যে। বিখ্যাত মানবমানবীর অবসরের দিনলিপিতে মানুষের বিশেষ কৌতূহল থাকে। যেমন আমার একসময় কৌতূহল ছিল হলিউডের অভিনেত্রী মারলিন দিয়েত্রিচ সম্বন্ধে। শুনেছিলাম, প্রেসিডেন্ট কেনেডি একবার তাঁকে হোয়াইট হাউসে ডেকে বেশ কিছুক্ষণ কেনেডি সান্নিধ্যে থেকে যাবার জন্য একান্তে ঝুলোঝুলি করেছিলেন। জন এফ কেনেডি সম্বন্ধে আমাদের প্রজন্মে তখন সকলেই বিরাট শ্রদ্ধা। এও শুনেছি, লাস্যময়ী হলেও মারলিন বয়সে কেনেডির থেকে বেশ কিছু বড়। তখন ভাবতাম দিয়েত্রিচের ডায়রিতে যদি

এ বিষয়ে কিছু লেখা থাকতো। অনেকদিন পরে সেই খবরের খোঁজ পাওয়া গেলো, ভাগ্যে বিশ্বস্তজনেরা দিনলিপি রচনা করেছিলেন। রমণীসংসর্গের প্রতি আকর্ষণ, প্রেসিডেন্ট কেনেডির দুর্বলতা এখন সকলেরই জানা। কিন্তু প্রেসিডেন্ট কেনেডি এই মোহময়ীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এক দুরূহ প্রশ্ন, আমার প্রখ্যাত পিতৃদেব কখনও কি তোমার সঙ্গে...। মারলিন দিয়েত্রিচ পিতার প্রখ্যাত পুত্রকে বলেছিলেন, "না জন, বিশ্বাস করো, তাঁর সঙ্গে কখনও আমার...হয়নি।"

দিনলিপির দৌলতে একটা বড় কৌতূহলের বোঝা থেকে হাল্কা হওয়া গেলো। না হলে, পৃথিবী এই জন কেনেডি মানুষটা সম্বন্ধে কী ভাবতো কে জানে?

আমাদের মতো অখ্যাতদের ভাবনাচিন্তা ধরে রাখার জন্য এতো কাগজকলম নষ্ট করার মানে হয় না, জানি। অখ্যাত মানুষদের কত পুরনো ডায়রি এইভাবে টেবিলের ড্রয়ার থেকে বিক্রিওয়ালাদের গুদামে চলে গিয়েছে কাগজ হিসেবে পুনর্জন্মের জন্য। তবু ভাবছি, হাতে সময় রয়েছে, সময়ের দাম যখন আচমকা কমে গিয়েছে বলরাম বিশ্বাসের দুনিয়ায়, তখন হঠাৎ নিজের ঠিকানা নিজেই হারিয়ে ফেলবার আশঙ্কা থেকে বাঁচার জন্যে এই প্রতিদিনের বেহিসেবি হিসেব একটা রেখে যাওয়া মন্দ নয়।

আমাদের ফ্ল্যাটের দরজাটা দুপুরবেলায় এই সময় খোলা থাকে। কাজের মেয়েটির সময়ের মূল্য অনেক, সে বেল বাজিয়ে এক মুহূর্তও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ওর ব্যস্ততায় রাগ করেছি, কিন্তু তাতে তেমন লাভ হয়নি, কারণ বিশ্বসংসার তাকে ডাকাডাকি করছে, কত বাড়ির এঁটো বাসন, ছাড়া কাপড়, মেঝের ধুলো কেবল ওর জন্যেই অপেক্ষা করছে। অন্য দেশে জন্ম হলে এবং এমন চাহিদা থাকলে এই মেয়েটি এতোদিনে মিলিয়নেয়ার হয়ে যেতো। এখানে, আমরা সময়ের সঙ্গে সহযোগিতা করে ওর জন্যে দরজা খুলে রাখি, জানি সুরক্ষার কিছুটা অভাব হয়, কিন্তু কলকাতার দুষ্কৃতীরাও তো একধরণের বিজনেসে রয়েছে, বিশ্বাসবাড়ির সম্পদে হাত বাড়িয়ে যে পড়তায় পোষাবে না তা এঁদের অজানা থাকার কথা নয়!

এই সময় কিন্তু কলিংবেল বাজলো না। ভারী গলায় দিলখোলা পর্দায় একটি মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। "বিশ্বাস মশাই কোথায়?"

"আরে চৌধুরীমশাই যে!" নগেন চৌধুরী অভ্যর্থনার জন্যে যেখানে ঢুকে এসেছেন সেই দ্বিবেণী সঙ্গমটিই আমাদের ডাইনিং রুম ও লিভিং রুম কমবাইন্ড। আসলে শয়নমন্দিরের বাইরে এই একচিলতে জায়গাটুকুই আমাদের আছে বর্হিবিশ্ব থেকে আগত অতিথিদের জন্যে। খাওয়া দাওয়ার সময় কেউ আচমকা ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়লে উপাসনা ভীষণ লজ্জা পায়, তাই কিছু আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বাইরের দরজায় একটা ম্যাজিক আই লাগিয়ে নিয়েছি, সুতরাং উঁকি মেরে আগন্তুককে আগাম দেখে নেওয়াটা আমাদের পক্ষে কোনও ব্যাপারই নয়। তবে দরজাটা তো এই সময় অর্গলবদ্ধ থাকে না।

"আরে মশাই, কী ব্যাপার? লংটাইম নো হিয়ার, নো সি!" স্বয়ং নগেন চৌধুরীর তাঁর দীর্ঘ দেহ নিয়ে এই অধমের পর্ণকুটিরে প্রবেশ করেই হুঙ্কার ছাড়লেন।

আমি ধন্যবাদ জানালাম এই অধমের পর্ণকুটিরে পদার্পণের জন্য। তাই শুনে নগেন চৌধুরীর উত্তর . "মনে রাখবেন, সংস্কৃতপণ্ডিতের বংশধর আমি, বাপপিতেমহ টোল চালিয়ে সংসার প্রতিপালন করেছেন। সুতরাং পর্ণ কথাটার মানে আমি ভালভাবেই জানি। সিপাই যুদ্ধের সময় পর্যন্ত এই কলকাতাতেও শুকনো পাতার বাড়িঘর অনেক ছিল, কিন্তু নট নাউ। এখন টালির চাল পাবেন, কিন্তু পাতার বাড়ি আর নেই। তবে এখনও ভদ্রতা করে, বিনয় করে লোকে নিজেদের রাজপ্রাসাদকেও পর্ণকুটির বলে। কলেজজীবনে আমার একজন রিয়াল প্রেয়সী ছিল, তার নাম অপর্ণা। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, নামের মানে কি? সে বললো, দুর্গা। আমি বললাম, দেবী দুর্গার তো হাজার হাজার নাম, এই নামটার অর্থ? অপর্ণা বলতে পারলো না। বললাম, শুনে রাখো, গিরিরাজসুতা নোম্যাডিক শিবের জন্য তপস্যা করার সময় স্রেফ শুকনো পাতায় আদিবাসী স্টাইলে লজ্জানিবারণ করতেন। তাই নাম হলো পর্ণা। তা যখন শিবকে তিনি পরিপূর্ণ কব্জা

করলেন, তখন আপনজনরা বললো, মনোবাঞ্ছা তো পূর্ণ হয়েছে! এবার এই শুকনো শুকনো শালপাতার অঙ্গাবরণ ছাড়ো। তা উনি পর্ণ ত্যাগ করলেন তখন ওঁর নাম হলো অপর্ণা!"

আমি একটু অবাক হচ্ছি, নগেন চৌধুরী আমার ঠিকানা খুঁজে পেলেন কি করে? সেদিন তো তেকোণা পার্কে আমাদের ঠিকানা বিনিময় হয়নি।

"হোয়ার দেয়ার ইজ এ উইলস সিগারেট, দেয়ার ইজ এ ওয়ে।"

নগেন চৌধুরী এবার বললেন, "আমি ভাবছিলাম, লোকটার হলো কি? লোকটার প্রথম দর্শনে যে ঝগড়াটুকু হলো তাতেই কি আমার সম্বন্ধে চিরতরে লোকটার অরুচি হয়ে গেলো? তারপর ভাবলাম, যাবার সময় তো সব মিটমাট হয়ে গেলো। মাথা ঘামাতে বসলাম। ঠিকানা খুজে পাবার উইল যথেষ্ট রয়েছে, অথচ পথ পাওয়া যাচ্ছে না। শেষে একটা উইলস্ সিগ্রেট জ্বালিয়ে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিলুম।

নগেন চৌধুরী বললেন, আপনি আমাকে পুরনো অফিসের নামটা বলেছিলেন, কিন্তু বাড়ির হদিশ দেননি। এদিকে ধোঁয়া পড়তেই বুদ্ধি বললো, আজকাল এই শহরে মানুষের পরিচয় বাপের নামে, বা বংশের নামে নয়। এখন তো কেউ বলে না, মনোহরপুকুরের ঘোষাল বা গাঁজাপার্কের চাটুজ্যে। এখন তো বলে লিভারের লাহাবাবু, লারসেন টুব্রোর মিস্টার আয়ার, ডানকানের মিস্টার ড্যাশ এটসেটেরা। এবার বুঝলাম মশাই উইলস্-এর গুণ, বুথে গিয়ে একটা ফোন লাগালাম রিপন স্ট্রিটে। ওরা প্রথমে বললো, মিস্টার বিশোয়াস রিটায়ার করে চলে গিয়েছেন। আমি বললাম, বলরামবাবু রিটায়ার করেছেন, কিন্তু এখনও চলে যাননি! খুব লজ্জা পেয়ে গেলো আপনার সুযোগ্য সহকারিবৃন্দ, ঠিকানাটা এবার সুড়সুড় করে দিলো। তারপর সেই সূত্রধরে আমি এখানে হাজির।

উপাসনা ওঁকে মিষ্টি পরিবেষণ করতে চাইল। নগেনবাবু বললেন, "মিষ্টি কথাটি পর্যন্ত আমার সামনে বলবেন না, কান দিয়ে মিষ্টি ঢুকলেও সঙ্গে সঙ্গে ব্লাড্সুগার বাড়বে।" অগত্যা মুড়ি ও উইদাউট সুগার চায়ের ব্যবস্থা করলো উপাসনা।

খুব পরিপাটি করে মুড়ি ও চা খেলেন নগেনবাবু। তারপর বললেন, "ডাক্তারবদ্যির কাছে নিয়ে যাবার থাকলে চলুন নিয়ে যাই আপনাকে। আমার তো কোনও কাজকম্ম নেই।"

উপাসনা বললো, "উনি এখন সুস্থ। এই বয়সে আরও একটু রেস্ট হলে...।"

"ওই রেস্ট কথাটা মুখে আনবেন না। হোমিওপ্যাথিক, অ্যালোপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক, উনানি চিকিৎসক সবাই বলছেন, রেস্ট বা অবসর নেবার জন্যে মানুষের শরীরের কোনও পার্টস্ ভগবানের কারখানায় তৈরি হয়নি!"

"কেন মাথার চুল? তার তো কোনও খাটাখাটনির ব্যবস্থা রাখেননি ঈশ্বর," আমি সুযোগ বুঝে প্রশ্ন তুললাম।

নগেন চৌধুরী মশাই বোধ হয় রিডার্স ডাইজেস্টের বেজায় ভক্ত। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "কাজ তেমন নেই বলেই মনুষ্যমস্তক থেকে প্রত্যেক দিন শতখানেক চুল নিঃশব্দে পড়ে যায়। যখন আবার চুল গজায় তখন তার ম্যাকসিমাম আয়ু তিন বছর। অথচ যে পার্টসের এক মুহূর্তের ছুটি নেই, সেই হার্ট ডিউটি দেয় সারা জীবন।" এসব খবর নগেন চৌধুরী রিডার্স ডাইজেস্ট পত্রিকা থেকে নিয়মিত সংগ্রহ করেন।

নগেন চৌধুরী আজ ছাড়লেন না। জোর করে আমাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। বললেন, "জানেন, এক ভদ্রলোক আজ আপনার কার্ড নিয়ে সাতসকালে আমার বাড়িতে হাজির।"

কার্ডটা দেখতে পেয়েই আমার সেদিনকার কথা মনে পড়ল। এক দম্পতিকে মিনিবাসওয়ালা তিনটে স্টপেজ বাড়তি টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কয়েকটা চ্যাংড়া প্যাসেঞ্জারও বৃদ্ধের অবস্থা দেখে মজা পেয়েছিল।

"তাই আপনি বৃদ্ধ দম্পতিকে ভবেশ খাস্তগিরের কাছে পাঠিয়েছিলেন।"

"এক সময় ওঁকে চিনতুম। খাস্তাগির মশাই কাগজে মাঝে মাঝে বৃদ্ধদের সম্পর্কে গরম গরম চিঠিপত্তর লেখেন।"

"ঠিক বলেছেন, বলরামবাবু। ভীষণ স্পিরিটেড লোক এই ভবেশ

খাস্তগির। বলতে গেলে আমি তো ওঁরই চেলা। তা ওই বৃদ্ধদের আপনি কেন ভবেশবাবুর কাছে পাঠালেন?"

"আমি ভাবলাম, ভবেশ খাস্তগির নিজের প্যাডে চিঠিটা পরিবহণমন্ত্রী ও পুলিশ কমিশনারকে লিখলে অভিযোগটা অনেক স্ট্রং হবে।"

"তা শুনুন, ভবেশবাবু আমাকে এই বিষয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। যাচ্ছি ওদিকে, চলুন আপনিও।"

সাইকেল রিকশ ছাড়া নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছবার পথ নেই। রেলের লেভেল ক্রসিংয়ের হাঙ্গামাও আছে।

নগেন চৌধুরীর মাথায় ইতিমধ্যেই নানা পরিকল্পনা। বললেন, আপনার বন্ধুর কাছ থেকে সব জেনে নিয়ে সকালেই পুলিশ কমিশনারকে লম্বা চিঠি লিখে দিয়েছি। সিনিয়র সিটিজানকে অপমান করার ঠেলা বুঝতে পারবে আপনার ওই ড্রাইভার, ভাগ্যে আপনি নম্বরটা নিয়ে নিয়েছিলেন। কমপ্লেন করার সময় প্রায়ই কোনো ডিটেল পাওয়া যায় না, কাকে ছেড়ে কাকে ধরবে পুলিশ?"

"পুলিশের খেয়েদেয়ে কাজ নেই! ওরা বুড়োদের ব্যাপারে থোড়াই মাথা ঘামায়।"

নগেন চৌধুরী বললেন, "শাস্ত্রে বলছে, ইটারন্যাল ভিজিলেন্স ইজ দ্য প্রাইস অফ ওল্ড এজ।"

ওটা তো লিবার্টি সম্বন্ধে বলা হয়েছিল। নগেন চৌধুরী বললেন, "রাখুন মশাই, ওল্ড এজে আমরা তো যা হারাবার আশঙ্কা করি সে তো লিবার্টি— হাঁটা চলার স্বাধীনতা, চোখে দেখতে পাওয়ার স্বাধীনতা, হজম করার স্বাধীনতা। আমি তো কমিশনার সায়েবকে ফোনে বললাম, ওই বিশ্ববখাটে মিনিবাস তো আমাদের নড়াচড়ার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে।"

কমিশনার বাজপেয়ি সায়েব মানুষটি তো খারাপ নয়। বললেন, "মিস্টার চৌধুরী, ইন্টারেস্টিং কথা বলেছেন আপনি। অপরাধ করলে জেল হয়, তার মানে আমরা সাময়িকভাবে অপরাধীর ঘুরে বেড়াবার লিবার্টি কেড়ে নিচ্ছি।"

নগেন চৌধুরী বলে চললেন, "ওঁকে বললাম, জানি বুড়োমানুষের দুঃখ সামলাবার সময় এদেশের কোনও নগরপালের নেই, সবাই ভি-আই-পি, ভি-ভি-আই-পি এবং ল' অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন, একদিন আপনিও সিনিয়র সিটিজান হবেন, সেদিন বেশি দূরেও নয়। তখন আপনার ইচ্ছে হলেও বৃদ্ধদের জন্যে কিছু করতে পারবেন না। বরং এখনই..."

বন্ডেল লেভেলক্রশিং-এর গেট উঠে গিয়েছে। রেল লাইন পেরিয়ে পিকনিক গার্ডেনমুখো আমাদের সাইকেল রিকশ আবার চলমান।

নগেন চৌধুরী বললেন, "লিখেছি, ফোন করেছি, কিন্তু কিছু কাজ যে হবে না, তা ভালভাবেই জানি।"

"কেন নগেনবাবু? আপনাকে তো নিরাশাবাদী মনে হয়নি আমার।"

"বাদী বিবাদী, এসব বড় কথা নয়, বলরামবাবু। পুলিশ এবং সরকার সবাই জানে, বুড়োদের দলবদ্ধ হয়ে হাঙ্গামা বাধাবার কোনো ক্ষমতা নেই। লক্ষ্য করলে দেখবেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের মানুষ অন্যায় করার শারীরিক করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সারা বছরে পুলিশ যাদের অ্যারেস্ট করে তাদের মধ্যে বুড়ো ক'জন তার হিসেব নিন।"

"আপনি বলছেন, দিন বদলাতে পারে? পরিস্থিতির চাপে বুড়োরাও অন্য একধরনের ক্রিমিনাল হয়ে উঠতে পারে!"

নগেন চৌধুরী বললেন, "সেদিন যেন না আসে। কিন্তু সেদিন যদি সমাজ ডেকে নিয়ে আসে তখন সবাই হাড়ে হাড়ে বুঝবে পরিস্থিতিটা। ডি-জি, আই-জি, সি-পি জয়েন্ট সি-পি এঁরা সবাই নতুন ধরণের বিপদে পড়ে যাবেন।"

একটা সরু গলির মুখে আমাদের সাইকেল রিকশ ছেড়ে দেওয়া হলো। আমি ভাড়াটা দিতে চাইলাম, কিন্তু নগেন চৌধুরী হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। বললেন, "মনে রাখবেন, সিনিয়রদের মধ্যে আপনি জুনিয়র।"

অর্থাৎ যত দিন যাবে, বৃদ্ধরা যত দীর্ঘজীবী হবেন, তত বয়োবৃদ্ধদের শ্রেণীভেদ বাড়বে—জুনিয়র সিনিয়র, প্লেন সিনিয়র এবং সিনিয়র সিনিয়র!

একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা। কিন্তু কলিং বেল টিপবার প্রয়োজন হলো না। একটা হলদে কাগজে লেখা রয়েছে : ওপেন। প্লিজ পুশ। অর্থাৎ দরজা খোলাই রয়েছে, কলিং বেল টিপে গৃহস্বামীর উদ্বেগ বাড়িও না।

নগেন চৌধুরী দুবার টোকা দিয়ে, দু'সেকেন্ড অপেক্ষা করে বাড়ির ভিতরে ঢুকলেন হই হই করে। বৃদ্ধ ভবেশ খাস্তগির বললেন, "নগেন, এক সময় হান্ড্রেড মিটারে বেঙ্গল চাম্পিয়ন ছিলাম, এখন বেল বাজলে বিছানা থেকে ওঠে দরজা পর্যন্ত যেতে দশ মিনিট সময় লেগে যায়। বাধ্য হয়ে বাইরে নোটিশ লাগিয়ে দিয়েছি। মানুষ তবু বুঝতে পারে না। তুমি খবরের কাগজে একটা চিঠি লিখতে পারো, সিনিয়রদের বাড়িতে গিয়ে কলিংবেল বাজিয়েই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবেন না, বৃদ্ধ মানুষটিকে অন্তত তিনটে মিনিট সময় দিন। মানুষ নিজের বাড়ির ভিতরেও কত অসহায় অবস্থায় থাকতে পারে তা কমবয়সীদের খেয়াল থাকে না।"

নগেন চৌধুরীর মন্তব্য : "অবশ্যই লিখবো, কিন্তু যারা এইভাবে বেল বাজায় তারা আজকাল লেটার টু দি এডিটর পড়ে না, তারা বিনোদনের পাতা পড়ে, তারা টিভি দ্যাখে। কাগজের এডিটোরিয়াল এবং লেটার টু দ্য এডিটর একমাত্র বয়োজ্যেষ্ঠরাই পড়ে থাকে।"

"তা হলে টিভি-তে সমস্যাটা দেখাও, নগেন। আপত্তি কোথায়?"

"আপত্তি নগদনারায়ণে। টিভি কোম্পানিগুলি বিনাপয়সায় কিছু করবে না। তাদের প্রয়োজন বিজ্ঞাপনের এবং স্পন্সরের। বুড়োরা বিজ্ঞাপন দ্যাখে কিন্তু জিনিস কেনার সঙ্গতি তেমনি নেই। যেসব দর্শকের জিনিস কেনার মুরোদ নেই বিশ্বসংসারের কোনও টিভি কোম্পানির তাদের প্রতি আগ্রহ নেই।"

চৌধুরীর এই কথা শুনে অসুস্থ হলেও ভবেশ খাস্তগির বেশ খেপে উঠলেন। বললেন, "শোনো, বুড়োরা বুড়ো হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও তারা শেষ হয়ে যায়নি। বিশ্বসংসারকে এই অপ্রিয় ব্যাপারটা আমরা না বুঝিয়ে দিলে বোঝাবে কারা? আমাদের পূর্বপুরুষরাই তো বারবার বলেছেন

সঙ্ঘই শক্তি। আমরাই তো একদিন বিশ্বকে মতলব দিয়েছিলাম সংগচ্ছধ্বং, সংবদধ্বং, একসঙ্গে এগোও, একসঙ্গে কথা বলো, একসঙ্গে ভাবনাচিন্তা করো।"

ভবেশ খাস্তগির এবার বললেন, "ফ্লাস্কে গরম জল স্টক করা রয়েছে। টেবিলে টি ব্যাগও রয়েছে। তোমরা একটু নিয়ে নাও।" তারপর আমাকে বললেন, "বলরামবাবু, দেখছেন বুড়োদের কতরকম প্রবলেম। রিটায়ার করার পরে আপনিও এসব বুঝতে পারবেন।"

নগেন চৌধুরী বললেন, "উনিও হয়ে গিয়েছেন! অসময়ে অবসর নিয়ে ইতিমধ্যেই আমাদের দলে ভিড়ে গিয়েছেন।"

পরিষ্কার মাথা ভবেশ খাস্তগির মশায়ের। আমাকে বললেন, "মিনিবাসের ব্যাপারটায়, শুধু একটা চ্যাংড়া ড্রাইভারকে কিছু ফাইন করিয়ে লাভ হবে না। আমরা চাইছি, প্রতি বাস, প্রতি মিনিবাসে সিনিয়রদের জন্য বসবার জায়গা রিজার্ভ থাকুক। যত পারো কাগজে লিখে যাও, নগেন। বিরামহীন লেখালিখি করে দিল্লির বুড়োরা প্লেনে ৬৫ বছরের সিনিয়রদের জন্যে হাফ টিকিট করিয়েছেন।"

"রেল কোম্পানিকেও ওঁরা নড়িয়েছেন। একশ টাকায় তিরিশ টাকা ছাড়া। তবে রেল কোম্পানি মেয়েদের আরও সম্মান দেখিয়েছে—ষাট হলেই সম্মান, যদিও মিনসেদের আরও পাঁচ বছর প্রতীক্ষা করতে হবে।"

এর একটা খারাপ দিকও যে আছে তা খাস্তগির মশায়ের নজর এড়াচ্ছে কেন? "তা হলে স্বয়ং সরকারও স্বীকার করছেন, এদেশের মেয়েরা পুরুষের তুলনায় কম বয়সেই বুড়িয়ে যায়।"

নগেন চৌধুরী হেসে ফেলে আমাকে বাধা দিলেন। "আর গোলমাল পাকাবেন না। কম বয়সে বুড়িয়ে গেলেও মেয়েরা যে সিনিয়র সিটিজান অবস্থায় পুরুষদের থেকে কেওড়াতলার হিসেব খাতা থেকে প্রমাণ হচ্ছে বেশি বাঁচেন এটাও অনেক।"

ভবেশ খাস্তগির বললেন, "আমার শরীর একটু শক্ত হলেই অনেক কাজে নেমে পড়তে হবে। অনেক কাজ অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে।

এইটুকু বডির মধ্যে এতগুলো হাড় সাজানো আছে তা কম বয়সে জানতামই না। হাড়ের ব্যথা নিয়ে এখন ডাক্তারের কাছে গেলেই শুনিয়ে দেন, দুশ ছ' খানা হাড় এইটুকু শরীরকে খাড়া করে রেখেছে।"

ওঁদের কথা মন দিয়ে শুনে যাচ্ছি। ভবেশ খাস্তগির বললেন, "যতদিন না আমি খাড়া হচ্ছি ততদিন নগেনকে যদি পারেন একটু সাহায্য করবেন। মনে রাখবেন, ভয়েসটুকু ছাড়া বয়োবৃদ্ধদের আর কিছুই নেই।"

প্ল্যান পাকা হয়ে গেলো। বিভিন্ন ঠিকানা থেকে একই বিষয়ে একাধিক চিঠি যাবে। মিনি ড্রাইভারের শাসন চাই। বাসে বসার জায়গা রিজার্ভ চাই। মিনিবাসে সিনিয়রদের আর্থিক কনসেশন চাই। কারণ একমাত্র বৃদ্ধরাই টোটো করে ঘুরে ঘুরে আত্মীয়স্বজনদের খবর নেন।

চৌধুরী ও খাস্তগির দু'জনে মিলে একবার মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। মুখমিষ্টি মন্ত্রী উল্টো চাপ দিলেন, বুড়ো বয়সে বেশি ঘোরাঘুরি করে পা হাত-পা ভেঙে লাভ কি? তাঁর মতে, বৃদ্ধদের যেটা বিশেষ প্রয়োজন তা হলো টেলিফোন ঘরে বসে বসে যাতে সারা পৃথিবীর খবরাখবর রাখতে পারেন।

রাইটার্স থেকে বেরিয়ে এসে ভবেশ খাস্তগিরি বলেছিলেন, "পাকা খেলোয়াড়। ওঁকে দেওয়া বলটা নিপুণভাবে এক ধাক্কায় পাঠিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। কেন্দ্র সব করলে রাজ্য সরকার বুড়োদের জন্যে কী করবে? এখনও পর্যন্ত তো হাঁটবার পার্কগুলো ভ্রমণের অযোগ্য করে তোলা ছাড়া আর কিছুই করেনি।"

"ঠিক হ্যায়, অন্য দেশে মন্ত্রীরাও বৃদ্ধ হয়, এখানেও একসময় চিরবসন্তের অবসান হবে। বিনাপয়সার সরকারি গাড়ি হাওয়া হয়ে গেলেই বুঝবে মিনিবাসের পা-দানিতে পা রাখতে গেলে মানুষকে কতখানি হাইজাম্প দিতে হয়।"

বিদায় নেবার সময় পরিবেশটা একটু বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। ভবেশ খাস্তগির বললেন, "মনটা ঠিক রয়েছে, কিন্তু দেহটা সব কথা শোনে না। কত অভিযোগ জানিয়ে কত চিঠি একসময় খসখস করে লিখেছি, এখন

কলম ধরলেই হাত কাঁপে। হাঁটুর অবস্থা নাই বা বললাম। উরুতে একটা পেল্লায় সাইজের হাড় আছে, নাম ফিমার বোন। সেটা নাকি একেবারেই চুনো হয়ে গিয়েছে, ভিজে বাথরুমে একটু অসাবধান হলেই ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যেতে পারে। আগের দিন হলে, ঈশ্বর আল্লা এবং গড তিনজনকেই চিঠি ছেড়ে দিতাম, যে বয়সে শরীরটা সবচেয়ে সুস্থ থাকা দরকার সে বয়সেই মনুষ্য শরীরে এই অবস্থা করেছে কেন?"

ভবেশবাবু কয়েকটা সযত্নে রাখা ফাইল নগেন চৌধুরীর হাতে তুলে দিলেন। ওখান থেকে ফেরার পথে রিকশায় উঠতেও একটু কষ্ট হলো নগেন চৌধুরীর। বললেন, "পাবলিক পরিবহণের ডিজাইনের সময় বিশ্বসংসারের কেউ সিনিয়রদের কথা ভাবে না, বলরামবাবু। এই শহরের সব কিছুই যে বেঢপ এবং উঁচু তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে শুরুতেই মানুষের ষাট বছর লেগে যায়। যখন চোখ খোলে তখন ইট ইজ টু লেট। কমবয়সের মানুষ ভাবে, শরীরের দোষটা ডিজাইনারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে বুড়োরা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ওঠেছে।"

নগেন চৌধুরী এবার বললেন, "ভবেশ খাস্তগির মশাই হাল্কা হয়ে গেলেন, আর আমার বোঝা বেড়ে গেলো। আমি ফাইল রাখতে পারি, কিন্তু ওঁর মতন গড় গড় করে যে কোনো সাবজেক্টে ইংরিজি লিখতে এজন্মে পারবো না। কিন্তু শরীরের ওপর ওঁর অভিমান হয়ে গেলো, দৃষ্টি কেন ঝাপসা হয়? হাত কেন কাঁপে? ওঁকে বললাম, বুড়ো না হলেও লেখার সময় অনেকের হাত কাঁপে। আমার কথা ওঁর বিশ্বাস হলো না। একজনকে চিঠি লিখেছিলেন, সেই কর্তাব্যক্তি চিঠিটা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, পড়া যাচ্ছে না বলে। যারা আপিসে কাজ করে তাদের অনেকের ধারণা প্রত্যেক বুড়োর হাতের গোড়ায় টাইপ মেশিন আছে এবং কমপিউটরও আছে।"

নগেন চৌধুরী বললেন, "আপনি কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আপনি ভবেশ খাস্তগিরের মতন ইংরিজি এবং বাংলায় কড়া কড়া চিঠি লিখবেন, বাকি ব্যবস্থা আমি করে নেবো।"

আমি এবার নগেন চৌধুরীকে বললাম, "আপনি সত্যিই ভবেশ খাস্তগিরকে ভালবাসেন।"

নগেন বললেন, "ওঁকে চিনতামই না। তারপর একবার পার্কে দেখা হয়ে গেলো, ভাবও হলো। রিটায়ার করে প্রথম দিকে বড় একা একা লাগতো। বউয়ের কাছেও লজ্জা লাগতো। সারাটা সময় নিজের যন্ত্রণায় পাগল হয়ে নিজেই ঘুরে বেড়াতাম। তখন লেকের ধারে মাঝে মাঝে হাওয়া খেতে যেতাম। ওখানে অনেক বৃদ্ধ জমায়েত হন। দেখলাম ওঁদের সঙ্গে ঠিক মিশ খাওয়াতে পারছি না।"

জিজ্ঞেস করলাম, "কেন? আপনি তো ভীষণ মিশুকে লোক।"

হাসলেন আমার নতুন বন্ধু নগেন চৌধুরী। "বলরামবাবু, ভেবেছিলাম, কাজকর্ম শেষ করে অবসর এলে মানুষের মধ্যে স্তরভেদ থাকে না। কিন্তু বুঝলাম, তা হয় না এই কলকাতা শহরে। কে কোন পজিশন থেকে রিটায়ার করেছেন সেটা অবশিষ্ট জীবনে মস্ত ইমপর্ট্যান্ট ব্যাপার। আরে বাবা, কাজের পালা তো চুকে গিয়েছে, এখন তোমারও কাজ নেই, আমারও কাজ নেই। তোমার চুল পেকেছে, আমার চুল উঠে টাক পড়েছে। তোমারও ত্বক কুঁচকেছে, আমারও কুঁচকেছে, তোমার দাঁত নেই, আমারও নেই, তোমারও ছানির সমস্যা, আমারও তাই, তুমি কানে কম শোনো আমিও কম শুনি, আর লাস্টলি তোমারও চাকরি নেই, আমারও চাকরি নেই। কিন্তু তবু লেকের সিনিয়ররা অন্য এক স্তরে বিচরণ করেন। শেষ দিনে যে মানুষ যে পদ থেকে রিটায়ার করেছেন সেটাই যেন একটা চিরকালের ফুলস্টপ হয়ে যায়, কিছুতেই মুছে যাবার নয়।"

নগেনবাবু বললেন, "লেকের ধারে এবং বিধান নগরে বুড়োদের হাঁটা দেখলেই অন্য বুড়োরা বুঝতে পারে, পেনসন না প্রভিডেন্ট ফান্ড। হাতে যদি ছোট রুল কাঠ থাকে তাহলে বুঝবেন খুবই সিনিয়ার পোজিসনে ছিলেন। হাতের লাঠি, ড্রেশ, জুতো, হাঁটার স্টাইল বলে দেবে আই এ এস না ডবলু বি সি এস। লাঠিটা এখন অবশ্য প্রভাতভ্রমণের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে অনেকের, তার কারণ অবশ্য কুকুর। স্বাস্থ্যের লোভে মানুষ এবং

স্বভাবের প্রকোপে কুকুর—দু'রকম জীবই প্রভাত ভ্রমণে বেরুতে বাধ্য হয় আজকাল।

লেকের রাস্তাতেই একদিন ভবেশ খাস্তগিরকে দেখেছিলেন নগেন চৌধুরী। বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমার মনের অবস্থা বুঝলেন ভদ্রলোক। বড় একা ছিলাম কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে। বাঙালি মালিক একবার আমাদের মতামতও নিলেন না, ছেলের ওপর অভিমান করে বিজনেসের ঝাঁপ নামিয়ে দিলেন।

"ভবেশ খাস্তগিরই সেবার আমাকে বোঝালেন, কোন দুঃখে আপনি একলা থাকতে যাবেন? এই দেখুন না, আমি কত কাজ যোগাড় করে নিয়েছি। মাইনে যদি না চান, তা হলে এই সংসারে এখনও এতো কাজ আছে, যে করে শেষ করতে পারবেন না।"

"আমি ওঁর কথা মতোই চলবো কিনা ভাবছিলাম। তারপর..."

তার পরের ব্যাপারটা এই ক'দিনে আমার জানা হয়নি। নগেন চৌধুরীর স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। একলা মানুষ, হাসপাতালে যাতায়াত করা, হাসপাতালের সিঁড়িতে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বসে থাকা ভীষণ কষ্ট।

ভবেশ খাস্তগির তখন বন্ধুর মতন নগেনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ভবেশ বলতেন, "থানা ও হাসপাতাল, পুলিশ ও ডাক্তার একা সামলানোর ট্রেনিং এই পৃথিবীতে কারও নেই। দুঃসময়ে পাশে কেউ একজন বসে থাকলে হাসপাতালের ওয়েটিং রুমের রাতগুলো আপনাকে গিলে খেতে পারে না, বিশ্বাসমশাই।"

তখন দু'জনে কতরকম গল্প হতো হাসপাতালের সিঁড়িতে বসে।

ভবেশ খাস্তগির বলতেন, "মানুষ একটা পিকুলিয়র জীব, চৌধুরী মশাই। সব কষ্ট শেষ পর্যন্ত নিজের শরীরকেই নিতে হয়, কষ্টের সময় মানুষ কাউকে কাছে পেলে ভীষণ খুশি হয়।"

নগেন চৌধুরী বলেছেন, "আপনি আমার আত্মীয় নন, তবু আমার জন্যে কত কষ্ট করছেন অকারণে।"

ভবেশ খাস্তগির বলেছেন, "আপনাকে নিয়ে পারা যায় না! আত্মীয় হতে

গেলে রক্তের সম্পর্ক থাকতেই হবে একথা কোন শাস্ত্রে বলেছে? আপনি মানুষের ইতিহাস পড়ে দেখবেন, মানুষ ভীষণ চালাক, সময় বুঝে সুযোগ বুঝে ঠিক সঙ্গী খুঁজে নিতে তার তুলনা নেই।"

তারপরের ব্যাপারটাও আমার জানা ছিল না। "যেদিন ভোরে আমার স্ত্রী চলে গেলেন, ভবেশ খাস্তগিরের জন্যে আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। হাসপাতাল থেকে বাড়ি, বাড়ি থেকে শ্মশান সব নিঃশব্দে করলেন। তারপর ওই চৈতন্য রিসার্চ সেন্টারে শ্রাদ্ধশান্তি।"

খাস্তগির বেশি কথা বলেন না, কিন্তু জীবনটাকে ভালভাবে বুঝে গিয়েছেন। উনি বলেন, "এই পৃথিবীতে একলা থাকতে ভয় পায় শিশুরা আর বুড়োরা। শিশুদের মানসিকতা খুঁটিয়ে দেখিনি কখনও, কিন্তু বুড়োদের বুঝিয়ে বলবেন, বিশ্বসংসারে একলা থাকবার কোনও প্রয়োজনই নেই। ভাগ্য যেমন ভয় দেখায়, মানুষও তেমন ইচ্ছে করলেই দল পাকিয়ে একাকীত্বকে গোহারান হারিয়ে দিতে পারে।"

নগেন চৌধুরী বললেন, "শুনুন খাস্তগিরমশায়ের দু'একটা মূল্যবান বাণী। যারা শিখতে ভয় পায় তারা বাঁচতেও ভয় পাবে। ওয়ান প্লাস ওয়ান কখনও টু নয়, অন্তত থ্রি, ভাগ্য ভাল হলে ওয়ান প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়ালটু ইনফিনিটি, অর্থাৎ অনন্ত। একলা থাকবার ভয়ে মানুষ সংসার করে, কিন্তু দেখো, শেষ বয়সে প্রায়ই সংসারী লোকের একাকীত্ব বা দুঃখ থেকে পরিত্রাণ নেই। আর যারা বুড়োবয়সকে ভয় না পেয়ে কমবয়সে সংসারকে ডোন্ট কেয়ার করল, সেই সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সভ্যদের দেখো। বুড়ো বয়সে এঁরাই হ্যাপিয়েস্ট, এঁরা কেউই একলা নন ঠাকুরের আশীর্বাদে। সতীর্থের সেবা ও প্রসন্ন সান্নিধ্য ওঁদের কামিনীকাঞ্চনহীন সন্ন্যাসজীবনের অঙ্গ।"

অনেক কঠিন ব্যাখ্যা কেমন সহজে দিয়ে গেলেন নগেন চৌধুরী। রান্নার কিছুই জানতেন না তিনি। ভবেশ খাস্তগির ওঁকে বললেন, জিনিসটা কিছুই নয়। রান্না না জানার জন্যে কোনও মানুষ আজও অনাহারে মারা যায়নি। বেসিক ব্যাপারটা হলো, সেদ্ধ, পোড়া, ঝলসানো, ভাজা, ভাপা এটসেটরার মাধ্যমে খাবার জিনিসকে নরম করে আনো, স্বাদ আকর্ষণীয় করবার জন্য

তেল, নুন, মশলা এটসেটেরা প্রয়োজন মতন মেশাও, নাউ ইট ইজ রেডি। আসল সমস্যাটা হলো রান্নার উপকরণগুলো জোগাড় করা। মানুষের নোলা দিনে চারবার আস্কারা পেয়ে পেয়ে কত কিছুর স্বাদ যে পেতে চায় তার হিসেব নেই! আর নোলোকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে মানুষ হিমালয়ের চুড়ো থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ পর্যন্ত খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে।

নগেন চৌধুরী বললেন, "আমি রান্নার রহস্যটুকু খাস্তগিরমশায়ের দয়ায় মাত্র তিন সপ্তাহে শিখেছি। তবে এটা বলবো, প্রত্যেক পুরুষ মানুষকে কোনও এক সময়ে তার সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গিয়ে মিলিটারি কায়দায় হাতে কলমে সংসারকর্ম শিখিয়ে দেওয়া উচিত। আইন করা উচিত, সংসার কর্মের ট্রেনিং না হলে, বিয়ে করার লাইসেন্স পাবে না কোনো বাঙালির ছেলে।"

আমি এবার নগের চৌধুরীকে উস্কে দিলাম, "রান্না তো আপনি বলছেন মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়।"

এবার হাঁ-হাঁ করে উঠলেন নগেন চৌধুরী। "দয়া করে আপনি খবরের কাগজের রিপোর্টারদের মতন আমাকে মিসকোট করবেন না। আমি বলেছি বেঁচে থাকার মতন রান্না। তারপর আপনি যদি রন্ধন শাস্ত্রে এম এ. পি-এইচ ডি হতে চান তা হলে হোল লাইফ রসবতী অর্থাৎ রাজকীয় রান্নাঘরে পড়ে থাকুন, রিসার্চ করুন, নোবেল পুরস্কার জিতুন, কার কি বলবার আছে?"

একটু থেমে নগেন চৌধুরী বললেন, "বিশ্বাসমশাই, শেষ জীবনে রান্নাবান্না শিখে একটা সাধ হয় ভীষণ। আমার স্ত্রীকে যদি একবারের জন্যে আমার রান্না খাওয়াতে পারতাম। ও স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না, আমি কোনওদিন এই কঠিন কাজটা পারব।"

"ওই যে ছেলেদের কমপালসারি মিলিটারি ট্রেনিং-এর কথা বললেন, ওটা আপনি বাংলায় আরম্ভ করতে চান কেন?" আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম নগেন চৌধুরীকে।

"হাউস কিপিং-এর সবচেয়ে খারাপ জায়গা তো এই বেঙ্গল। এর জন্যে

দায়ী অবশ্য এদেশের মায়েরা এবং বউরা।"

নগেনবাবুর মতে রান্নার থেকে হাজারগুণ শক্ত প্রতি রাত্রে বিছানা করা, মশারি টাঙানো, এবং ভোরবেলায় বাসন মাজা।

"এই ধরুন চা করা, শুনতে খুব সহজ। কিন্তু বাসনমাজার ওপর এর এফেক্ট দেখুন, দু'জনে তরিবৎ করে খেতে হলো অন্তত বারোটা আইটেম লাগবে। ওয়ান সসপ্যান অ্যান্ড ঢাকনা, ওয়ান টিপট, উইথ ঢাকনা, ওয়ান ছাঁকনি, ওয়ান দুধের পাত্র, একজোড়া কাপ, একজোড়া ডিশ এবং দুখানা চামচ। এবার আইটেমগুলো যোগ করুন।"

আগে কখনও এসব হিসেব করেননি নগেন চৌধুরী, এখন প্রায়ই করেন এবং সেই সঙ্গে দুঃখ করেন, স্ত্রী বেঁচে থাকতে কোনওদিন কাপ ডিশ ধোয়া তো দূরের কথা, কলের বেসিন পর্যন্ত ওগুলো এগিয়ে দেননি। কখনও তাঁর মাথায় আসেনি, বাসনপত্র শুধু ধুলেই হয় না, ওসব শুকনো করতেও তরিবৎ প্রয়োজন।

সুরসিক নগেনবাবুর আর এক অভিযোগ বাংলার ধুলোর বিরুদ্ধে। এদেশ সম্বন্ধে সায়েবদের দুঃখ ছিল, জুয়েল ইন দ্য ক্রাউন, কিন্তু বেজায় গরম এবং ধুলো—হিট অ্যান্ড ডাস্ট। গরমটা মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু এই ধুলো। প্রতিদিন কয়েক কেজি ধুলো সংসারের বর্ডার পেরিয়ে এদেশের ঘরে ঘরে অনুপ্রবেশ করছে, কিন্তু বাংলার গৃহবধূও রণচণ্ডীর মতো সম্মুখসমবে নেমেছেন ধুলোকে ঝেড়েপুঁছে বিদায় করতে। নগেনবাবু আগে ভাবেননি, কিন্তু আজকাল মনে হয়, রণপরিকল্পনার গোড়ায় গলদ রয়ে গিয়েছে। ওই ধুলোকে সুদূর কোথাও নির্বাসনে না পাঠিয়ে কেবল রাস্তায় বিতাড়িত করা, যাতে পরের দিন আবার বর্ডার লঙ্ঘন এবং আবার সুখের সংসারে অনুপ্রবেশ।

আজ উপাসনা আমার ওপর ভীষণ বিরক্ত। তাকে বীরদর্পে সরিয়ে দিয়ে আমি অকস্মাৎ রান্নাঘর অকুপাই করেছি।

অনুগত স্বামীর এমন আচরণের ব্যাখ্যা সে খুঁজে পাচ্ছে না। আমিও বলতে চাই না, অপূর্ণ সাধের জন্য নগেন চৌধুরী যে বেদনা অনুভব করছেন তা আমি কখনও ভোগ করতে চাই না।

উপাসনা জানেও না যে, আমি নগেন চৌধুরীর ট্রেনিং-এ রসবতীতে আকৃষ্ট হয়েছি। রসবতী শব্দের অর্থ যে কোনও সুরসিকা সুন্দরী নন তা উপাসনারও জানা ছিল না, তাকে বললাম, রসবতীর অর্থ রান্নাঘর! মেয়েরা নানা আশঙ্কায় তাঁদের মূল্যবান সম্পদটিকে রসবতীর ধারে কাছে আসতে দিতে উৎসাহিনী নন।

রন্ধন যুদ্ধে আমার বিপর্যয় যে অবশ্যম্ভাবী তা উপাসনা ধরেই নিয়েছে। তার বাড়তি চিন্তা লোকভয়ের। প্রতিবেশী অথবা প্রিয়জনরা যদি শোনেন, উপাসনা সেচ্ছা অবসরের শিকার স্বামীদেবতাটিকে সংসারের সূপকারের ভূমিকায় ঠেলে দিয়েছে তা হলে তার দুর্নামের অবধি থাকবে না।

আমি অবশ্য উনুনে রান্না চড়িয়ে ষড়রসের সম্ভাব্য সমন্বয় সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করতে উৎসাহী, কিন্তু উপাসনা আমার অপ্রত্যাশিত আচরণকে কিছুতেই সহজভাবে নিতে পারছে না।

আমি বলেছি, "এবারের সাপ্তাহিক সাংসারিকায় একটা মজার কার্টুন বেরিয়েছে পি এফ বনাম পেনসন। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের পাওনা চুকিয়ে নেবার পরে গৃহস্বামী গামছা পরে রান্না সামলাতে গিয়ে অনভ্যস্ত পরিশ্রমে ঘেমেনেয়ে উঠেছেন ; আর মাসিক পেনসন পাওয়া অপর গৃহস্বামী পায়ের

ওপর পা তুলে দিয়ে আরাম-কেদারায় আধশোয়া অবস্থায় অবসর সুখ উপভোগ করতে করতে সাংসারিকা পাঠ করছেন। দুটি ছবিতেই একজন সুদেহিনী আধুনিকাকে দেখা যাচ্ছে। এই মনোহারিণী মহিলাটি কে তা ছবির ক্যাপসনে বলা হয়নি। আমার আশঙ্কা, ইনিই নায়কের সহধর্মিণী।

উপাসনা প্রতিবাদ করছে, "মোটেই নয়। ওটি ভদ্রলোকের পুত্রবধূ। বিশ্বাস না হলে, সাংসারিকা সম্পাদকীয় অফিসে ফোন করো।"

আমি অবসরপ্রাপ্ত, কিন্তু মাসিক পেনসনের বিরল সৌভাগ্য আমার নেই। বিভিন্ন পোস্টের সিঁড়ি বেয়ে গুড্‌হাউস কোম্পানির বুরোক্র্যাসিতে আরও দু'-পা এগোতে পারলে আমিও পেনসনার হতে পারতাম। উপাসনার কাছে এসব তথ্য অজানা নয়। সুতরাং পি-এফ-নেওয়া হতভাগ্য স্বামী হিসেবে ঘর্মাক্ত কলেবরে রান্নাঘরে যে আমিই শোভা পাচ্ছি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহর অবকাশ নেই।

উপাসনা বুঝছে, তার স্বামীর এও একধরনের পাগলামি। আচমকা অবসরপ্রাপ্তরা যে অপরিচিত পরিবেশে নানা ধরনের মানসিক ব্যাধির শিকার হতে পারে তাও তার অজানা নয়। উপাসনা জানে, এসব ক্ষেত্রে অর্ধাঙ্গিনীকে একগুঁয়ে হতে নেই, স্বামীদেবতা যা চান তা প্রাণ খুলে করতে দিতে হয়।

অতএব আজ ঝটপট স্নান সেরে নিয়ে দু'জনে একসঙ্গে খেতে বসেছি। অর্ধাঙ্গিনীর মুখোমুখি বসে আমি দেখছি, স্বামীর রান্নার উৎকর্ষ তেমন কিছু না হওয়া সত্ত্বেও উপাসনা তা উপভোগের চেষ্টা করছে। তবে সে একটু লজ্জাও পাচ্ছে, বলছে এ সব অন্য কেউ যেন জানতে না পারে। আমি প্রিয়তমার প্লেটে কিছু খাবার তুলে দিতে দিতে স্মরণ করছি, পুজোর সময় অনেক মণ্ডপে কুমারীপূজার ব্যবস্থা আছে, আর সেই সঙ্গে ভাবছি, বাঙালিরা যদি বছরের কোনো একদিন ঘরে থাকা সাক্ষাৎ দেবী দুর্গার পুজোর ব্যবস্থা করতো তা হলে কেমন হতো? কপালে তৃতীয় নয়ন অনুপস্থিত বলে যদি দেবী দুর্গার স্ট্যাম্প দিতে দ্বিধা হয়, তা হলে ঘরের বউদের সম্মানে গৃহলক্ষ্মীপূজার ব্যবস্থা হোক বছরে অন্তত একদিন।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধে হয়। নগেন চৌধুরী মশায় ঠিক এইসময় আমাকে ডাকতে এসেছেন। ব্যাপারটা জানা না থাকায় নগেন চৌধুরী সরল মনে উপাসনাকে বললেন, "আজ খুব তরিবৎ করে কর্তাকে খাওয়াচ্ছেন দেখছি, মিসেস বিশ্বাস। জানেন, আমার ওয়াইফও তাই করতো, বাড়তি খাওয়ানোর একটা কিছু ছুতো পেলে আর রক্ষে নেই।"

নগেনবাবুকে এবার উপাসনা জিজ্ঞেস করে বসলো, "আপনি আজ কী খেলেন?"

সরলমনে নগেনবাবু উত্তর দিলেন, "ওয়ার্ল্ডের সিমপ্লেস্ট মেনু। ভগবান বুদ্ধটুদ্ধ বোধ হয় এইরকম হাল্কা খেয়েটেয়ে সিরিয়াস তপস্যা করতেন। আধসিদ্ধ ডিম এবং পাউরুটি। একবার ভাবলাম, ওমলেট বানাই। বাড়িতে সরষের তেল আছে। কিন্তু দেখলাম এককাঁড়ি বাসনপত্তর ধুতে হবে। তারপর মনে পড়লো, ডাক্তার বলে দিয়েছেন, ওমলেট হজম হতে হাফ সিদ্ধ ডিমের চারগুণ সময় লাগে। চমৎকার ব্যাপার, পাঁচ মিনিটে খানা রেডি। আরও বুদ্ধি করে ডিমটা সময়মতন তুলে নিয়ে ওই গরম জলেই চা বানালাম। বাড়ির কাজের মেয়েদের নো-তোয়াক্কা করবার জন্যে সায়েব কোম্পানি অনেক গবেষণা করে চায়ের ব্যাগ এবং চিনির প্যাকেট বানিয়েছে। এছাড়া স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, তাই চায়ে দুধ দেওয়া বন্ধ করেছি। একশ বছর আগে স্বামীজী লেবু-চায়ের পক্ষে প্রচণ্ড সওয়াল করেছেন।"

উপাসনা বললো, "সন্ন্যাসী মানুষ, ওঁর কাছে খাওয়াদাওয়ার পরামর্শ কী নেবেন?"

নগেন চৌধুরী উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন, "বেদ বেদান্তর কথা শুনুন চাই না শুনুন, ওঁর খাওয়াদাওয়া সম্পর্কে নির্দেশগুলো আমি অন্ধের মতন অনুসরণ করি। যেমন শেষজীবনে ওঁর ফেভারিট ড্রিংক ছিল, ছাগলের দুধের চা, যা বাঁট থেকে দুয়ে নিয়ে ফ্রেশ চায়ে মিশিয়ে দেওয়া হতো। আমি ছাগল-চা খেয়েছি—দুর্দান্ত।"

নগেন চৌধুরী এবার চিন্তিত, কারণ ডিম সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দর কোনও মন্তব্য হাতের গোড়ায় পাচ্ছেন না। তবে নগেনবাবু বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছেন, বনের মুরগিকে ঘরে এনে ইন্ডিয়াই প্রথম 'মানুষ' করেছিল। এই যে সারা দুনিয়া আজ প্রাণভরে মুরগি খাচ্ছে তা ভারতেরই অবদান। প্রাচীন ভারত এই পৃথিবীকে একটাও বাজে জিনিস উপহার দেয়নি, এইটাই ধারণা নিষ্ঠাবান ও বিবেকানন্দ-অনুরাগী নগেনবাবুর।

"কেন আফিম?" নগেনবাবুর সামনে অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলে উপাসনা মজা করতে চায়।

প্রশ্নের উত্তর দিতে নগেনবাবু অবশ্যই রেডি। তিনি বললেন, "অহিফেন ইন্ডিয়ায় সমাদৃত, রণক্ষেত্রে রাজপুত যোদ্ধারা নিজেরাও অহিফেন খেতেন, যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়াদেরও খাওয়াতেন। কিন্তু এই বিতর্কিত বস্তুটি ইন্ডিয়ান নয়, মাত্র আট-নশো বছর আগে আরবরা এ দেশে অহিফেন আমদানি করে। ওঁরা এটি খেতে শিখেছিলেন ইউরোপের গুরুদেব গ্রিকদের কাছে। অথচ সায়েবরা আজকাল কথায় কথায় এমন ভাব করে যেন অহিফেন মানেই ইন্ডিয়া। চায়নাতে ওপিয়াম ওয়ার হয়েছিল, ক্যালকাটা থেকে সে যুদ্ধে মদত দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে সবেরই পিছনে ছিলেন, ইংরেজরা।"

দুপুরবেলা কাজকর্ম না থাকলে নগেনবাবু প্রাণভরে বই পড়েন। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বই পড়তে এক পয়সাও লাগে না। পুরনো সাবজেক্টের বইগুলো আজকাল তেমন ইসুও হয় না, সুতরাং গাঁজা, ভাঙ, চরস, আফিম এটসেটরা সম্বন্ধে যত খুশি জেনে নাও সরকারী গ্রন্থাগারের স্নেহপ্রশ্রয়ে, কেউ আপত্তি করবে না।

উপাসনার বহু অনুরোধ সত্ত্বেও নগেনবাবু আমাদের বাড়িতে খেলেন না। বললেন, "ডবল মধ্যাহ্নভোজন এই বয়সে? নৈব নৈব চ।"

অতঃপর রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি আমরা দু'জনে। ট্রাম লাইনের কাছে এসে নগেন চৌধুরী যখন শুনলেন উপাসনার আপ্যায়নের জন্য তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি আজ রান্নাঘরের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছিলাম, তখন আচমকা ওঁর চোখ সজল হয়ে উঠলো। বললেন, "এ জানলে আমি আজ আপনার

ওখানে খেতাম। জানেন, বাইরে খেয়ে এসেও আমি কয়েকবার গৃহিণীর রান্নার স্বাদ উপভোগের জন্যে ডবল-লাঞ্চ করেছি, কখনও কিন্তু শরীর খারাপ করেনি।"

ভবেশ খাস্তগির ও নগেন চৌধুরীর প্রিয় প্রতিষ্ঠানটির নাম 'ব
আদিতে ওঁরা নাম দিয়েছিলেন 'সায়াহ্ন'।

কিছুকাল পরে দু'একজন সভ্য মৃদু আপত্তি জানালেন। সায়াহ্ন মানে তো পাঁচ ভাগে বিভক্ত দিনের শেষ তিনটি মুহূর্ত। কারণটা কী কেউ বুঝছে না, কিন্তু কেন জানি না হেরে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া, শেষ হয়ে যাবার সুর রয়েছে ওই সায়াহ্ন শব্দটির মধ্যে। অথচ বয়োজ্যেষ্ঠরা সবাই চাইছেন উৎসাহ, নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করার পর্বে পৌঁছেছেন তাঁরা, এখন তো সূর্যস্তের কোনও ইঙ্গিত নেই।

ভবেশ খাস্তগির তখন প্রস্তাব দিয়েছিলাম, নাম হোক অস্তমান। নগেন চৌধুরী একটা রোমান্টিক উদ্ধৃতিও সংগ্রহ করেছিলেন, যার মধ্যে বার্ধক্যের ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই—শেষ যৌবনের ভরে, দেহ ঢল ঢল করে, অস্তমান ভানুর তুলনা।

কিন্তু এটাও মনে ভয় ধরিয়ে দিল বয়োজ্যেষ্ঠদের সারাক্ষণ কে আর অস্ত যাওয়ার কথা ভাবতে চায়? অবশেষে 'অবসরিকা'। অস্তরাগ, অস্তগিরি, অস্তশিখর কারও সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই।

প্রথম দিকে ওঁরা ভাবতেন, বয়োবৃদ্ধদের দলবদ্ধ করে এদেশে সুবিশাল এক আন্দোলন গড়ে তুলবেন, আমেরিকায় ইংরিজি নামের এমন প্রতিষ্ঠান আছে যার সভ্য সংখ্যা কয়েক মিলিয়ন। অবসরিকায় মূল ব্যাপারটা এখনও

শাদামাটা। নিয়মকানুনের বন্ধন নেই। এমন কী চাঁদা দেওয়ার বাধ্যবাধকতাও নেই।

নগেনবাবু দেখেছেন, প্রথমে চাঁদা দিয়েছে, পরে চাদা আসেনি, কিন্তু তাই বলে বিপদের সময় এঁর প্রয়োজনের সময় পাশে দাঁড়ানো যাবে না, তা কেমন করে হয়?

নগেন চৌধুরী আমাকে ভালভাবেই জড়াতে চান অবসরিকায়। তিনি বলেছেন "আমরা প্রথমে জোট বেঁধে দিই। এক জনের সঙ্গে আরেকজনের সম্পর্কের গাঁটছড়া। দুই জনের জানাশোনা হোক, বন্ধুত্ব হোক আমাদের অবসরিকার মাধ্যমে।"

নগেনবাবুই খবর দিলেন, "জানেন মশাই, মজার ব্যাপার হয়েছে। আমাদের দুই মেম্বার বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে সোসিওলজিতে। ইউনিভার্সিটির অধ্যাপিকা এঁদের দেখতে আসবেন বলছেন।"

"ওঁরা কী এমন করলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে নাম উঠে যাচ্ছে?"

উৎসাহী নগেনবাবুর উত্তর, "চলুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।"

অতএব আমরা আবার রিকশর যুগলযাত্রী। নগেনবাবুর ফেভারিট চালক আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। ওঁর কাছ থেকে লোকটি ভাড়া কম নেয়। আর নগেনবাবু রিকশচালককে বন্ধু করে নিয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে যখন নিজের খিদে পায়, তখন রিকশ থামিয়ে শান্তিভবন ইস্কুলের সামনে নগেন চৌধুরী গরম কচুরি খেয়ে নেন, রিকশওয়ালাকেও খাওয়ান। সে একটু অবাক হয়ে যায়। নগেনবাবু তখন বলেন, "ওরে বাপধন, আমার কোনো বাড়তি খরচ হচ্ছে না, বাড়িতে বউ থাকলে তো তার জন্যেও কচুরি কিনতে হতো।"

নগেনবাবু ফিসফিস করে আমাকে বললেন, "আমার গৃহিণী ছিলেন লাজুক মানুষ, কেউ অভুক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে খাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। বলতেন, খাবার দেখলেই দেহের মধ্যে যে

নারায়ণ আছেন তিনিও বিনা নিমন্ত্রণে আসনে বসে পড়েন!"

এই রিকশওয়ালাকে পুরো মুঠোর মধ্যে রেখে দিয়েছেন নগেন চৌধুরী। তাকে বললেন, "আজ তোমাকে অনেক ছোটাবো। এক ভাঁড় গরম চা খেয়ে নাও বাছা। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, বউকে যে কথা দিয়েছিলাম তা বর্ণে বর্ণে মেনে চলবো, দিনে দু'তিনবারের বেশি চা কিছুতেই পান করবো না।"

রিকশওয়ালা পিকনিক গার্ডেনের ফুটপাথের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গরম চা খাচ্ছে, আর নগেন চৌধুরী বলছেন, "কলকাতার শিশুদের এবং বুড়োদের অগতির গতি এই রিকশ। এরা না থাকলে মানুষের যে কি গতি হতো!"

নগেনবাবুর ইচ্ছে ছিল সিনিয়র রিকশওয়ালাদের কয়েকজনকে অবসরিকার সাম্মানিক সভ্য করে নেবেন। কিন্তু সিনিয়র সিটিজান হলে রিকশওয়ালারা কলকাতা ছেড়ে যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়! রাজপথে বুড়ো রিকশওয়ালা আপনার নজরেই পড়বে না।

"হ্যাঁ বাবা, বয়স হলে তোমাদের নাগাল পাই না কেন?" নগেন চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন তাঁর প্রিয় সারথীকে।

"দেশে চলে যেতে হয় হুঁজুর।" যেখানে জন্ম সেখানেই মরতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে মানুষ। কলকাতা শহরের কলিজা নেই, বুড়োদের আশ্রয় দেয় না হুঁজুর. বলছে আমাদের রিকশওয়ালা।

"কলকাতার হয়ে আমরা কী বলবো, বাছা! আমরা নিজেরাই এখানে টিকে থাকবার জন্যে ফাইট করছি। বুঝলেন বিশ্বাসমশাই, যৌবনের কুঞ্জবন আর বার্ধক্যের বারাণসী আলাদা জায়গা হবে কেন?"

রিকশ নানা পথ এঁকে বেঁকে আমাদের একটা পুরনো একতলা বাড়ির সামনে হাজির করল। নগেন চৌধুরী রিকশ থেকে নামতে-নামতেই দরাজ গলায় হাঁক ছাড়লেন, "সুদর্শনবাবু বাড়ি আছেন?"

বেরিয়ে এলেন অন্য লোক, এঁর নাম সোমেশ্বর সেন। অনন্দে আত্মহারা হয়ে ভদ্রলোক বললেন, "আরে নগেনবাবু, আসুন আসুন। সুদর্শন বাজারে গিয়েছে! এখনই এসে পড়বে।"

নগেন চৌধুরীর উত্তর "এতো আদর বুড়োদের সহ্য হয় না, সোমেশ্বরবাবু।"

"ওসব বললে তো হবে না! আপনার দয়াতেই আমাদের এই নবজীবন।"

আমার পরিচয় দিলেন নগেন চৌধুরী। সোমেশ্বর তখন নগেনকে বললেন, "আপনার ঋণ আমরা ভুলবো কী করে? আপনার অবসরিকা মিলনোৎসবেই তো সুদর্শনের সঙ্গে আমার দেখা হলো।

"এঁরা দু'জনে ভাই নয়?" আমি জানতে চাই

'দূরমশাই, মায়ের পেটের ভাইরা আজকাল একসঙ্গে থাকে নাকি? পৈতৃক বসতবাটি হলে ভাগাভাগি করে উঁচু পার্টিশন তুলে দেয় যাতে মুখদর্শন করতে না হয়। এঁরা হলেন, নিউ ওয়েভ জেনারেশন, আমাদের অবসরিকার নতুন প্রবাহ। আমাদের উৎসবে ওঁদের প্রথম দেখা হয়ে গেলো, কথায় কথায় বেরিয়ে পড়লো কোন্‌কালে এদের পূর্বপুরুষরা এক গাঁয়ের বাসিন্দা ছিলেন, তারপর ভাগ্যসন্ধানে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। আমরা এঁদের স্পেশাল ভাব দেখে আড়ালে কৌতুক করতাম, নাম দিয়েছিলাম হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধন—শিব্রাম চকোরবত্তির দুই অবিস্মরণীয় চরিত্র স্মরণ করে। তারপর দেখলাম দু'জনের ভালবাসার ব্যাপারটা এমন হাইটে উঠে যাচ্ছে যে নতুন নাম দেওয়া যেতে পারে সেনকো!"

অবাক কাণ্ড! লক্ষ্য করলাম, এবাড়ির দরজার বাইরেও সুদর্শনবাবু সোমেশ্বরবাবুর নামের বদলে লেখা আছে 'সেনকো'।

ব্যাপারটা গল্পের মতন শোনাচ্ছে। ওঁরা দু'জনে শুধু ফ্রেন্ড নন, ওঁদের দুই ওয়াইফও পরস্পরের ফ্রেন্ড। নগেন চৌধুরীর হাল্কা মন্তব্য : "ডেনড্রাইট ফ্রেন্ডও বলতে পারেন। একজনের অসুখ করলে আর এক বান্ধবী গিয়ে রেঁধে দিয়ে আসতেন।"

যথাসময়ে সুদর্শন সেন বাজার থেকে ফিরে এলেন। তিনিও বেজায় খুশি আমাদের দেখে। জানালেন, দুই সেন গৃহিণী বাড়িতে থাকলে আরও খুশি হতেন। কিন্তু ভগ্নীসমা দুই বান্ধবী একসঙ্গে কালীঘাটে কালী সন্দর্শনে

গিয়েছেন। মা কালীর ওপর দু'জনেরই ভয়ঙ্কর নির্ভরতা।

ওঁদের একসময় কিছু কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সোমেশ্বরের বাড়িওয়ালা আচমকা দু'কামরা বাড়ির ভাড়া বাড়িয়ে দিলেন। বাড়তি ভাড়া দিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে সোমেশ্বরের। আর সুদর্শন তাঁর এক কামরা ঘরের জন্য পেলেন বাড়িছাড়ার নোটিশ। অনেকদিন আগে এই বাড়িওয়ালা দয়াপরবশ হয়ে বিপদের সময় সুদর্শনকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এখন বাড়িওয়ালার বড় মেয়ে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে, একটা বাড়তি ঘরের ভীষণ প্রয়োজন। সোমেশ্বরের উকিল বললেন, বাড়িওয়ালার সঙ্গে মামলা চলুক, কয়েকটা বছর হাসতে হাসতে কেটে যাবে। কিন্তু সুদর্শন উপকারীর অপকার করতে রাজি নন।

সেই সময় দুই সেনের উর্বর মস্তিষ্কে বুদ্ধিটা এসে গেলো। এঁরা জয়েন্ট ফ্যামিলির স্বপ্ন দেখলেন নতুন করে, দুইসেন ওঁরা এক বাড়িতে উঠে এসে একসেন হয়ে গেলাম!

কোম্পানি কোম্পানিতে আজকাল যা আকছার হচ্ছে সেই মার্জার হয়ে গেলো মানুষে মানুষে।

ওঁরা কিন্তু দু'জনেই বলছেন, ব্যাপারটায় কোনও কিছু নতুনত্ব নেই। দু'জনেই খুঁজে বার করেছেন সেনহাটির সেন ওঁরা। সেনহাটির সেনরা চিরকালই নিজেদের এক পরিবার মনে করেন।

যৌথ পরিবারে মানুষের দূরত্ব বেড়ে যাবার খবরই পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা আলাদা। পরিস্থিতির চাপে ক্রমশই আপন হচ্ছেন ওঁরা। এখন ওঁদের রান্নাঘর এক, বাজারহাট একসঙ্গে হয়, সংসার চালানোর দায়িত্ব প্রতি সপ্তাহে হাত পাল্টায়। তবে সুদর্শন সেন বাজার করতে ভালবাসেন, আর সোমেশ্বর বাজার যেতে চিরকাল ভীষণ অপছন্দ করেন বলে ও কাজটা সুদর্শনই করেন।

রক্তসম্পর্কহীন অনাত্মীয় দুই পরিবার এমনভাবে যৌথসংসার করছেন যে লোকে বিশ্বাস করবে না দেড় বছর আগে এঁরা পরস্পরকে চিনতেন না।

আমি পরে নগেন চৌধুরীকে বলেছিলাম, "অবসরিকার উদ্যমে এই দেশের প্রথম ঐচ্ছিক জয়েন্ট ফ্যামিলি বা স্বেচ্ছাসংসার।"

নগেন চৌধুরী বললেন, "পরিণত বয়সের প্রথম জয়েন্ট ফ্যামিলি। তবে শোনা যায়, আগেও এমন অভিনব প্রচেষ্টা হয়েছে। বাংলার তিন প্রখ্যাত রাজনীতিক নাকি একসময়ে ত্রিসংসারকে গ্রথিত করে এক যৌথ সংসার স্থাপন করেছিলেন। প্রফুল্ল সেন, অতুল্য ঘোষ এবং সুকুমার দত্ত। শোনা যায়, ওঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও জয়েন্ট ছিল। এ-ব্যাপারটাকে মানুষ তখনও কিন্তু বিস্ময়কর মনে করেনি।"

এ ব্যাপারে আমার অবাক হবার পালা। সেনকো সিরিয়াসলি ভাবছেন, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ফিকস্‌ড ডিপোজিট সব জয়েন্ট করে ফেললে কী হয়? "একসঙ্গে থাকার হাজার সুবিধে মশাই। সিঙ্গল রিকশ ভাড়ায় দুই বান্ধবীর ডবল জার্নি, সিঙ্গল গ্যাস সিলিন্ডারে ডবল রান্না, ডবল লাইনে সিঙ্গল ইলেকট্রিক বিল। সিঙ্গল টিভিতে চারজনের সমান আনন্দ। ভাবা যায় না মশাই। সুবিধের কোনো শেষ নেই।"

নগেন চৌধুরীর মন্তব্য : "ওঁদের চারচাকা, আর স্টেপনি চাকা হলাম এই অধম। অত্যন্ত ন্যাচারাল ব্যাপার। এতে গবেষণার কি আছে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিদিমণির সঙ্গে দেখা না হলে বুঝতে পারছি না।"

সুদর্শন সেন বললেন, "আমরা ওই দাদা-ফাদার মধ্যে যাইনি, আমি ওকে সোমেশ্বর বলি, ও আমাকে সুদর্শন বলেই ডাকে। ছোটবড়র ব্যাপার নেই, সেনকোর ইকুয়ালি পার্টনার আমরা দু'জনে।"

অপারেশন কালীঘাট শেষ করে এক চুবড়ি ফুল ও প্রসাদ নিয়ে দুই সেন রমণীও এবার বাড়ি ফিরে এলেন। ঠিক যেন যৌথ সংসারের দুই জা। এঁরা বললেন, এই প্রথম দুটো আলাদা আলাদা পুজোর পরিবর্তে একটা পুজো দেওয়া হলো মায়ের কাছে। একগোত্তর হওয়ায় নাকি মস্ত সুবিধে হয়ে গিয়েছে। পাণ্ডা, পুরোহিত, সেবায়েত কেউ টুঁ শব্দটি করতে পারছেন না।

অভিনব সেনকোর দুই সেন একত্রে চ্যালেঞ্জ জালালেন, "ভাই ভাই ছাড়া জয়েন্ট ফ্যামিলি করা যাবে না এ-কথা কোথায় লেখা আছে? আর

সেনহাটির সেনরা যখন এক গোত্র তখন এক পরিবারও বটে?"

সুদর্শন বললেন, "একটা বিষয়ে ভীষণ ভুল হয়ে গিয়েছে। প্রথমে সোমেশ্বরের জানা ছিল না যে আমি নন-বদ্যি বিয়ে করেছি। তা এখন সেটা টু লেট! আমার গিন্নি অবশ্য বিয়ের আগেই স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছিলেন বৈদ্যরা বাউনদের সুপিরিয়র। এরফলে বৈদ্যসমাজে আমরা গৃহিণীর জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে।"

আমাদের পরিচিত রিকশওয়ালা আর একটা রাউন্ড মেরে আমাদের জন্যেই যেন রাস্তায় অপেক্ষা করছে।

নগেন চৌধুরী বললেন, "সুদর্শন সেনের ছেলে আছে। ফরেনে থাকে। পুত্রবধূও এখানকার। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে বাবা মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না।"

"টেলিফোন করেনি কেন এখান থেকে?"

"সে আর বলবেন না। পাছে আচমকা টেলিফোন ধরতে হয় বলে, বউমা টেলিফোনে অটোরিপ্লাই লাগিয়ে রেখেছে, যখনই ফোন করবেন, শুনবেন মেসেজ রাখো।"

"মেসেজ রাখলেই হয়।"

"আপনিও যেমন! মেসেজ রাখলেও উত্তর আসবে না কখনও। অনেক দিন নিজের সামর্থ্যের বাইরে ফোন ভাড়া গুনেছেন ওঁরা। এখন ফোন ছেড়ে দিয়েছেন। সুদর্শন এখন নির্দেশ দিয়েছেন, আমি চলে যাবার পরেও আমেরিকায় ছেলেকে খবর দেবেন না। বেঁচে থাকা অবস্থায় তবু অপমান সহ্য হয়, মরার পরে অপমানটা গায়ে লাগবে।"

আর সোমেশ্বর? ওঁর মেয়ে একটা ছিল। ছেলে হতে গিয়ে মেয়েটি মারা যায়। জামাই প্রথমে খুব রাগারাগি করেছিল, কমদামি নার্সিংহোমে দিয়েছেন শ্বশুরমশাই। তারপর অবশ্য একবছর পুরো হবার আগেই আত্মীয়স্বজনের চাপে জামাই আবার বিয়ে করলো। নতুন সংসার হবার পর থেকে আর খোঁজখবর নেই। শুধু মিসেস সেন এখনও মাঝে মাঝে বলেন, বেবি তার গলার হারটা নার্সিংহোমে যাবার আগে আমার কাছে রেখে

গেলো। এখনও হারটা আলমারিতে পড়ে আছে। একবার ভাবেন, বিক্রি করে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে দিয়ে আসবেন টাকাটা। আবার ভাবেন, টাকাটা কোনও বড় ডাক্তারের কাছে দিয়ে আসবেন, একটা সিজারিয়ান বিনা পয়সায় করবার জন্যে। মনটা এখনও ঠিক করে উঠতে পারেন না।

এতো আনন্দের মধ্যে আবার এইসব দুঃখ কেন?

নগেন চৌধুরী বললেন, "সংসারের অঙ্কটা যে ভীষণ গোলমেলে। কেউ বেঁচে থেকেও নেই, আবার কেউ না থেকেও সবসময় রয়েছে।"

আমি বললাম, "নগেনবাবু, দুঃখ আমার একদম ভাল লাগে না কেন বলুন তো?"

"নিজের দুঃখ না পরের দুঃখ, বিশ্বাসমশাই?" মুখের দিকে তাকিয়ে সোজা জিজ্ঞেস করলেন নগেন চৌধুরী।

"কোনও দুঃখই আমার পছন্দ হয় না, শরীরটা কেমন জ্বলতে থাকে।" আমি ব্যাপারটা ঠিক বোঝাতে পারছি না বোধ হয়।

"তা হলে তো সারাক্ষণ জ্বলেপুড়ে মরা ছাড়া কোনও পথ থাকবে না আমাদের। খাস্তগির ও আমার কিন্তু অন্য পলিসি। আমাদের ধারণা, দুঃখ ভীষণ ভিতু! সাহস নিয়ে ওকে একটু তাড়া করলেই দুঃখ পালাবার পথ পায় না।"

"এই দেখুন না আমাদের সেনকো। ভাবুন তো যদি মানুষ বুদ্ধি করে এইরকম অনেক সেনকো তৈরি করে নেয়, তা হলে দুনিয়ার কাউকে ভয় করবার প্রয়োজন থাকবে না।"

বৈপ্লবিক চিন্তাধারা, আপনার ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষিকাকে ব্যাপারটা ভালভাবে বোঝান। বিশ্বসংসারে একটা নতুন কিছু করে যাবো এই মনোবল এদেশের বৃদ্ধদের কেন থাকবে না?

"কী এত ভাবছো?" দুপুরে খাওয়ার পরে উপাসনা আমাকে জিজ্ঞেস করছে।

উপাসনা যা অভিযোগ করতে চায়, তার সদানন্দ স্বামীর মধ্যে ইদানীং কোনও স্থিরতা দেখতে পাচ্ছে না। এই আনন্দ তো, এই বিমর্ষ ভাব। যা উপাসনা আমাকে বলতে চায়, যা খারাপ হবার তা তো হয়ে গিয়েছে, ভি-আর-এস-এর খাঁড়া মাথার ওপর কতদিন ঝুলছিল। তা তো নেমে এসেছে।

উপাসনা, মনের সব উত্থান পতনের বিস্তারিত রিপোর্ট যদি তোমাকে দিতে পারতাম! তুমি বলবে, দিচ্ছ না কেন? বাধা কোথায়? আমি কি অগ্নিসাক্ষী করে তোমার সহধর্মিণী হইনি?

রোজগেরে পুরুষের কতকগুলো বিশেষ যন্ত্রণা আছে যা সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে ধারাবিবরণী দিয়ে লাভ নেই। মেয়েরাও তো তাদের কতকগুলো কষ্টর হিসেব স্বামীকে দেয় না। এই যে গর্ভধারণের যন্ত্রণা, অসহায় উপাসনাকে নার্সিংহোমের ওটিতে যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখে আমি কিছুটা আন্দাজ করেছিলাম, কিন্তু সবটুকু তো জানা হয়নি।

উপাসনা, তুমি কয়েকবার আমাকে বলেছো, আনন্দ ভাগ করলে ডবল হয়, দুঃখ ভাগ করলে অর্ধেক হয়ে যায়। কিন্তু তুমি কি জানো, সব সময় দুঃখ অর্ধেক হয় না, বরং দু'জনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে কষ্ট ডবল করে দেয়। তাই তো মানুষ অনেক সময় অনেক কথা নিজের কাছে রেখে দিতে চায়, দু'জনে জ্বলেপুড়ে মরা থেকে একজনের জ্বলা কি ভাল নয়?

উপাসনা, আমার আবার মুখে কেন আনন্দের রৌদ্র দেখেছ তা এখনই বলে দিতে পারি। রিপন স্ট্রিটের তিন দশকের নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে

আচমকা বিতাড়িত হয়ে আমি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম, ভেবেছিলাম হারিয়ে যাবো। কিন্তু ভবেশ খাস্তগির এবং নগেন চৌধুরীর অবসারিকা আমাকে এমন এক জগতের সন্ধান দিয়েছে যা আমার একেবারে জানা ছিল না।

নগেন চৌধুরী বলেছেন, আমাদের কাজ আছে যথেষ্ট, এবার ঝাঁপিয়ে পড়ুন। তিনি বলেছেন, অবসরিকা থেকে আমাকেও একজন পার্টনার দেবেন। হয়তো আমরা সেনকো হবো না, কিন্তু বন্ধুত্ব থেকে কিছু নিশ্চয় পাবো। নগেন চৌধুরী বলেছেন, দেখুন আমাদের ফাইল, এইটুকু জায়গায় কত মানুষ সায়াহ্নশিখরে পৌঁছে আর নামবার ভরসা পাচ্ছেন না তা হিসেব করলে অবাক হয়ে যাবেন! সত্যিই অবাক কাণ্ড মশাই, মানুষ নির্ভয়ে তরতর করে সময়ের মই ধরে উপরে উঠে যায়, কেউ কেউ ওই পথেই স্বর্গের সন্ধান পেয়ে যায়, তাদের ফিরতে হয় না। আর যারা ভাবে সায়াহ্নের শেষ আলোয় সন্ধ্যার আগেই পুরনো পৃথিবীতে নেমে আসতে হবে তাদের কষ্টের শেষ থাকে না। কারণ ঝাঁপিয়ে পড়ার ট্রেনিং আমাদের কারও নেই!

নগেন চৌধুরীকে সেবার আমি জিজ্ঞেস করেছি, আপনি ভগবৎ-বিশ্বাসের কথা বলছেন? ঈশ্বরই আমাকে পার করবেন, এই বিশ্বাস অনেক মানুষের মধ্যে থাকে।

"আগে ভীষণ ছিল, এখন কমেছে। গড্ অর নো গড্, মানুষ ছাড়তে চাইছে এই পৃথিবীকে, যদিও মুখ ফুটে তা স্বীকার করবে না, বলবে, মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।"

উপাসনার ধারণা কিন্তু খুবই স্বচ্ছ। ও সরল মনে সোজাসুজি তাকায়, অনেক কিছু যে দেখতে পায় যা আমার কাছে ধরা দিতে চায় না। সে বললো, "আগে ক'জন মানুষ আর বৃদ্ধ হবার সুযোগ পেতেন? মরিতে চাহি না বললেই বা কে শুনতো?" অর্থাৎ ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ এ দেশে কমে গিয়েছে এ-কথা উপাসনা মনে করে না।

নগেন চৌধুরী ওর কথা শুনলেন, একটু হাসলেনও, কিন্তু স্পষ্ট কোনও উত্তর দিলেন না। হৃদয়ের অনেকগুলো ক্ষতচিহ্ন এখনও শুকোয়নি বলে

মানুষটা অনেকসময় রহস্যময় হয়ে ওঠেন, কী ভাবছেন বিশেষ করে দুনিয়ার ওপরওয়ালা সম্বন্ধে তা ঠিক বোঝা যায় না।

উপাসনা, তুমি আমার মুখে আলো দেখো এই জন্যে যে নগেন চৌধুরীকে শ্রদ্ধা না করে আমি থাকতে পারি না। ওঁদের অবসরিকা আমাকে কিছু ব্যস্ত রাখছে। অচেনা লোকের বাড়িতে আমি আজকাল কলিং বেল বাজাই। পারিবারিক, মানসিক এবং শারীরিক খোঁজখবর নিলে বয়স্ক মানুষরা কেন এতো খুশি হন তা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। বয়োবৃদ্ধদের কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁ মশাই, বাস ভাড়ায় কি ছাড় হবে বুড়োদের?

কেউ কেউ নিজেরাই উত্তর দেন, এই স্টেট গভরমেন্ট কিসসু করবে না, কেন্দ্রীয় সরকার হলে এতদিন কিছু হয়ে যেতো। কেউ কেউ বলে বসেন, বাসভাড়ায় ছাড় চাই না, বরং হাসপাতালে কিছু কনসেশন দিক। কেউ কেউ দিব্যদর্শীর মতন তিক্ত মন্তব্য করেন, কেওড়াতলা ক্রিমেটোরিয়ামের ইলেকট্রিক বিল দিতেই যাদের নাভিশ্বাস ওঠে তারা আবার হসপিটালে সুবিধে দেবে!

কেউ কেউ সুরসিক। এঁরা মনে করিয়ে দেন, সেই সাতচল্লিশ সাল থেকে একজন ছাড়া সিনিয়র সিটিজানরাই তো রাজ্য শাসন করেছেন—প্রফুল্ল ঘোষ, বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখার্জি, জ্যোতি বসু কেউ তো কচি খোকাটি ছিলেন না। যদি কখনও ছেলে-ছোকরারা প্রকৃত ক্ষমতায় আসে তখন হয়তো বুড়োদের কিছু হবে।

কোনো কোনো বয়োজ্যষ্ঠ ভাবেন, পলিটিকসের সঙ্গে বার্ধক্যের কোনও সম্পর্ক নেই। মোদ্দা কথাটা হল, বুড়োদের সংখ্যা বাড়ছে, ক্লান্ত ধরণী এই বাড়তি আর ভার সহ্য করতে পারছে না।

কেউ কেউ রেগে উঠছেন। মুখের ওপর বলেছেন, "রাখুন আপনার ধরণীবাবুর কথা।"

"ওটা পুংলিঙ্গ না মশাই, স্ত্রী লিঙ্গ। ধরণী হচ্ছেন ধরিত্রী, জননী

বসুন্ধরা!"

রাগী মানুষের উত্তর : "বুড়োদের মুখে মেয়েদের নিন্দে মানায় না, কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, জননী যেন সারাক্ষণই আকারে ইঙ্গিতে বলছেন, যথেষ্ট বুড়ো হয়েছো, একার কেটে পড় বাছা। তোমরা সবকিছু অকুপাই করে বসে থাকলে কমবয়সী ছেলেমেয়েরা এই পৃথিবীর কী ভোগ করবে?"

আর একজন বললেন, "কারও কারও রাগ, বৃদ্ধরা আজকাল নিজেদের বৃদ্ধ মনে করে না, বার্ধক্য একটা গালাগালি। তাই অনেক ভেবেচিন্তে এক্সপার্টরা সিনিয়র সিটিজান কথাটা তৈরি করেছেন। বাংলাতেও কথাটা ঢুকে যাবে, তোমরা দেখে নিও।"

এই ভদ্রলোকও জিজ্ঞেস করলেন, "বিশ্বাসমশাই, ডাক্তারদের আমরা অবসারিকার সক্রিয় সভ্য করছি না কেন?"

সেই পুরনো উত্তর, "ডাক্তারদের অবসর নেই বলে। শুধু চিকিৎসা নয়, স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও নানা প্রশ্ন মানুষের থাকে। আসবেন পার্কে আমাদের বেঞ্চে। আমাদের কয়েকজন বন্ধু তো বহু স্বাস্থ্যসম্পর্কীয় বইটই পড়েন।"

"যেতে তো ইচ্ছে করে ভায়া। কিন্তু এই বয়সে ঘন ঘন কলঘরে যাওয়ার তাগিদ। কলকাতার রাস্তায় পাবলিক কলঘরগুলো তো নরক!"

এক ভদ্রলোক তো সরল মনে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "বিশ্বাসমশাই, মেয়েদের নাকি প্রস্টেট গ্রন্থি নেই? ওরা তা হলে তো খুব লাকি।"

আমি সবিনয়ে বললাম, "তাই তো শুনেছি। তবে ওঁদেরও এমন সব ডেলিকেট অঙ্গ আছে যা পুরুষের নেই, সুতরাং ভোগান্তি কারও কম নয়।"

"ঠিক বলেছেন, বিশ্বাসমশাই। কর্তা অথবা গিন্নি যারই অসুখ করুক খরচ তো একই জায়গা থেকে হবে। আপনি দয়া করে দুটো জিনিস একটু খোঁজখবর করবেন? নরম গদিতে শোওয়া-বসা করলে বড়োদের বাত নাকি বাড়ে?"

আমি চেষ্টা করবো বলে চলে আসছি, তখন ভদ্রলোক আবার ডাকলেন। এবার বললেন, "একটা খারাপ খবর শুনলাম। দাঁড়িয়ে রান্না করলে প্রায়ই

নাকি বাতের প্রকোপ বাড়ে? এতো মহামুশকিলের কথা। কম বয়সে প্রায়ই শুনতাম, উনুনের ধারে বসে রান্না বান্না করলে মেয়েদের শরীর খারাপ হয়, সেই অনুযায়ী বাড়ির উনুনের হাইট বাড়িয়ে দিলাম। এখন শুনছি, বসাও খারাপ, দাঁড়ানোও খারাপ। তা হলে মানুষ কি এবার শুয়ে শুয়ে রাঁধবে?" ভদ্রলোক ভীষণ বিরক্ত, তবে কার ওপরে তাঁর বিরক্তি তা বুঝতে পারলাম না।

উপাসনা আমার সাম্প্রতিক ব্যস্ততা দেখে মজা পাচ্ছে। শুধু নানা ঠিকানায় ভ্রমণ নয়। কারণ বাড়িতে ফিরে নগেন চৌধুরীর নির্দেশ মতন আমাকে কিছু কিছু রিপোর্ট লিখতে হয়। আমি সাম্প্রতিক রিপোর্টে লিখলাম, দেখছি বয়স হলে মানুষ অনেক কিছু জানতে চায়। মানুষ শুধু শুধু কেন বৃদ্ধ হয়, এইটাই অনেকের কাছে একটা বড় প্রশ্ন। কেউ কেউ ছাপানো বই পড়তে বিশেষ আগ্রহী, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিশক্তি নিতান্তই দুর্বল। রেডিও বা টেপরেকর্ডারে সব কথা শুনবেন তাও অনেকের উপায় থাকে না, কারণ অনেকেরই শ্রবণশক্তি কমে এসেছে। ভাঁটার টানে পিছোবার জন্যে বোধ হয়, চল্লিশ বছর থেকেই মানুষের প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন।

এক ভদ্রলোক তো আমাকে বেশ বিপদে ফেলে দিলেন। এই অধম যে নিজেই বৃদ্ধ হয়েছে তা খেয়াল না রেখে বেজায় চটে গেলেন পরলোকগত পূর্বপুরুষদের প্রতি। ডায়াবিটিস, প্রস্টেট, দৃষ্টি বিভ্রম, অনিদ্রা, কোষ্ঠবদ্ধতা কোন বাদ নেই। এইসব শরীরের কথা ভেবেই গুণিজনরা ব্যাধিমন্দির শব্দটি সৃষ্টি করেছিলেন। বিরক্ত ভদ্রলোক বললেন, "শুনুন বিশ্বাসমশাই, আমাদের বেদ বেদান্ত গীতা চণ্ডী এইসব কি একেবারেই বাজে? সেই যজুর্বেদের আমল থেকে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ যে ভক্তিভরে প্রার্থনা করলো, আমি যেন শত বৎসর দেখতে পাই, শত বৎসর শুনতে পাই, শত বৎসর কথা বলতে পারি, শত বৎসর যেন আমার দীনতা না থাকে, তার নিট ফল কী হলো? এক্কেবারে নাথিং। আমি শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষকে চিঠি পাঠিয়েছিলাম, এখনও উত্তর পেলাম না। আমি ভাবছি পোপ এবং সব ধর্মের নেতাদের একই বিষয়ে লিখবো, দেখি একটা

ফয়সালা হয় কিনা।"

সুধাবিন্দু সমাদ্দার এরপর রেগেমেগে ঘরের ভিতর চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অল্পবয়সী লাবণ্যবতী পুত্রবধূ আমার কাছে ক্ষমা চাইলেন। বললেন, কিছু মনে করবেন না। বাড়ি থেকে বেরুতে পারেন না, অথচ আগে হাঁটতে খুব ভালবাসতেন। এখন অল্পে ধৈর্য হারান, রেগে যান, নানা রকম কঠিন প্রশ্ন করেন মানুষকে। কে আবার ওঁর মাথায় ঢুকিয়েছে, পরিবেশ দূষণের ফলেই মানুষের শরীর শিথিল হয়ে যাচ্ছে। আবার কখনও বলছেন, শুধু ধর্মগুরু নন, সব দেশের ডাক্তাররাও সুযোগ পেলে উল্টোপাল্টা কথা বলছেন। ডাক্তারবাবু কখনও বলছেন, পঁচিশ বছর ও সত্তর বছরের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, পঁচাত্তরে মস্তিষ্কের কোষ মাত্র তিন শতাংশ কমে যায়, আবার কখনও বলছেন, চল্লিশ পেরোলেই হুঁশিয়ার হও, শরীরের ফ্রি র‍্যাডিকালগুলো আশ্রয়দাতার বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র শুরু করেছে।

আমি ভাবছিলাম, বার্ধক্য মানেই কি দুঃখ? একলা মানেই কি একাকীত্ব? কিন্তু সমাদ্দারমশায়ের ওখান থেকে বেরিয়ে আর এক ঠিকানায় যেতে গিয়েই ভুল ভাঙলো।

নগেন চৌধুরী বলেছিলেন, হরিসাধন বোসের কাছ থেকে আমাদের ছোট কাগজের ইংরিজি এডিটোরিয়ালটা নিয়ে আসবেন। হরিসাধন সাংবাদিক ছিলেন এক সময়, ইংরিজি ভাষাটা দখলে। বাড়ি যাওয়ার পথেই বাজারের কাছে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। প্রাণোচ্ছল হরিসাধন বসুর সঙ্গে তেকোণা পার্কের বেঞ্চে একবার আমার আলাপ হয়েছিল।

হরিসাধনের ডাক নাম ঢেকো বোস, মাতুলালয়ে জন্মের পরে আনন্দিত দাদু ঢাকি আনিয়ে খবরটা সারাগ্রামে ঘোষণা করেছিলেন। হরিসাধন বলেছিলেন, "বলবেন না মশাই, দাদু বোধহয় আগাম বুঝেছিলেন, খবরের কাগজে মালিকের ঢাক বাজাবার জন্যেই আমার জন্ম! আমি মশাই, লাইফটা হইচই করে কাটাতে চেয়েছিলাম, যাবা আমাকে ভালভাবে জানে তারা ঢেকোটা কেটে হেঁকোডেকো বোস করে দিয়েছে।"

আমাকে টানতে টানতে হরিসাধন তাঁর বাজারসঙ্গী করে নিলেন।

বললেন, "জানেন মশাই, এদিকটায় পটল কেনার উপায় নেই, কবে নীলকররা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন, কিন্তু কলকাতার সব পটল এখনও একরাত নীল রঙে চুবনো অবস্থায় থাকে। চলুন আমার সঙ্গে ওভারব্রিজটার তলায়। ওখানে এখনও কিছু ফ্রেশ পটল পাই গাঁয়ের মেয়েদের কাছে। তা বাজারের বড় বড় দোকানদারদেরও মশাই চক্ষু লজ্জা নেই। পটলের রঙের কথা বলতে গেলাম আর ছোঁড়াটা দাঁত বার করে অ্যাটাক করলো, দাদু-দিদিমা হয়েও তো আপনারা চুল রঙ করছেন আর পটলের একটু রঙিন হাওয়ার সাধ হবে না?"

ওভারব্রিজের তলায় দামটাও ন্যায্য, কিন্তু ওজনটা বোধহয় কম। আমাদের নিজস্ব কাগজে পাঠকদের সাবধান করে দিলে হয়, বাড়িতে ওজন ডবল চেকিং-এর জন্যে অবশ্যই একটা দাঁড়িপাল্লা রাখুন। তা আমার গিন্নির এবিষয়ে ভীষণ আপত্তি। উনি বললেন, তুমি না হয় নিজে বাজার করো, কিন্তু কাজের লোকদের যাঁরা বাজারে পাঠান তাঁরা তো খুব বিপদে পড়ে যাবেন। আমার মেয়ে তাই করে জানি, কিন্তু বিপদের কি আছে? গিন্নি বললেন, বাড়িতে জিনিস ওজন হলে বাড়ির সব লোক কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে।

ঢেকো বোস বললেন, "আমার ছেলে বলছে, বাবা, ওল্ড এজের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। আমি বললাম, আলবাত আছে। আমাদের ইংরিজি কাগজ টিকে থাকলে কাউকে না জিজ্ঞেস করেই আমি কড়া এডিটোরিয়াল লিখে দিতাম। বেশিরভাগ ফ্যামিলিতে দৈনিক বাজারের ভারটা তো সিনিয়র সিটিজানের ওপর পড়ে। সেকাল আর নেই যে বুড়োমানুষ দেখলে ওজন বা দামে ঠকাবে না।"

"এই রকম নৈতিক মান এদেশে কোনও কালে ছিল আপনার মনে হয়, হরিসাধনবাবু?"

"ঢেকো বলুন, দুনিয়াসুদ্ধু লোক ওই নামে ডাকছে, আপনি কেন একযাত্রায় পৃথক ফল নেবেন?"

ঢেকো বোস এবার রাস্তায় বসা দোকানিদের কাছে থেকে ব্রাহ্মী শাক,

হেলেঞ্চে শাক, নিমপাতা এইসব কিনতে শুরু করলেন। পছন্দসই জিনিস বাছতে বাছতে ঢেকো বোস আমাকে বললেন, "এই অঞ্চলের ওনলি মার্কেট যেখানে চিরঞ্জীব বনৌষধি কিছু কিছু সাপ্লাই আসে। আমার নিজস্ব বউকে নিয়ে হয়েছে স্পেশাল সমস্যা—আমাদের চল্লিশতম বিবাহবার্ষিকীতে শ্বশুরবাড়ির শ্যালিকারা ভালবেসে এক সেট শিবকালী উপহার দিয়ে দিদির পৌষমাস এবং আমার সর্বনাশ করে দিয়েছে। আমার গৃহিণীর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত যা কিছু রিসার্চ এবং এক্সপেরিমেন্ট তা এই অভাগা স্বামীটির ওপর। কতবার বউমাকে রিকোয়েস্ট করলাম, শাশুড়িটির হাত থেকে আমায় বাঁচাও। তা আজকালকার মেয়ে, শ্বশুরের কথা শুনে একটু মুখ টিপে হাসলো, কিছু করলো না। ওই যে, আগেকার যুগে শাশুড়ি-বউতে মতবিরোধ রেষারেষি এমনকি হাতাহাতি ছিল, খুব ভাল ছিল। বিবাহিতা বউয়ের একতরফা ভোজন নির্যাতনের হাত থেকে বৃদ্ধরা বাঁচতো।"

থলের মধ্যে কয়েক বান্ডিল থানকুনি পাতা তুললেন ঢেকো বোস—বললেন, "হার হাইনেসের অর্ডার স্লিপে এই আইটেম নেই, কিন্তু দুষ্প্রাপ্য জিনিস রোজ বাজারে আসে না। একবার ঠিক চিনতে না পেরে থানকুনির বদলে ভুল আইটেম বাড়িতে নিয়ে যাওয়ায় ভদ্রমহিলা কি বললো জানেন? এখনই পাতা ফিরিয়ে দিয়ে পয়সা ফিরিয়ে আনো। বুঝুন মশাই, একটা টাকার জন্য তিন পোয়া রাস্তা হাঁটতে হবে স্বামীকে, স্রেফ বেকার বলে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ মশাই, ইটারন্যাল ইন্ডিয়ায় পোয়া দিয়েই রাস্তা মাপা হতো মিটার, কিলোমিটার এসব তো কাল কা যোগী!"

"তা কী হলো শেষ পর্যন্ত?" থানকুনির শেষ পর্ব আমি শুনতে চাই।

ঢেকো বোসের সদর্প উত্তর, "জেনে রাখবেন এবং প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে বলবেন, বুড়ো হলেই আমাদের ব্রেন পাওয়ার উধাও হয়ে যায় না, বৃদ্ধ অবস্থায় মাথায় ঘিলুর ওজন মাত্র সাত শতাংশ কমে যায়। গৃহিণীর সুখ কামনা খেয়ে তাঁর নির্দেশ অবিলম্বে মানবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মুখস্ত করছি গিন্নির দেওয়া

ফর্মুলা। থানকুনির পাতা বৃক্কাকৃতি! বৃক্ক মানে হচ্ছে কিডনি। ওটাও শিবকালী ও গিন্নিব গুঁতোয় ব্রেনে ঢুকে গিয়েছে। তা বাড়ির সামনে পাঁউরুটির দোকানে খুব চেনাশোনা ; ওখানে বললাম, পতিতপাবন দুটো টাকা ধার দাও তো। এবার খুঁজে নিলাম এপাড়ার এক পরিচিত ছাগলকে। ভুল থানকুনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছাগলকে খাইয়ে, বাড়ি ফিরে এসে কড়কড়ে দু'টাকা গিন্নিকে ফেরত দিয়ে বললাম, এবার থানকুনি কিনতে হলে, শিবকালী ভট্‌চাজ্যিকে সঙ্গে নিয়ে তুমি নিজে বাজারে যাবে।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি! বউমা এবং শাশুড়ি দু'জনের একসঙ্গে হাসি—একজনের চাপা হাসি, আর একজনের বাঁধন ছাড়া হাসি। শিবকালীবাবু এতো চিরঞ্জীব গাছগাছড়ার আচার্য হলেও নিজে শতায়ু হতে পারেননি। চলে গিয়েছেন।"

ঢেকো বোস তখন ভেবেছেন, কম বয়সে বিয়ে করে কি ভুলই না করেছি। একটু দেরিতে ম্যারেজ হলে এই চল্লিশ বিবাহবার্ষিকী উৎসব পালনের সুযোগই আসতো না, কেউ আমাদের শিবকালী সেট দেবার সুযোগ পেতো না এবং এই চিরঞ্জীব বনৌষধির ধাক্কায় একজন নির্দোষ মানুষকে জাঁদরেল গৃহিণীর হাতে নিগৃহীত হতে হতো না।

ঢেকো বোস আরও বললেন, "অনেকের ধারণা শাশুড়ি-বউ-এর এই সম্পর্কের জন্যে আমি গোপনে তারাপীঠে গিয়ে তুক করেছি। মশাই, তারাপীঠ আমি যাইনি। তবে ধর্মতলার এক পণ্ডিতের কাছে গিয়েছিলাম কাগজের মালিককে কব্জার জন্যে এবং বশীকরণ একস্ট্রা স্ট্রং কবচও ধারণ করেছিলাম। কিন্তু গৃহিণীর এই তারাপীঠ গুজবটি আমার মতন নিরীহ স্বামীর পক্ষে বড়ই বিপজ্জনক।"

হরিসাধন ওরফে ঢেকো আমাকে সঙ্গে নিয়েই আরও কয়েকটা সব্জি কিনে বাজারের থলিতে পুরে ফেললেন। বললেন, বৃদ্ধদের পকেটে টাকা থাকলে প্রাত্যহিক বাজার করার মতন ভাল এক্সারসাইজ যে নেই তা হরিসাধনবাবু আমাদের কাগজে রসিয়ে লিখে দেবেন।

তারপরই ঢেকো বোস মতপরিবর্তন করলেন। বললেন, "আমার ওয়াইফ ওই লেখায় রাজি হবেন না। বৃদ্ধ বয়সে মনের সুখে বাজার করার সঙ্গতি ক'জনের আর রয়েছে, উনি বলে বসবেন। ওঁর শখ আবার পিকুলিয়র। কোনও আত্মীয়র বাড়িতে যেতে হলে, এক বস্তা কাঁচা বাজার করিয়ে বিনাপয়সার ভারবাহক আমাকে দিয়ে বওয়াবেন। আঁশ নিরামিষ বাজার আবার একসঙ্গে করা যাবে না। ময়রার দোকানের মিষ্টির বাক্সেও ওঁর একটু বিশ্বাস নেই।"

বয়সের তুলনায় ঢেকো বোস কিন্তু বেশ দ্রুত হাঁটতে পাবেন। ওঁর বক্তব্য, বয়সের সঙ্গে স্পিডের কোনও সম্পর্ক নেই, দেখেননি আপনারা জ্যোতি বোসকে হাঁটতে—ঠিক যেন বম্বে মেল চলেছে! ঢেকো বোস বললেন, "আমার বউমাটি ইস্কুলে পড়ান, ঘণ্টা পড়ার পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে ঢুকতে হয়, সুতরাং সংসার সমরাঙ্গণে শ্রদ্ধেয়া শাশুড়িদেবীই একমাত্র ভরসা। এই আজকালকার লেখাপড়া জানা কর্মরতা বাঙালি মেয়েরা ভীষণ বুদ্ধিমতী, কিছুতেই শাশুড়িকে চটাবে না।"

ঢেকো বোসের ধারণা : "এ-বিষয়েও আমাদের কাগজে কিছু মন্তব্য করা চলে। কিছু আধুনিকা বউমাদের উচিত মাঝেমাঝে শ্বশুরের দিকটাও ভেবে দেখা, প্রয়োজনে তাঁকেও একটু সাপোর্ট করা। আপনি কী বলেন? বোটানির এম-এস-সি. শিক্ষিতা বউমা, আমাদের কাগজের লেখালিখিগুলো ওঁদের নজরে পড়ে যেতে পারে।"

"কেরিয়ারের কথা উঠলো। হবিসাধন বোস এবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। কর্মজীবনে মস্ত বড় ধাক্কা এসেছিল, সহকর্মীদের অনেকে অনাহারে অর্থাভাবে তলিয়ে গিয়েছে, আমারও সেই অবস্থা হতে পারতো। বিশ্বাস করবেন মশাই, কাগজেব অফিস থেকে এখনও সঞ্চয়ের এক আধলা উদ্ধার করতে পারিনি। তবু যে এইভাবে নিত্য বাজারহাট কবে মানসম্মান নিয়ে বেঁচে আছি তার কারণ ছেলেটা চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ছেলে বউমাটিও সিলেকশন করেছে ভাল, ওই নির্বাচনে আমাদের কোনো হাত ছিল না। অফিসেও বেশ উন্নতি করেছে। ছেলে এখন বলে, বাবা, তুমি

তালালাগানো অফিসের পাওনাগণ্ডা নিয়ে আজেবাজে মাথা ঘামানো ছেড়ে দাও। কিন্তু অতগুলো হকের টাকা, চিন্তাটা কী করে আজেবাজে হলো? আপনি বলুন। ভগবান আমাকে নয় একটা গুণের ছেলে দিয়েছেন তাই অর্থের অভাবে অপমানিত হতে হয় না, কিন্তু আমার প্রাক্তন সহকর্মীদের কি অবস্থা বলুন তো? এতোগুলো গরিবের টাকা সারাজীবনের সঞ্চয় জোচ্চোর মালিক মারল, এতে ওদের ভাল হবে? ভগবান এদের ক্ষমা করবেন মনে হয় আপনার?"

ঢেকো বোস তাঁর বাড়িতে এনে আদর করে বসিয়ে আমাকে পাতিলেবু দেওয়া মিষ্টি জল খাওয়ালেন। বললেন, "পাতিলেবুটা বুড়ো বয়সে বেগুলার খেয়ে যাবেন, বিশ্বাস মশাই। বেশি দামও নয়। পণ্ডিত শিবকালীও খুব রেকমেন্ড করতেন।"

আমি ভাবছি, যাই হোক শেষ পর্যন্ত একটা সুখী পরিবারের সুখী বৃদ্ধকে দেখলাম।

কিন্তু ঢেকো বোস হঠাৎ বললেন, "আমাদের কারও মনে কিন্তু সুখ নেই। বহু চেষ্টায় নাতিটাকে নার্সারি স্কুলে ঢোকানো হয়েছে। কিন্তু বড় ইস্কুলের কে.জি.ক্লাসে নাতি কী করে যে ঢুকবে! ওর ঠাকুমা তো বিড়লা মন্দির, কালীমন্দির, শীতলা মন্দির, পীরের দরগা সব জায়গায় মানত করে বেড়াচ্ছে। আমি বলেছিলাম, "মন্দিরে মানত করে কী ফল পাবে? বড় বড় লোকদের বরং পাকড়াও করো। গিন্নির সঙ্গে মশাই ঝগড়া হয়ে গেলো, বলে কিনা, 'তুমি না কাগজে কাজ করতে!' আমি তো স্বীকার করছি, সবাই জেনে গিয়েছে আমার কাগজ বন্ধ, কেন এখনকার বড়লোকরা আমাকে টাইম দেবেন? বউ, মশাই, সন্তুষ্ট নয়, বলে যখন ক্ষমতা ছিল তখন অকারণে মানুষের পিছনে হুল ফুটিয়েছো, এখন ভোগো, আমার নাতি যদি ভাল ইস্কুলে না ঢোকে তা হলে হুলস্থুল হবে এটা বলে রাখলাম। আসলে উনি চান, বাজারের থলে নামিয়ে দিয়েই আমি যেন নাতির নতুন ইস্কুলের জন্যে তদ্বিরে বেরই—দুনিয়ার সব লোক যেন আমার স্ত্রীর স্বামীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে বৈঠকখানার দরজা খুলে বসে আছে।"

খবর পেয়ে মিসেস বোস রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন, কিন্তু স্বামীর সমালোচনা ছাড়লেন না। আমার সামনেই ঝগড়া করলেন "এতো করে বললাম, লেখো না বুড়ো মানুষদের নাতিদের ইস্কুলে ঢোকার জন্যে স্পেশাল কোটা হোক। কমবয়সী নাতিদের কথা ভেবে ভেবে কত বুড়ো মানুষের শরীর খারাপ হচ্ছে বলুন তো।"

আমি এসব বিষয়ে ভগবানের ওপর নির্ভরতায় বিশ্বাস করি। "আপনি ভাবছেন কেন? যিনি পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তিনিই ইস্কুল খুঁজে দেবেন।"

ঢেকো বোসের গৃহিণী বললেন, "এই দেখুন, আপনি কেমন মিষ্টি করে কথাটা বললেন। বুকে একটু আশা দিলেন। আর আপনাদের মেম্বারের কাণ্ড জানেন?"

ঢেকো বোস সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, "তুমিও মেম্বার। নিয়ম অনুযায়ী স্বামী সভ্য হলেই স্ত্রী অটোমেটিক অবসরিকা।"

মিসেস বোস কিন্তু স্বামীর কথা কানে তুললেন না। বললেন, "কোথায় মন দিয়ে নাতিকে ভর্তির চেষ্টা করবে, দুটো মানুষের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে তাঁদের মন জয় করবে, তা না আমার দুধের নাতিকে সেদিন বলছে, তুই মেয়ে হলি না কেন? ছি ছি, আমার বউমা শুনলে কী ভাববে বলুন তো। আমাদের বংশের একটি মাত্র বাতি! তাকে মেয়ে করে দেওয়া।"

ঢেকো বোসের সংযোজন: "আঃ, সুহাসিনী। তুমি তিলকে তাল করছ। তোমার বাবা বেঁচে থাকলে এখনই গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম, কী ভেবে তিনি মেয়ের নাম সুহাসিনী রেখেছিলেন।"

"বেশ করেছিলেন, যা ইচ্ছে তাই করেছিলেন, মেয়ের নাম রেখার জন্যে তোমাদের পারমিশন নিতে ছুটবেন নাকি?"

ঢেকো বোস দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, "তুমি তিল কে তাল করছো স্রেফ আমাকে হেনস্থা করার জন্যে। আমি তখন কেবল ভেবেছি, নাতিটা মেয়ে হলে বউমার নিজের ইস্কুলেই টুক করে বিনা হাঙ্গামায় ঢুকে পড়তে পারতো।"

সুহাসিনী দেবীও ছাড়বার পাত্রী নন। বললেন, "তোমার মন যদি অতো

শাদা হতো তা হলে নিজের বউমাকেই বলতে পারতে ছেলে ইস্কুলে কাজ নাও, আজকাল ছেলেদের ইস্কুলেও দিদিমণি মাস্টাব নেওয়া হচ্ছে।"

বোস পরিবারের ঘরের ঘড়িটা এবার প্রচণ্ড জোরে বাজতে শুরু করলো। ঝটপট টুলের ওপরে উঠে তাক থেকে ঘড়ি নামিয়ে এলার্ম বাজনা বন্ধ করলেন হরিসাধন বসু। গৃহিণী হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, "ওরকম দড়াম করে উঠো না! শিবদাঁড়ার হাড়গুলোতে যদি একবার খোঁচা লাগে।"

ঢেকো বোস জানালেন, "টঙে ঘড়ি রাখা ছাড়া উপায় নেই। নাতিটা দুষ্টুমি করে অ্যালার্মের কাঁটাটা সরিয়ে দিয়ে একবার যা বিপদে ফেলেছিল। উনি নাতির জন্য মানত করতে ঠনঠনে কালীবাড়ি পুজো দিতে গিয়েছেন, অ্যালার্ম বাজেনি বলে সময় সম্পর্কে আমার খেয়াল নেই, ইস্কুলে যাওয়া হয়নি। আর বাড়ি থেকে কেউ নিতে আসছে না বলে নাতির ইস্কুল থেকে বউমাকে সোজা ফোন করে দিয়েছে ওঁর ইস্কুলে। ফোন পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে বউমা ট্যাক্সি নিয়ে, ছেলেকে ইস্কুল থেকে তুলে, বাড়ি এসে দেখেন আমি একমনে অবসারিকার এডিটোরিয়াল লিখছি।"

সুহাসিনী আরও সুযোগ পেয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস কবলেন, "এই সব আপনাভোলা লোকের বিয়ে করা উচিত? আপনিই বলুন। এদের উচিত ছিল, মাথা কামিয়ে, শাদা জামাকাপড় পরে, প্রথমে মঠের ব্রহ্মচারী হওয়া, পরে ধৈর্যর পরীক্ষা দিয়ে, গেরুয়া পরে সাধু-সন্ন্যাসী হওয়া।"

হরিসাধন বোস আর যুদ্ধ করলেন না, করতে সাহস পেলেন না। এ সংসারে কে আর বউ-এর সঙ্গে তর্কে পেরে উঠেছে? নাতিকে নার্সারি ইস্কুল থেকে আনবার জন্যে ঢেকো বোস এবার বেরিয়ে পড়লেন। চুপিচুপি আমাদের বললেন, "শাস্ত্রের উপদেশ, মামলায় জেতা ভাল, তর্কে হারা ভাল। আপনি নগেন চৌধুরী মশাইকে বলবেন, একটা কিছু সম্পাদকীয় এই শনিবার লিখে দেবো। নাতি যা দুষ্টু বাড়ি ফিরে আমাদের দু'জনকেই নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরোবে। শনিবার বউমা ইস্কুল যাবেন না, ওই দিন বসবো অবসরিকার জন্যে কিছু লিখতে।"

আমরা দু'জনে আবার রাস্তায় নেমে পড়েছি। অফুরন্ত প্রাণশক্তির

মালিক আমাদের হরিসাধনবাবু। ওর মধ্যে পরিতৃপ্তি রয়েছে, আবার কোথাও যেন অতৃপ্তি।

হরিসাধনবাবু বললেন, "যৌবনকালে ভাবতাম ঝাড়া হাত-পা হয়ে বুড়ো বয়সে একবার পৌঁছতে পারলেই সব সমস্যা থেকে মুক্তি। এখন দেখছি সংসারী মানুষের চিন্তার কোনও শেষ নেই। একটা পরীক্ষা পাশ করে নাতিটা কোনোক্রমে নার্সারিতে ভর্তি হয়েছে। বাঙালি হয়ে যখন জন্মেছে তখন সমস্তজীবন ধরে শত শত অ্যাডমিশন টেস্ট, ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষা দিতে দিতে জ্যান্ত বাঙালিগুলো যে মমি হয়ে যাচ্ছে সেদিকে বিশ্বসংসারের খেয়াল নেই। ইস্কুলে ঢোকার জন্যে আমাকে কোনোদিন কাঠখড় পুড়োতে হয়নি, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে আড্ডা মেরে, সিনেমা দেখে, ফাঁকি দিয়ে রিপন কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেছি, আচমকা একটা চাকরিও পেয়ে গিয়েছি, জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনেও কোনও কম্পিটিশন ছিল না, কারও সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়নি। বুড়ো হয়ে এখন নাতিটাকে দেখছি আব ভীষণ ভয় পাচ্ছি। আমি ভাবছি, এবার লিখব, বুড়ো হবার জন্যেও কেন অ্যাডমিশন টেস্ট হবে না? বয়স হলেই সবাই অটোমেটিক বুড়ো হতে পারে না।"

"বুড়োমির পরীক্ষা দিয়ে যাঁরা ফেল করতেন, তাঁদের কী অবস্থা হতো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম ঢেকো বোসকে।

ও বিষয়ে কোনো দুশ্চিন্তা নেই হরিসাধন বোসের। "সে যাঁরা ফেল করতেন তাঁরা বুঝতেন। পরীক্ষায় পাশ করা সার্টিফায়েড সিনিয়র সিটিজানের সংখ্যা হাতে গোনা যেতো।"

পাওনা কমানো ছাড়া কে।
। খবরের কাগজটা বন্ধ কে
াগজটা পড়ে আনন্দ পায়।।
মন করে দেবো? আমাকে
াঠনের জন্য একখানা দলী

বাড়িতে দুপুরের হাজিরা দিতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছে। উপাসনা খাবারের থালা নিয়ে আমার জন্যে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল। মুখ খুলে কিছু বলে আমাকে সে আক্রমণ করছে না। কিন্তু শরীরের ভাষা নিঃশব্দে বলছে, "যথা ইচ্ছে ঘোরো, কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ঘোরাঘুরি করো।"

বাড়িতে স্ত্রীব কাছে দুপুরের এই হাজিরা দেওয়াটা এখন কেমন অস্বস্তিকর মনে হয়। এইভাবে কয়েকশো হাজিরা দিলে তবে একটা বছর পার হবে। অথচ দ্বিপ্রহরের এই সাংসারিক যন্ত্রণার কথা না ভেবেই জীবনের এতগুলো বছর তো কেটে গিয়েছে। তা হলে বোঝা যাচ্ছে, মাইনে ছাড়াও মানুষ কর্মক্ষেত্রে আরও অনেক কিছু পায়। উদ্ধত মনিবের কাছে লজ্জাহীন পরাধীনতা অথচ একই সঙ্গে অন্য এক স্বাধীনতার স্বাদ। সারাদিনের আচার বিচার থেকে বাড়ির বউটাকে মুক্তি দিচ্ছে তোমার চাকরি। ভরদুপুরে একজন মানুষ তোমারই অপেক্ষায় অভুক্ত হয়ে বসে আছে একথা ভাবতে হচ্ছে না।

ওকে বললাম, "আজ আমি অনেক নতুন অভিজ্ঞতা পেয়েছি, উপাসনা। হরিসাধন বোস ও তাঁর সোহাগিনী স্ত্রী সুহাসিনী সারাক্ষণ ঝগড়ার মধ্যে প্রেম করছেন। রসশাস্ত্রে এই প্রেমের নমুনা তেমন বেশি নেই, কিন্তু যারা শোনে তারা এর স্বাদ পায়, খুব উপভোগ করে।"

হরিসাধনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি আর এক জায়গায় গিয়েছিলাম। সেই জন্যেই দেরি হলো।

কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে উপাসনাকে টানতে কেমন জানি না অনিচ্ছা

হচ্ছে। জীবনসংগ্রাম চল[illegible] সাধনবাবু। ওর মধ্যে প[illegible]পাসনার চোখের সামনে ক্রমশ পিছিয়ে আসছি, [illegible] লাগে না।

বহুদিন আগেকার ব[illegible]ন, "যৌবনকালে ভাবতা[illegible]াসনা একবার বলেছিল তাঁর মায়ের দুশ্চিন্তা, [illegible]পৌঁছতে পারলেই সব সমস্[illegible] কাজ ভাল করে না। উপাসনা ব্যাপারটা প্রবল [illegible] চিন্তার কোনও শেষ নে[illegible] বাবাকে বলেছিল, তুমি যখন বিয়ে করেছিলে তখন তোমার চাকরিও তো তেমন ভাল ছিল না। তারপর তুমি দ্রুত উন্নতি করেছো।

বলরাম যে যথাসময়ে কর্মজীবনে কিছু করবে এই বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা ছিল উপাসনার মধ্যে। আমার ভাগ্য খারাপ, কিছু হয়নি, গুড্‌হাউস কোম্পানির গড্ডলিকা প্রবাহে দীপ্তিহীন জীবনটা কেটে গিয়েছে। শেষ পর্বটা অবশ্য আরও দুঃখের এবং আর[illegible] অপমানের হলো।

উপাসনা অবশ্য একবারও নিজের মুখে আমার শ্লথগতি কর্মজীবনের কোনও উল্লেখ করেনি। তবে এই অনুল্লেখটা সে যদি হিসেব করে আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ঘটে থাকে? আমার অস্বস্তির শেষ হচ্ছে না। কর্মজীবন সম্পর্কে সহধর্মিণীর সমর্থন ও সমালোচনা দুটো থেকেই আমি বঞ্চিত হয়েছি। কিন্তু উপাসনা তো জানে, কর্মজীবনে সফল হবার জন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমি কিছুতেই এগোতে পারিনি। স্ত্রীর কাছে আমি কখনও আমার ব্যর্থতার ব্যাখ্যা করিনি—নাচতে না জানলে মানুষ উঠোনের দোষ দেয়—কথাটা আমি কোনোদিনই ভুলিনি।

ঢেকো বোসের সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়ার পর মনে হয়েছিল, নিজের সম্বন্ধে অনেকদিন ভাবা হয়নি।

রিপন স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে আসবার সময় শেষ যা মাইনে পেয়েছিলাম তাতে এখনও চলছে, কিন্তু সামনের মাসে মাইনে বলে তো কিছুই নেই। অথচ বাড়িভাড়া থেকে আরম্ভ করে খবরের কাগজ, ইলেকট্রিক বিল সব ঠিক সময়ে হাজির হবে। আমাদের এই পাড়ায় ধার প্রথা অচল হয়ে পড়ছে।

সুতরাং উপার্জন কমলে পাওনা কমানো ছাড়া কোনো উপায় নেই।

আমি ভাবছি সকালের খবরের কাগজটা বন্ধ করে দেবো। কিন্তু আমি ছাড়াও উপাসনা বাঙলা কাগজটা পড়ে আনন্দ পায়। অবসর জীবনের প্রথম ধাক্কাটা আমি ওকেই কেমন করে দেবো? আমাদের এখানে চৌরাস্তার মোড়ে জনগণের নিত্য পঠনের জন্য একখানা দলীয় সংবাদপত্র নিয়মিত বোর্ডে সেঁটে দেওয়া হয়, এপাড়ার অনেকেই খরচ কমানোর জন্য ওই কাগজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন, আমিও পড়ি, কিন্তু কোনও মহিলাকে ওই স্ট্যান্ডে আজও দেখিনি।

আমি এখন পাঁচমাথা পেরিয়ে হাঁটছি হাজরা রোড ধরে পণ্ডিতিয়ার দিকে। ওইখানেই পরপর দু'দিন মিস্টার বিনয় সুখানির সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতের চেষ্টা করেছি, কিন্তু সফল হয়নি।

ভদ্রলোকের নিজের ব্যবসায় মন নেই, কিন্তু অন্যের সংগঠিত ব্যবসায় অকারণে কাঠি দেবার জন্যে বিভিন্ন কোম্পানির অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং-এ যেতে খুব ভালবাসেন। আমাকে দেখে উপাসনার দাদা সম্পর্কের সুরেন ভটচাজ্যি মশাই দু'দিনই খুব লজ্জা পেয়েছেন, মিস্টার সুখানির সঙ্গে কেন যে আমার দেখা হচ্ছে না তা তিনি বুঝতে পারছেন না। সুরেন ভট্টাচার্য বলেছেন, আমাদের গেস্টকিনে কিন্তু এমন ছিল না, কোম্পানি হয়তো খারাপ চলছে, কিন্তু বিজনেস অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারে ভীষণ সায়েবি ব্যাপার।

অবশেষে বিনয় সুখানিকে আজ পাকড়াও করা গেলো। সুখানি পানপরাগ চিবোতে চিবোতে বললেন, "এই দেখুন না, আজকে মিস্টার ওবেরয় দেরি করিয়ে দিলেন। জানেন তো ওবেরয়কে? ওবেরয় গ্র্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা রায় বাহাদুর ওয়েরয়ের বড় ছেলে। পৃথিবীময় হোটেল করে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া হোটেলস-এর হেড অপিস এই কলকাতায়। মিস্টার বিড়লা, মিস্টার ডালমিয়া, মিস্টার পল, মিস্টার সিংহানিয়া এরা কেউই আমাকে ছাড়তে চান না, ওঁদের কোম্পানি সম্বন্ধে হাজার রকম

অ্যাডভাইজ চান।" মিস্টার সুখানি অনর্গল বলে চলেছেন, "ফিলিপ্‌সকে আমি তখনই বলেছিলাম, কলকাতা থেকে হেড আপিস সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তোমরা ভুল করেছ, এখন ওঁদের চেয়ারম্যান হাড়ে হাড়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন।"

বিনয় সুখানিয়াকে আমি বললাম, "মিস্টার সারকিট সেনগুপ্ত আমাব ফ্রেন্ড। আমার সম্বন্ধে আপনাকে সারকিট কি কিছু বলেছিল?"

বিনয় সুখানি বললেন, "সারকিটের সঙ্গে ক'দিন আগেই তো ফুলবাড়িটি কোম্পানির এজিএমে দেখা হলো। কথা হচ্ছিল গুড্‌হাউস ইন্ডিয়া নিয়ে, ছিল সোনার কোম্পানি, এখন ইট হয়ে গেলো। আমার নিজের অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না কোম্পানিগুলো জাহান্নামে গেলে। আমার মশাই, কোনো কোম্পানিতে আমার একখানার বেশি শেয়ার নেই, তাও চারজনের জয়েন্ট নাম লিখিয়ে দিয়েছি, আমি, আমার ওয়াইফ, আমার মেয়ে এবং ছেলের নামে। এতে খুব সুবিধে। দশ টাকা ইনভেস্ট করে বছরে একখানা রিপোর্ট বই, এজিএমে চার প্যাকেট খাবার, চারটে গিফট্ এবং বছরে একবার ফ্যাক্টরি ভিজিটের নাম করে চারজনের বিনাখরচে পিকনিক। আমাব ছেলে আজকাল আসতে চায় না, বলে আমরা নাকি নিজেদের মানসম্মান হারাচ্ছি, কিন্তু তুই এব্যাপারে বলবার কে? বড় বড় কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট তো হাঙ্গামা এড়াবার জন্যে আমাদের ওয়েলকাম করছে। আমি দেখেছি, যে কোম্পানির অবস্থা যত খারাপ সে কোম্পানির মালিকদের ব্যবহার তত ভাল!"

সারকিট সত্যিই আমার কথা সুখানিকে বলেছে। তিনি বললেন, "খুব প্রশংসা করেছে আপনার কাজের। বলেছে, সুযোগ পাওয়া মাত্রই এই সব লোককে তুলে নিতে হয়। বম্বে ম্যাড্রাস হলে রিটায়ার করে বাড়ি ফিরে যাবার সময় পেত না, রাস্তা থেকেই হেড হান্টাররা তুলে নিত।"

এবার সুখানি মশাই সবিনয়ে বললেন, "আমার বিজনেস ছোট। কিন্তু মিস্টার বিড়লা, মিস্টার রুংতা এঁরা সবাই বলছেন, আপনি বিজনেস বাড়ান, আমরা রয়েছি কেন? তা আমি মশাই, কারও কোনও উপকার নিতে চাই

না। আমি নিজে যখন হাত পাতবো তখন বড় রকম পাত মারবো। আমার বাপ পিতামহ এপাড়ায় একখানা মস্ত বাড়ি রেখে গিয়েছেন। মালিক নন, ভাড়াটে হিসেবে মূল্যবান অ্যাসেট। মান্থলি নিরানব্বুই টাকা ভাড়ায় সায়েবপাড়ায় তিনতলা বাড়ি, সুখ কোথায় পাবেন? ওয়ান মিসেস লাহা অরিজিন্যাল মালিক, নাইনটিন থার্টি নাইনে আমার বাবা ওঁর স্বামীর কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছিলেন। মধ্যেখানে একবার বাবাকে তোলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। বুঝতেই পারছেন, এই বাড়ি ইজ অ্যাজ গুড ইফ নট বেটার দ্যান নিজের বাড়ি। এই বাড়ি ভাগে ভাগে সাবলেট করে কয়েক লাখ টাকা সেলামি কাঁচা টাকায় ইনকাম করেছি, তাছাড়া আমি দোকান, আপিস, ক্যান্টিন থেকে ভাড়া হিসেবে আমি থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড রুপিজ পাই। ভগবানের দয়ায় আরও কিছু ব্যবসা আছে—প্রাইভেট ব্যাঙ্কিং, ব্রোকারি, শেয়ার স্পেকুলেসন। সব মিলিয়ে সুখানিদের চলে যায়—দু'খানা গাড়ি, বারো-তেরো জন নোকর, ফিকস্‌ড্‌ ডিপোজিট, আড়াইশো কোম্পানিতে একখানা করে শেয়ার এসব তো রয়েছে।"

আমার নিবেদন : "সুকৃৎবাবু আমাকে বলেছেন, আপনার কোম্পানির বিউটি হল আপনি সিনিয়র রিটায়ার্ড লোকদের নিয়োগ করেন।"

এবার আমার জীবনবৃত্তান্ত জানতে চাইছেন মিস্টার বিনয় সুখানি। আমিও প্রস্তুত হয়ে এসেছি। একখানা শাদা কাগজে অতি সাবধানে নিজের বায়োডাটা রচনা করে ফেলেছি।

সুকৃৎবাবু বলেছিলেন, ও দেশে এই কাগজটিকে বলে সিভিটি—কারিকিউলাম ভাইটি। বিবাহ সম্বন্ধের সময়ে আমাদের যেমন ছক। এমনভাবে লিখবেন যেন নিয়োগকর্তার মনে হয় এই লোক ছাড়া আমার কোম্পানি এতদিন চলেছে কী করে? বায়োডাটার প্রথম পর্বে থাকে জন্মকাল, জন্মস্থান, পিতৃদেব সংক্রান্ত বিবরণ। তারপর নানা পরিচ্ছেদে জন্মপর্বের পর জীবনযুদ্ধের থেকে নানা বিবরণ। নিজের কীর্তন নিজে গাওয়া ও লজ্জার মাথা খেয়ে নিজের সবরকম প্রশস্তি ছাড়া চাকরির ব্যাপারে অন্য কোনো পথ নেই। সুকৃৎবাবু বলেছিলেন, চাকরিতে লজ্জা

পেয়েছেন তো মরেছেন। আমার বায়োডাটার প্রথম খসড়াটি সুকৃৎবাবুই এবার সযত্নে দেখে দিয়েছেন।

এসব পরিচয়পত্র সংশোধনে সুকৃৎবাবু সুদক্ষ। বলেছিলেন, "চক্ষুলজ্জা থাকলে বায়োডাটা লেখা যায় না মশায়।"

আমার বিপদ, সামান্য কর্মজীবনে কীই বা করেছি? যাঁরা চাকরি দিয়েছিলেন তাঁরাই বা কী করতে দিয়েছেন?

সুকৃৎবাবু আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। "আপনি কিছু আলবার্ট আইনস্টাইনের সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইজার পোস্টের জন্যে আবেদন করছেন না। যারা আপনাকে নেবে তারা নিজেরাই যখন দরের লোক নয় তখন আপনার মাথাব্যথা কেন?

সুকৃৎবাবু বুঝছেন বায়োডাটা লেখায় আমি অনভ্যস্ত। নিজেকে নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রচার করবার মানসিকতা অনেক সময় মধ্যবিত্ত বাঙালিদের থাকে না। উনি কায়দা করে কয়েকটা আইটেম ঢুকিয়ে দিলেন। বললেন, "সেই যে বহুবছর আগে গুড্‌হাউসের রিপন স্ট্রিট অফিসে ঢুকেছিলেন তারপর আর কখনও কাজের বাজারে ক্যান্ডিডেট হননি?"

"আমাদের সময় একটা চাকরি থাকতে আরেকটা চাকরি খোঁজার রেওয়াজ ছিল না। চাকরিটা ছিল বিয়ের মতন—একেবারেই যথেষ্ট। লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ খোঁজাটা ছিল দাম্পত্য ব্যভিচারের মতন।"

"আরে মশাই, এখন তো বম্বে দিল্লিতে কাজের লোকেরা, সবসময় পকেটে ভিজিটিং কার্ড এবং ব্যাগে সিভিটি নিয়ে ঘোরে—প্লেনে হোটেলে ক্লাবে অফিসে কোথায় হেড হান্টারের সঙ্গে যোগাযোগ হবে ঠিক নেই, দেখা হওয়া মাত্রই হাতে ওঁর কাগজ গুঁজে দাও।"

এবার ম্যারাইটাল স্ট্যাটাস সম্পর্কে আলোচনা! "সিভিটিতে এটা দেননি কেন?" জিজ্ঞেস করেছিলেন সারকিট সেনগুপ্ত।

ওই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমার তেমন জানা নেই। সারকিট সেনগুপ্ত হেসে বললেন, "অনেকদিন আমিও এই সাবজেক্টে কিছু জানতাম না। ভুল করে উচ্চারণ করতাম 'মার্শাল' স্ট্যাটাস। আন্দাজ করেছিলাম, মালিক

জানতে চান, মিলিটারিতে যুদ্ধকালীন কোনও অভিজ্ঞতা আছে কি না। তারপর বুঝলাম, বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর, অর্থাৎ কর্তাদের জানা প্রয়োজন সম্ভাব্য কর্মচারিটি চিরকুমার/বিবাহিত/বিবাহ বিচ্ছিন্ন কোনটা।"

আমার উত্তর লিখে দিলাম—বিবাহিত, নো চাইল্ড।

এবার লাস্ট আইটেম, মাইনের প্রত্যাশা। বলেছিলাম, "সুকৃৎবাবু, আমার কোনও প্রত্যাশা নেই। মালিক যা হাতে তুলে দেন এই বয়সে, এই পরিস্থিতিতে।"

আমি লিখতে চাই, "আপনি যা দিতে চান, অ্যাজ ইউ প্লিজ।"

অভিজ্ঞ সারকিট সেনগুপ্ত বললেন, "পাগল হয়েছেন মশাই। এর নাম কলকাতা শহর, এখানে মাথা নিচু করলেই, মালিকরা মাথা কামিয়ে দেবে। পয়সাওয়ালা লোকরা দুটি হাতে দুটি নাপিতের খুর নিয়ে বসে আছে।"

আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। সুকৃৎবাবু বললেন, "আপনার ভয়টা আমি বুঝি। বেশি মাইনে চাইলে লোকটা শুরুতেই পিছিয়ে যেতে পারে। এদেশে এবং বিদেশে এ-বিষয়ে অনেক রিসার্চ হয়েছে।"

মোক্ষম ইংরিজি শব্দটা সারকিট সেনগুপ্ত এবার নিজের হাতেই আমার প্রথম খসড়াতেই বসিয়ে দিয়েছিলেন।

ধন্য এই ইংরিজি ভাষা—যদি বক্তব্যটা পেটে রেখে, ধরা না দিয়ে, অনির্দিষ্টকাল ধরে কথা চালিয়ে যেতে চান তা হলে এই ইংরিজি ভাষার কোনও জবাব নেই। সারকিট লিখে দিয়েছিলেন—নেগোশিয়েব্‌ল।

"চমৎকার কথা—মাইনেটা আলোচনাসাপেক্ষ—অর্থাৎ ধরি তো মাছ না ছুঁই পানি!" বলে হাসতে লাগলেন মালিক বুঝবে, আবেদনকারী অবুঝ নয়, আবার যা দেবেন তাই মেনে নেবার পাটিও নয়।

আমি টাইপ খরচা বাঁচাবার জন্যে স্বহস্তে আবেদনপত্রটি লিখেছি। মিস্টার বিনয় সুখানি সেটি দেখে রাগ করলেন না, বললেন, "আপনার হাতের লেখা তো চমৎকার।"

সাহিত্যিক হইনি, শিল্পী হইনি, পাকেচক্রে ওই হস্তলিপিটুকুই আছে,

ওটাও ইস্কুলের মাস্টারমশায়ের দান। পাঠযোগ্য দৃষ্টি সুখকর হস্তলিপির কতকগুলো সাধারণ নিয়ম ছোটবয়সে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

মিস্টার সুখানি আমাকে একটু বাজিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, "সারকিট আমার বন্ধু, আপনি তার কাছ থেকে এসেছেন। ওর রিকোয়েস্ট আমি ফেলতে পারি না।"

মনে হচ্ছে এবার মাইনে সংক্রান্ত শেষ আইটেমের দিকে এগোতে চাইছেন আমাদের বিনয় সুখানি।

"আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট মানুষ, এবিষয়ে আপনাকে আমি কী বলব?"

হা হা করে হাসলেন বিনয়বাবু। দুঃখ করলেন, "নিচের দিকে নামতে নামতে এই শহরের আর কিছু নেই, মিস্টার বিশোয়াস। এখানকার সরকার এখন একজন আত্মমর্যাদা হারিয়ে গমচাকিওয়ালাকেও শিল্পপতি বলে খাতির করছে।"

আমি আত্মসম্মান বজায় রেখে মাইনে সম্পর্কে দরদস্তুরের ইঙ্গিত দিলাম। বললাম, "অবসর নিয়েছি, অথচ ঈশ্বরের দয়ায় শরীর স্বাস্থ্য বিদ্যাবুদ্ধি সবই তাজা রয়েছে, ঝাড়া হাত পা মানুষ আমি, হাতে অঢেল সময় রয়েছে। সময় কাটানোটাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।"

"তো তো বটেই, তা তো বটেই। আপনি রিটায়ার করেছেন বলে চব্বিশ ঘণ্টার দিন তো কুঁকড়ে চোদ্দ ঘণ্টা হয়ে যাচ্ছে না।" সুচতুর হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন বিনয় সুখানি।

এই অভিনয়ে আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। বাকচাতুর্যের পালক ছাড়ানো মোদ্দা কথাটা হলো, আমার অসময়ে অবসর হয়েছে। আগে একেই বলা হতো ছাঁটাই। এখন ছাঁটাই কথাটা সরকার, ট্রেড ইউনিয়ন, কর্মী, মালিক, এবং কর্মীর পরিবারের সভ্য কেউ পছন্দ করে না, তাই তিক্ত সত্যটাকে চিনির রসে চুবিয়ে ভি-আর-এস করা হয়েছে। পুরো ব্যাপারটাই অনিচ্ছাকৃত, এবং বাধ্যতামূলক কিন্তু চমৎকার ইংরিজিতে বলা হচ্ছে স্বেচ্ছা-অবসর। এই 'স্বেচ্ছা' কথাটার প্রণামী হিসেবে কয়েকশ টাকা বাড়তি তুলে দেওয়া হচ্ছে বলির পাঁঠার সামনে। মিস্টার ধাওয়ান রিপন

স্ট্রিটে বসে একেই নুইসেন্স ভ্যালু বলে থাকেন। কোতলের সময় আওয়াজ যাতে না ওঠে পরে দুর্গন্ধ যাতে না ছড়ায়, তার জন্যে ছাগলের সম্মানে কিছু জরিমানা দেওয়া।

আমি যেটা বলতে চাইছি আটঘাট বেঁধে এবং সম্ভাব্য এমপ্লয়ার যেটা আন্দাজ করছেন : "স্যার, আমার একটা গতি করে দিন। আচমকা ভি-আর-এস হয়েছি। ভাড়া বাড়িতে থাকি। ছেলে নেই যে রোজগার করে খাওয়াবে। মাইনের টাকাতেই কোনও রকমে সংসার চলতো। বউয়ের কয়েকটা বড় বড় অসুখে নার্সিংহোমের মালিকরা মোটা টাকা বাগিয়ে নিয়েছেন, ফলে ব্যাংকে সঞ্চয়ও নেই। ভি.আর-এস-এর পুরো টাকার হিসেব এখনও পর্যন্ত হয়নি। ভেঙে খেতে সাহস হয় না। কতদিন এইভাবে বাঁচতে হবে তার ঠিক নেই। সুদের টাকায় সংসার খরচের যে মাসিক ঘাটতি হবে সেটুকু এই চাকরি থেকে উপার্জন করা আমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। দরদস্তুর করার মতন কব্জির জোর, কোমরের জোর আমার নেই। আপনি তো কেরানিদের বাজারদর জানেন। একজন সুস্থ সবল সারাক্ষণের কর্মচারী, সেইসঙ্গে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, আপনার প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চমৎকার সুযোগ।"

বিনয়বাবুর মুখ দেখে ওঁর মনোভাব কিছু বুঝবার উপায় নেই। উনি কিছুতেই বুঝতে দিতে চান না, ওঁর মধ্যে কি ভাবনা এই মুহূর্তে তাজা রয়েছে। বারগেনিং বা দরদস্তুরে ক্যালকাটা এখন ওয়ার্ল্ডের এক নম্বরে। এতো সহজে, এতো সস্তায় এতো মানুষ আর কোথাও পাবেন না।

আমি অবশ্য মুখে আবোলতাবোল বকছি। বাজারে কত প্রশস্তি শুনেছি বিনয়বাবুর প্রতিষ্ঠানের। সারকিট সেনগুপ্ত কী রকম সুখ্যাতি করেন সুখানি উদ্যোগের। একই সঙ্গে আমার মন নিঃশব্দে যে আবেদন প্রচার করছে তার মর্মার্থ : দয়া করে নিয়ে নিন আমাকে। বোম্বাই কিংবা দিল্লিতে যে টাকা আপনি প্রত্যেকদিন দিতেন সেই টাকায় পুরো একমাস আমাকে পেয়ে যাচ্ছেন। বাঙ্গালোর, চেন্নাইতে ভাত ছড়ালেই বুড়ো কাকের ঝাঁক ছুটে আসে না, মানুষ জোগাড় করার জন্যেও হেড হান্টার কোম্পানিকেও

বস্তাবস্তা টাকা দিতে হয়, অথচ এখানে হাত বাড়ালেই হাজির আমি। ক্যালকাটার যত বদনাম হচ্ছে, মানুষের দাম এখানে তত কমছে, তত সুবিধে হচ্ছে আপনাদের, বিনয়বাবু।"

তবু সন্তোষ হচ্ছে না এঁদের। ওই যে থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি! সব কিছু আপেক্ষিক। পরব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই তুলনার ঊর্ধ্বে নেই। পড়তির বাজারে একটা মাস মাইনে ঠিক করে পরের বছরে আফসোস এতো টাকা কেন দিচ্ছি!"

বিনয়বাবু আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন, আর বোধহয় আমার মনের গোপন কথাগুলো নিংড়ে নিংড়ে বার করে নিতে চাইছেন।

"শুনুন মিস্টার বিশোয়াস, মানুষের জীবনে মাইনে একটা ইম্পর্টান্ট জিনিস। এটা আপনার হয়ে আমার ঠিক করে দেওয়াটা ঠিক মরাল কাজ নয়। আমি নেতাজি সুভাষ বোসের শহরের লোক, সম্ভব হলে আমি ইমমরাল হতে চাই না। আপনি আজ চলে যান, ভেবেচিন্তে, কাল আমাকে আপনার প্রাইসটা জানিয়ে দেবেন। বিজনেসে টিকে থাকবার জন্যে লোয়েস্ট টেন্ডারে আমরা কাজ নিই। মাইনের ব্যাপারে এই টেন্ডার সিস্টেম চালু হলে এই শহরের বিজনেসের পক্ষে খারাপ হবে না।"

এবার একটু থামলেন বিনয়বাবু। "আলিমুদ্দিন স্ট্রিট এই টেন্ডার সিস্টেমের কথা শুনলে হৈ চৈ তুলবে। কিন্তু বাপু, তোমরা কে হে? দুধে আমে যদি মিশে যায়, মালিক ও কর্মচারী যদি একমত হয় তা হলে তোমাদের মতন আঁটি তো পড়ে গড়াগড়ি খাবেই!"

আমার শেষ কথাটা বিনয় সুখানি আজই শুনে নিলে পারতেন। সে কথাটা হলো. একটা কাজ আমার অবশ্যই চাই, কিন্তু বৃদ্ধবয়সে আমার কোনও বাজার দর নেই। আর আমি যেখানে বসবাস করি তার অপর নাম শিল্পের কবরস্থান।

কিন্তু বিনয়বাবু, ছিপের সব মাছকে একটু খেলিয়ে তোলায় বিশ্বাস করেন। তাঁর প্রস্তাব মেনে নেওয়া ছাড়া আমার উপায় কি?

"কোথায় এতো দেরি করলে?" জিজ্ঞেস করলো উপাসনা।

ওকে এই মুহূর্তে কিছু বলতে লজ্জা হলো। বললাম, "কোথায় আর দেরি করবো? রাস্তার খবর তো রাখছো না, সব কিছু স্লো চলছে—সুযোগ বুঝে, এ শহরে সময়ও স্লো হয়ে গিয়েছে, উপাসনা।"

উপাসনার একটু ব্যস্ততা রয়েছে আজ। আমাকে খাইয়েই সে ছুটলো বাপের বাড়ির কি এক পারিবারিক সম্মেলনে। আমাকেও যেতে বলছিল উপাসনা, কিন্তু জোর করেনি। সে জানে আমি এখনও পুরোপুরি সামলে উঠতে পারিনি। আর্থিক সঙ্গতি, আর্থিক নিরাপত্তা ইত্যাদি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত শ্বশুরকুলের কারও সঙ্গে সম্পর্কে পুরুষমানুষের স্বস্তি থাকে না। তবে উপাসনা পিত্রালয়ের কারও অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে কিছু সময় কাটালে আমি ভাল ফল লক্ষ্য করেছি।

বাপের বাড়ির সান্নিধ্যে এদেশের মেয়েরা বৃষ্টিতে স্নান করা গাছের মতন সতেজ ও সবুজ হয়ে ওঠে। সায়েবদের দেশে এমন হয় কি না জানি না, কিন্তু বাঙালিরা আরও কিছুকাল এইরকম থাকবে বলে মনে হয়।

উপাসনা অন্যত্র চলে যাবার পরে আমি ভাবছি, একসময় রিপন স্ট্রিটের অফিসটা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠতো, বিকেলের পড়ন্ত বেলায় অফিস থেকে টুক করে বেরিয়ে পড়ে বাড়িমুখো হাঁটবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠতাম। ইস্কুল পালানো ছেলের মানসিকতা মাঝে মাঝে কাজের মানুষের ঘাড়েও চেপে বসে, মানুষটাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না।

আর আজকের অপরাহ্নে উল্টোপুরাণ। হাতপা গুটিয়ে চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে মন চাইছে না, যেতে ইচ্ছে করছে রিপন স্ট্রিটে, ওখানে

সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলা, নিজের পাত্রে একটু গরম চা খাওয়া—ওই চায়ের যে একটা স্পেশাল স্বাদ ছিল তা এই ক'দিনে বুঝতে পেরেছি। ওই স্বাদ বিশ্বসংসারের কোথাও বোধহয় নেই, অথচ যতদিন চাকরি ছিল ততদিন অফিসের চায়ের প্রবল নিন্দা করেছি। এখন আমাদের অফিসের ছেলেগুলো কী করছে? আগে মার্কস লেনিন নিয়ে তর্কাতর্কি করতো, এখন রহস্যজনক ভাবে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে মাইক্রোসফ্‌ট, লুসেন্ট ল্যাব, আইবিনস। নতুনযুগের এই ভোলাবাবারাই নাকি পার করেগা একালের ছেলেমেয়েদের।

এই সব আলোচনায় মাঝেমাঝে যোগ দিতে মন চায়। কিন্তু আমি জানি, ম্যানেজার মিস্টার ধাওয়ান পছন্দ করেন না, যারা একবার অফিস ছেড়ে চলে গিয়েছে তারা কোনও কারণেই এখানে ভিড় জমায়। সুকৃৎ সেনগুপ্ত ব্যাপারটা শুনেছেন, বলেছেন, একদিন নিজেই ধাওয়ান দুঃখ করবে। আজকের সিকিওরিটি গার্ড যেদিন অন্য কারুর নির্দেশে ওকে অফিসে ঢুকতে দেবে না, সেদিন ধাওয়ান কষ্টটা বুঝবে।

এই সাবজেক্টে নগেন চৌধুরীও অনেকের সঙ্গে কথা বলেছেন। চৌধুরীমশায়ের সুনিশ্চিত উপদেশ : যা ছেড়ে চলে এসেছেন সেখানে ভুলেও আবার ফিরে যাবেন না। ওই যে শ্মশানে আমাদের শাস্ত্রীয় সিস্টেম আছে, সামনের দিকে তাকিয়ে পিছনের কলসি ইট মেরে ভেঙে দিয়ে, আর সেদিকে না তাকিয়ে বিরাট বিশ্বে মিশে যাওয়া। মশাই, পিছুটানটাই যদি আসল টান হতো তা হলে ভগবান কোনকালে আমাদের একজোড়া চোখের অন্তত একটা পিছনের দিকে লাগিয়ে দিতেন। মোটর গাড়িতে মানুষ লাগিয়েছে রিয়ারভিউ মিরর, কিন্তু মানুষের দেহে সেই ব্যবস্থা নেই। হোয়াই? কারণ, ভগবান চান না, মানুষ কখনও ব্যাক গিয়ারে চলে পিছিয়ে যাক!

অতএব ঝিমিয়ে থাকা টিভিযন্ত্র চালু হোক। ঘরে বসে বসে রাজকীয় মেজাজে টিভি দেখা যাক।

একটু পরেই যে সুকৃৎ সেনগুপ্ত হাজির হবেন, আশা করিনি। নতুন

উৎসাহে টগবগ করে ফুটছেন সুকৃৎ।

"এই টিভির দৌলতে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে টু-পাইস করছে, বলরামবাবু, আমার কাছেও আসছে মার্কেট রিসার্চের জন্যে।"

আমি বললাম, "সুখবর এটা। অবশেষে একটা কিছু হচ্ছে আমাদের এই শহরে।"

আমার দিকে তাকিয়ে সারকিট সেনগুপ্ত প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা বলুন তো, মানুষ এই দুপুরবেলায় কেন টিভি দেখছে?

"নিশ্চয় ভাল লাগে বলে।"

সন্তুষ্ট হলেন না সারকিট সেনগুপ্ত। রহস্যটা নিজেই ফাঁস করে দিলেন। "ফ্রি বলে। টিভি দেখতে পয়সা লাগে না।"

স্বীকার করলাম, "এটা আমার মাথায় আসেনি, সুকৃৎবাবু।"

এবার জানতে চাওয়া হচ্ছে, "দুপুরের টিভি দর্শকরা কি ক্রমশ সংখ্যায় বাড়বে? ভবিষ্যতে শুধু মেয়েরাই টিভি দেখবে, না পুরুষরাও দর্শকের দলে জয়েন করবে।"

"ছেলে না মেয়ে কারা টিভি দেখছে তাতে বিশ্বসংসারের কী এসে যায়? পুরুষ ও রমণী দুইই তো কেষ্টর জীব!"

সারকিট সেনগুপ্ত বললেন, "ভীষণ এসে যায়, বিশ্বাসমশাই। রিসার্চ বলছে, মোটা দামের কেনাকাটার ব্যাপারে কলকাতার মেয়েরা এখনও স্বামীর ওপর বেশ নির্ভর করে, কিন্তু দিল্লির পাঞ্জাবি মেয়েরা অনেক সাহস রাখে, তারা স্বামী যা বলে তার উল্টো করেন! এটা হাইলি সিক্রেট সংবাদ, কোরিয়ান এক সি ডি সি এই গোপন খবর সংগ্রহের জন্য তিন কোটি টাকা খরচ করেছে।"

"সি ডি সিটা কী বস্তু, সুকৃৎবাবু?" আমি আজকাল অনেক প্রতিষ্ঠানের নামের মাথামুণ্ডু বুঝতে পারি না।

"বেশিদিন টিকে থাকা ভোগ্যপণ্য সংস্থা—কনজিউমার ডিউরেব্‌ল কোম্পানি। এই ধরুন পার্ক স্ট্রিটের লিপস্টিক মাখা সুবেশিনী সুন্দরীর ঝাঁক—এ সব হলো এফ এস সি জি—ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস।

আর বহুদিনের বিবাহিতা সব সুখদুঃখের বিশ্বস্ত সঙ্গিনী, ইনি হলেন কনজিউমার ডিউরেব্‌ল!"

আমি বললাম, "সুকৃৎবাবু, দুপুরে যে সব পুরুষ কলকাতায় বাড়িতে বসে একমনে টিভি দেখছে তাদের কোনো সামাজিক প্রতিপত্তি নেই, আর্থিক সঙ্গতি নেই, স্রেফ সংখ্যা শক্তি আছে। আর কিছু করার নেই বলেই এঁরা হাতের গোড়ায় টিভি পেয়ে তাই খুলছেন।"

সারকিট সেনগুপ্ত আমাকে উড়িয়ে দিতে পারছেন না। বললেন, "আপনার সঙ্গে দেখা হলেই, আমার মার্কেট রিসার্চ ওলটপালট অর্থাৎ টপসিটারভি হয়ে যায়। আমি তো সবসময় বিজ্ঞাপনদাতাদের বলছি, সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছো, সস্তা রেটে দুপুরে মনের সুখে টিভিতে বিজ্ঞাপন করে যাও, দামি দামি জিনিস—হুড়মুড় করে বিক্রি হয়ে যাবে।"

আমি সারকিটকে বললাম, "হতে পারে ভাই, আপনি যা বলছেন তাই হয়তো সত্যি। আমি বহু পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখে যাচ্ছি, কিন্তু কোনও প্রোডাক্টের কথাই আমার মনে গেঁথে থাকছে না, আমি শুধু ভাবছি কখন সাড়ে পাঁচটা বাজবে, কখন উপাসনা ফিরবে, বৃষ্টি যেন তার পরে আসে, এবং এলেও রাস্তায় যেন জল না জমে, এবং জমলেও যেন মিনিবাস মাঝপথে থমকে না দাঁড়ায়, এটসেটেরা, এটসেটেরা।"

এখন উপাসনা নেই, সুতরাং চাকরিসন্ধানের কথাটা সারকিটের কাছে তোলা যায়। আসলে বেশি বয়সে চাকরি খোঁজাটা বেশি বয়সের মাতৃত্বের মতন, শরীর মন সম্ভাব্য মাতৃত্বের হাজাবরকম ঝামেলা সইতে চায় না।

সুকৃৎ বললেন, "চালিয়ে যান চেষ্টা। বিশ্বাসমশাই আমি বিনয়বাবুকে আপনার সম্বন্ধে আবার উস্কে দেব। তবে মাইনের ব্যাপারে আমার নাক গলানোটা আপনার পক্ষে বোধহয় মঙ্গলজনক হবে না। টাকার গর্ভযন্ত্রণাটা চাকরিপ্রার্থীকেই বইতে হবে। এমনভাবে অ্যামাউন্টটা ফিক্স করবেন যাতে সাপও না মরে, লাঠিও না ভাঙে!"

সুকৃৎ নিজে আশাবাদী, অপরকে কখনও নিরাশ করতে চান না। তিনি বললেন, "বিনয় সুখানির ওখানে কিছু একটা জুটে গেলে আপনাকে আর

দেখে কে? তবে মনে রাখবেন, অবসরের পরে নতুন চাকরিটা দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মতন।"

"আপনি বলছেন, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা? মন খুব টানে, কিন্তু দেহ তেমন সায় দিতে চায় না।"

"আমি ওসব সাহিত্য টাহিত্য বুঝি না, বলরামবাবু। তা কলম চালু থাকলে তো মেগা সিরিয়ালের সংলাপ লিখতাম, টাইটেলে প্রতিদিন পিতৃদত্ত নাম প্রচারিত হতো। আমি বুঝি, নতুন চাকরি মানে অতি যত্নে, অতি সাবধানে চলা।"

আমি খোয়াব দেখছি। সারকিট সেনগুপ্ত শুনেছে, কে একজন লোকে মধ্যপ্রদেশে জোর করে স্বেচ্ছা ভি-আর-এস পাবার পরে কি একটা কাজ করে হঠাৎ ক্রোড়পতি হয়ে গিয়েছে। কোন একটা ট্যুরিস্ট সায়েব ভোপালের গ্যাস স্ক্যান্ডাল দেখতে এসে দয়াপরবশ হয়ে কি এই লোকটিকে একটা কন্ট্রাক্ট গছিয়ে দিয়েছিলেন।

শাবাশ বলরাম বিশ্বাস! এই অবস্থাতেও তোমার স্বপ্ন আসছে—মানুষের স্বপ্ন দেখার যন্তরটা বার্ধক্যেও তা হলে পুরো বিকল হয় না!

সুকৃৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এতো বয়স্থ মানুষ, এতো ভি-আর-এসওয়ালা যখন ধারাবাহিক টিভি প্রোগ্রামের সমর্থক ও সমঝদার, তখন খোদ ভি-আর-এস নিয়ে একটা মেগা সিরিয়াল শুরু করলে এক ঢিলে দর্শক এবং স্পনসর দুই পাওয়া যাবে।"

"প্লিজ, সুকৃৎবাবু, দয়া করে ওই লাইনে যাবেন না, কাউকে ঠেলবেনও না। আপনাকে বলে বলছি, দর্শক পাবেন না। সব ভি-আর-এসওয়ালা নিজেকে ভুলবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, ছবিতে কেউ নিজেদের দেখতে চায় না। আর রেগুলার ভিউয়ার না থাকলে সাবান স্নো দাঁতের মাজনের স্পনসরও নেই!"

সুকৃৎ সেনগুপ্ত একটু চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। "সবাই তো সত্যজিৎ রায় নয়, যে ভিউয়ারের তোয়াক্কা না করে যা ভাল বুঝবেন তা নিয়েই ছবি

করবেন।"

"নিজেকে না দেখতে চাইলে, এইসব কর্মহীন মানুষ কাকে দেতে চায় টিভিতে?" চিন্তিত হয়ে উঠেছেন সুকৃৎ সেনগুপ্ত।

আমার মাথায় কিছু আসছে না। কী বলবো?

সুকৃৎ বললেন, "একটা আইডিয়া আমার মাথায় আসছে। সিরিয়ালের নামটা হবে—'মাস মাইনে, লাখ টাকা।' এই টিভি প্রতিযোগিতায় প্রতিমাসে একটা লক্ষ টাকা মাইনের চাকরি প্রতিযোগীদের অফার করা হবে। চাকরির সঙ্গে অবশ্যই গাড়ি, বাড়ি, চারটে এসি, তিনটে ফোন, দুটো সেলুলার এবং দুটো ফ্রিজ। যাঁরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন : পুরুষ ও মহিলা। বয়স : আঠারো থেকে আটানব্বই। শিক্ষাগত যোগ্যতা : কোনও বাধা নেই। বুনিয়াদি ইস্কুলে যে কোনও ক্লাস পর্যন্ত পড়া থেকে এম. এ, পি-এইচ ডি সবাই মোস্ট ওয়েলকাম।"

প্রথমে পর্যায়ে টিভি অফিসে প্রতিবেদক ফাইভস্টার হিরোকে ফোন করতে হবে অথবা পোস্ট কার্ড পাঠাতে হবে। তারপর থেকে আপনার কিছুই করার নেই, শুধু টিভি সেট খুলে বসে থাকুন, আকাশের গ্রহতারা এবং আপনার নিজস্ব ভাগ্যই আপনাকে লাখ টাকার মাইনের দিকে নিশ্চিতভাবে টেনে নিয়ে যাবে।

আমি নিজেও উত্তেজিত ও উৎফুল্ল হয়ে যাচ্ছি। বললাম, "মাথা ঘুরে যাবে সবার, সুকৃৎবাবু। টিভি কোম্পানির সব ফোনের লাইন জ্যাম, পোস্টাপিসের সব পোস্টকার্ড উধাও, কউন বনেগা ক্রোড়পতির থেকেও যদি বেশি হৈচৈ না বাধে তা হলে আপনার কুকুরের নাম রাখবেন বলরাম বিশ্বাস।"

সুকৃৎ এখন গুনগুন করে সুর ভাঁজছেন। তাঁর সবিনয় প্রশ্ন : "আকর্ষণটা ধরে রাখবো কী করে?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "যাঁরা সদ্য স্বেচ্ছা অবসর নিয়েছেন তাঁদের জন্যে একটা পঞ্চাশ হাজার টাকার স্পেশাল চাকরির অফার দিন।"

পয়েন্টটা টুকতে-টুকতে সারকিট সেনগুপ্ত বেরিয়ে গেলেন। বললেন,

কমপিটিশন মানির কোনও অভাব নেই এই কলকাতায়, অভাব শুধু ভাল আইডিয়ার।”

বাথরুম থেকে পশ্চিমের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে অবশেষে দেখলাম রবি অস্তাচলে। সরকারি অফিসের বাবুরা এবং গাছের পাখিরা একই সঙ্গে বাড়ি ফিরছে। এখানে একটা মস্ত বটগাছ আছে, অজ্ঞাত কারণে ওখানে কাক কোকিল ছাড়াও কয়েকটা রঙিন পাখিও নতুন বাসা বেঁধেছে।

উপাসনা এখনই আসছে না। এই সুযোগে পার্কে ফিরে সিনিয়র সিটিজানদের প্রিয় বেঞ্চিটা একটু ঘুরে আসি।

নগেন চৌধুরী, হরিসাধন বোস, সেনকো সবাই পার্কে মহা উৎসাহে এসে গিয়েছেন। হরিসাধনবাবু সহাস্যে সাবধান করে দিচ্ছেন দুই সেনকে। “খুব সাবধান মশাই, আপনাদের দুই দম্পতিকে শেষপর্যন্ত না বিদেশে দৈবের বশে।”

সেনকোর দুই সেন ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে একটু ঘাবড়ে যাচ্ছেন। নগেন চৌধুরী এই সময় মন্তব্য করলেন, দৈব সব সময় মানুষের খারাপ করে এই ধারণাটা ভুল। ভীতু বাঙালিরাই এ রকম ভেবে থাকে, কিন্তু তার নাম তো দুর্দৈব। ভাল ভাগ্য থাকলে, বিদেশের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আপনাদের নিমন্ত্রণ আসবে।

জানা গেলো, “সায়েবদের নেমন্তন্ন মশাই শুখা নেমন্তন্ন নয়। যাতায়াতের প্লেন ভাড়া, বিদেশের হোটেল ভাড়া, হাতখরচা এবং আরও কত কী না চাইতে দিয়ে দেবে! গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সুবাদে বাংলাদেশের যেমন সুনাম হয়ে গিয়েছে, সেনহাটির দুই সেনের সুবাদে আমেরিকাও তেমন

ফেমাস হয়ে যাবে। তবে দোহাই আপনাদের, ভুলেও সেনহাটি নামটা মুখে আনবেন না। সব সময় আমাদের পিকনিক গার্ডেনের পাড়ার এবং এই গলির, এই অবসরিকার নাম উল্লেখ করবেন। আমাদের নাম করে দেবেন, দ্য ক্যালকাটা এক্সপেরিমেন্ট। তারপর দেখুন না, মিস ইউনিভার্সের মতো সেনকোর নাম সারাবিশ্বে কী রকম ছড়িয়ে পড়ে।"

নগেন চৌধুরী নিজেও ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছেন না। হরিসাধন ওরফে ঢেকো বোস বললেন, "স্কিমটার গুরুত্ব আপনারা এখনও বুঝে উঠতে পারছেন না। সিঙ্গাপুর গভরমেন্ট কিছুদিন আগে ঘোষণা করেছেন, যে সব পুত্রসন্তানরা স্বেচ্ছায় বয়স্থ বাবামায়ের বাসস্থানের দেড় কিলোমিটারের মধ্যে বসবাস করতে চাইবে সরকার তাদের জলের দামে বাড়ি ভাড়া দেবেন। এই আর্থিক সুযোগেই হৈ হৈ পড়ে গিয়েছে, দাবি উঠেছে, সিঙ্গাপুরের দূরদর্শী প্রাইম মিনিস্টারকে এখনই ম্যাগসেসে পুরস্কার দাও।"

আমি এবার বোকার মতন নগেনবাবুকে বললাম, "খুব সাবধান দাদা। বৈপ্লবিক প্রোজেক্ট নিয়ে খেটে মরলেন এঁরা, হয়তো ম্যানিলায় আন্তর্জাতিক পুরস্কার নিতে চলে গেলেন কলকাতার মেয়র কিংবা রাইটার্সের কোনও মন্ত্রী!"

ঢেকো বোসের মন্তব্য : "একেই একসময় বলত নেপোয় মারে দই! এখন এ শহরে ভাল দই নেই, তাই নেপোও নেই!

সকালে মর্নিং ওয়াকারের সংখ্যা কমছে। জানা গেল প্রাতভ্রমণে অবসরিকা সভ্যদের উৎসাহ কম নেই। কিন্তু পথের বিপদ। এই অঞ্চলের দুই নিষ্ঠাবান মর্নিং ওয়াকার সম্প্রতি এল মার্কা গাড়িতে ড্রাইভিং শিক্ষার্থীদের হাতে চাপা পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন। যা সবচেয়ে দুঃখের। লার্নাররা আহতদের হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে সুযোগ বুঝে নিঃশব্দে পালিয়েছেন।

তেকোণা পার্কের দক্ষিণদিকে সিন্ধি বেঞ্চেও রহস্যজনক কারণে ভিড়

কমছে সকালে।

"আরে মশাই, ছেলেধরার প্রকোপ বাড়ছে," বললেন ঢেকো বোস। "ধনবান গুণ্ডারা আগে কমবয়সী ছেলে ধরে উধাও হতো, এখন বয়স্ক শাঁসালো পার্টিকে গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে বেপাত্তা হচ্ছে। অজ্ঞাত স্থান থেকে যথাসময়ে টেলিফোন আসে, এবং নামকরা গুণ্ডারা মুক্তিপণ দাবি করে। ভাল ভাল পার্টিগুলো পাঁচ লাখ টাকার কমে মুক্তিপণ নেয় না, ওরকমে ওদের পড়তায় পোষায় না!"

"এরা নাকি আজকাল মশাই বাংলার বাইরে থেকে কলকাতায় আসছে?" জিজ্ঞেস করলেন কৌতূহলী এক সভ্য।

ঢেকো বোসের সরল উত্তর : "সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী যে কোনও ভারতীয় সিটিজান দেশের যে কোনও জায়গায় গুণ্ডামি, রাহাজানি এটসেটেরা করতে পারে।"

"বলেন কি মশাই।" আমার তো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বার অবস্থা। সংবিধানের এমন ব্যাখ্যা আগে আমাব মাথায় আসেনি।

হরিসাধন বোস গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "এই তো সবে শুরু মশাই। এরপর আসছে গুণ্ডামির বিশ্বায়ন। ফরেন ইনভেস্টমেন্টের সঙ্গে যখন ফরেন গুণ্ডারাও এখানকার বড় বড় শহরে আন্তর্জাতিক প্র্যাকটিস করতে আসবে তখন আমরা না বলতে পারবো না। কারণ আমরাও থাইল্যান্ড, হংকং-এ, ডুবাইতে গুণ্ডা এক্সপোর্ট করা শুরু করেছি।"

সন্ধেবেলায় পার্কটা সত্যই আনন্দদায়ক। কিন্তু অসুবিধাটা হয় ফেরার সময়। কলকাতার রাস্তার আলোগুলো আজকাল আফিংখোর বুড়োর মতন ঝিমোয়। আলোতে একটুও জেল্লা নেই; আমি উপাসনাকেও এই অস্পষ্টতার কথা বলতে সাহস পাই না। এখনই জোর করে চোখের ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দেবে। অনেকগুলো টাকা স্রেফ ল্যাম্পপোস্টের সৌন্দর্য দেখার জন্যে নষ্ট করতে হবে। দিন কাল কী হলো, এই শহরে বিনা পয়সায় এখন ভগবানকেও পাওয়া যায় না।

স্পিড শ্যু পরে অথচ নিজের গতি বেশ যথেষ্ট সংযত করে অবশেষে

নিজনিকেতনে পৌঁছনো গেলো। উপাসনাও হৈচৈ করে ফিরে এল। আজ সে সঙ্গে এনেছে, পিত্রালয়ের রান্নাখাবার।

পিত্রালয় অনেক আপনজনের সঙ্গে উপাসনার দেখা হয়েছে। কারও সুখ, কারও অসুখ। কেউ সুস্থ, কেউ অসুস্থ। কারও প্রাপ্তিযোগ, কারও অপ্রাপ্তির বেদনা। বাঙালির সঙ্গতিহীন সংসারে কোনোক্রমে গড়িয়ে গড়িয়ে চলা। কোথাও উল্লেখযোগ্য সাফল্য নেই, অথচ অসংখ্য আর্থিক ব্যর্থতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা গৃহকোণে। একটা কারণে উপাসনা এদের ভালবাসে। কোথাও তেমন অপ্রাপ্তির দাহ নেই, সংসারের ধিকিধিকি আগুনে গত পাঁচদশক ধরে ধীরে ধীরে পুড়তে আমাদের আত্মীয়স্বজনরা অভাবনীয় সহ্যশক্তি অর্জন করেছে। এই অগ্নিপরীক্ষা সমস্ত জাতটাকে এমন এক অতুলনীয় আভিজাত্য দান করেছে যা এই পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।

প্রিয়জনদের সাংসারিক সুখদুঃখের নানা কথা মন দিয়ে শুনেছে উপাসনা। সময় দিয়ে শোনা আর সহানুভূতি দেখানো ছাড়া আর কি করতে পারে উপাসনা? যে অসুস্থ তাকে চেন্নাই পাঠিয়ে সুস্থ করে তোলা, যার বিয়ে হয়নি তার একটি ভাল পাত্র জোগাড় করে দেওয়া, যে ডাক্তারিতে ঢুকতে পারছে না তাকে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকিয়ে দেওয়া, এ সব করার মতন অর্থ তো উপাসনার কাছে নেই। তবে উপাসনা নিজেকে কাচের মতন স্বচ্ছ রেখেছে, সচ্ছলতা নেই বটে, কিন্তু তার সাধ্য কত সীমিত তা বুঝে নেওয়া আপনজনদের পক্ষে মোটেই কষ্টকর নয়।

উপাসনা বুঝেছে, সংসারে মানুষের সুখদুঃখের কথা শোনার লোকেরও অভাব হচ্ছে। নিজের দুঃখ ও নিজের প্রত্যাশার বাইরে দেখবার বা শোনবার ধৈর্য থাকছে না মানুষের। উপাসনা অবশ্য কাউকে অযথা দোষ দিতে চায় না। যার যন্ত্রণা সেই একমাত্র জানে কতো কষ্ট, দূর থেকে এইসব মাপ যদি মানুষ আন্দাজ করতে পারতো বিশ্ব সংসারের কোথাও তা হলে এক ফোঁটা আনন্দ অবশিষ্ট থাকতো না।

বিশ্ব সংসারের সার সত্যগুলো উপাসনার মতন মেয়েরা কত সহজে

দেখতে পায়। স্বামী বলরাম বিশ্বাসের মুখে ভার্যার এই তারিফের অবশ্য মানে হয় না, ভি. আর-এস পাওয়া একটা মানুষের উপলব্ধির কতটুকু মূল্য থাকতে পারে এই বিশ্বসংসারে?

উপাসনার সব কথা সাত সকালে আমার কানে প্রবেশ করছে না কেন তার একটা কারণ আছে। আমি এখন প্রস্তুত হচ্ছি মিস্টার বিনয় সুখানির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে।

মানসম্মান রক্ষে করে ওখানকার চাকরিটা আমাকে পকেটস্থ করতেই হবে। মাইনের পরিমাণের ব্যাপারে ভাববার সময় এখন নয়। রিটায়ার্ড লোকরা এবং শিশুশ্রমিকরা জোয়ানদের তুলনায় একটু কম মাইনে তো পাবেই, না হলে হিসেবি মানুষ তাদের রাখবে কেন? একবার ভাবছিলাম, শিশুশ্রমিক রাখলে আইনের অনেক ঝামেলা, কাজেই মালিকের কম পয়সা দেওয়ার প্রবণতা থাকতে পারেই। কিন্তু বৃদ্ধদের চাকরি দেওয়ার ব্যাপারেও কি কোনো বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে? দুনিয়ার বড়লোকদের খেয়ালখুশি অনুযায়ী তো সব আইন রচিত হয়, শিশুদের 'রক্ষে' করতে গিয়ে অসহায় জীবদের নিশ্চিত অনাহারের দিকে ঠেলে দিতে কারও বাধে না।

উপাসনা বলে চলেছে, "কুমার ছেলেটি বেশ, দুটো স্টার নিয়ে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে।"

মামাতো বোন ঝুমার স্বামী যে এই বছরেই অকস্মাৎ মারা গিয়েছেন তা আমার মনে আছে। উপাসনাকে সঙ্গে নিয়ে আমিও শ্মশানে গিয়েছিলাম। উপাসনা তার রিপোর্ট দিয়ে চলেছে, "মদনকাকুর মনের

অবস্থা মোটেই ভাল নয়, জামাইয়ের স্পাইনাল কার্ডে কি একটা হয়েছে। মীনাদির ছোট মেয়ে স্বামীর সংসারে থাকতে না পেরে বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে।

আমি জানি এই মেয়ে দু'বছর আগে পরিবারের সকলের আপত্তি কানে না নিয়ে রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছিল।

উপাসনার পরবর্তী নিবেদন : "মামিমার বারাসতের জমিটা ওঁর ছোট দেওর ঠকিয়ে নিয়ে নিয়েছে।" এ সব ডায়ালগ তো বঙ্গজীবনের অঙ্গ! এ সব জ্বালা উপশমের মতন সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম এখনও তো বিশ্বসংসারে প্রেরিত হয়নি।

এইসব কথা অস্বস্তির সৃষ্টি করে, মনের ভারসাম্য নষ্ট হয়, তবু প্রিয়জনের দুঃখের কথা শুনতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। আমি মনে মনে উপাসনার ধৈর্যের ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করি। সে কেমনভাবে নিজের আর্থিক দুশ্চিন্তার মধ্যেও আত্মীয়দের সুখদুঃখের প্রবাহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেনি।

উপাসনার মুখ এবার আরও গম্ভীর হলো, "একটা খারাপ খবর আছে," বলছে উপাসনা।

উপাসনা তুমি অনেকগুলো খারাপ খবর ইতিমধ্যেই দিয়েছ। কিন্তু একথা বলতে গিয়েও বলা হলো না। কারণ এর থেকেও কোনও খারাপ খবর নিশ্চয় গতকাল বিকেলে সে পিত্রালয় থেকে সংগ্রহ করে এনেছে।

উপাসনা বললো, "রত্না বউদিকে দেখে আমি তো অবাক। চাঁদুদার বউ, বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী ছিল, জানোই তো। এখন রত্না বউদির শরীর স্বাস্থ্য যা হয়েছে। চামড়া দিয়ে ঢাকা কয়েকখানা হাড়। দেখলে ভয় হয়। বললাম, বউদি, শরীর কী করেছো? ঠিক মতন খাওয়া-দাওয়া করছো না?"

আমি বললাম, "ওইসব কথা জিজ্ঞেস করতে নেই, উপাসনা। নিউট্রিশন ভীষণ খরচের ব্যাপার। যেসব খাবারে মানুষের শরীর-স্বাস্থ্য ভাল থাকে তার দাম চড়চড় করে বেড়ে যাচ্ছে। ব্যবসাদাররা জেনে

গিয়েছে, মাছে, মাংসে, মাখনে দুধে এবং কতকগুলো ফলে মানুষের শরীর উপকৃত হয়, উপকারের হিসেব অনুযায়ী জিনিসের দাম তালগাছে উঠে যাচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ করে কোনো ফল পাবে না। সামান্য কিছু জিনিসকে যখন বহু মানুষ স্বাস্থ্যের জন্যে এবং উপভোগের জন্যে তাড়া করে তখন এসবের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠে যায়। ভাল মাছ, ভাল ফল, ভাল সবজি এসব গরিব দেশ ছেড়ে বড়লোকদের দেশে রপ্তানি হয়ে যাবে ; ধনীরা খাবার পরে কিছু পড়ে থাকলে তবে গরিব দেশের মানুষ খেতে পাবে। এইটাই বিশ্বায়িত পৃথিবীর নতুন নিয়ম।"

অর্থনীতির আলোকে অনিয়ম বেনিয়মের কোনো ব্যাখ্যা চায় না উপাসনা। সে বলছে, "রত্না বউদি, আপনার শরীর এত খারাপ হওয়া চলবে না।" রত্না বউদি মুখে কিছু প্রকাশ করেন না, শুধু মিষ্টি হাসেন। শনির দৃষ্টি পড়েছে তাঁর সংসারে।

শনির দৃষ্টিটা কী জিনিস, জানতে চেয়েছে উপাসনা।

রত্না বউদি ব্যাখ্যা করেছেন, "জানো তো তোমার চাঁদুদার কাজকর্মের ব্যাপার। শনি একবার কোপ মারল। গেস্টকিনের অমন ভাল কাজটা হাতছাড়া করে, বুড়ো বয়সে তোমাদের চাঁদুদা একটা ছোট্ট আপিসে অতি সামান্য মাইনেতে ঢুকেছেন।

রত্না বউদি সংসার খরচ কমাবার জন্যে কাজের লোক পর্যন্ত ছাড়িয়ে দিয়েছেন। আজকাল বাড়িতে খবরের কাগজও নেন না। বিল কমাবার জন্যে দারুণ গরমেও ফ্যান চালান না, সারারাত ব্লাডপ্রেসারের রুগি ঘামে ভিজে নেয়ে ওঠেন।

রত্না বউদি ও চাঁদুদার সাংসারিক ছবিটা আমি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। উপাসনা বললো, "জানো, আমার এই বউদি বিয়ের আগে সেতার বাজাতেন। চাঁদুদারও অনেক শখ ছিল, মাইনে দিয়ে তবলা শিখতেন ওস্তাদের কাছে।"

তা উপাসনা, এসব শুনে বলরাম বিশ্বাস কী করবে? সহমর্মিতা বলতে যা বোঝায় তার তো অভাব নেই দুর্ভাগা এই বাংলায়।

উপাসনা মানুষটি ভীষণ ইনোসেন্ট—একেবারে নিষ্পাপ ও সরল। দুঃখ দেখছে, দুঃখ পাচ্ছে, স্বামীকে তার একটু ধারাবিবরণ দিয়ে নিজের বুকটা একটু হাল্কা করতে চায়।

উপাসনার সামনে আমি নির্বাক। কিন্তু মনে মনে আমি বলছি, যতগুলো দুঃখের, হতাশার, এবং বঞ্চনার বিবরণ ইতিমধ্যেই উপাসনা পিত্রালয় থেকে সংগ্রহ করেছে তার প্রতিবিধান করতে হলে একডজন ফরাসি বিপ্লব ও দু'ডজন রুশ বিপ্লব এখনই প্রয়োজন ; যাঁরা বিপ্লবে বিশ্বাস করেন না তাঁদের প্রেসক্রিপসন অনুযায়ী একাধিক জার্মান ও জাপানি মিরাক্‌ল এখনই প্রয়োজন।

উপাসনা, অনেকদিন আগে কলেজে পড়ার সময় তুমি যখন বেশ আধুনিকা ছিলে তখন একদিন বলেছিলে, যাদের বুদ্ধি আছে তারা মিরাক্‌ল-বা অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করে না।

তোমার কি মনে আছে, প্রফেসর ঘটক আমাদের ক্লাসে বুঝিয়েছিলেন, বাইবেলের এবং সাধুজীবনের অলৌকিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত প্রাচীন ইংরেজি নাটককে সমালোচকরা মিরাক্‌ল বলে?

রত্না বউদির ব্যাপারটা বোধহয় রিভার্স মিরাকল। উপাসনা এবার বললো, "জানো, ভীষণ আপসেট চাঁদুদা। ওঁর দ্বিতীয় চাকরিটাও হাতছাড়া হবে মনে হচ্ছে।"

"হোয়াই?" আমি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম উপাসনাকে।

উপাসনা বললো, "চাঁদুদার আফিসে মালিক চাকরি দেন রিটায়ার্ড লোকদের। একজন রিটায়ার্ড লোক বোধ হয় চাঁদুদার থেকেও কম মাইনেতে কাজ করতে রাজি আছেন। সেক্ষেত্রে মালিক যে চাঁদুদাকে আর রাখবে না সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই তাঁর।"

"চাঁদুদার ভাল নামটা যেন কি? ওর নতুন অফিসটা যেন কোথায়?"

উপাসনা যতটুকু জানে ততটুকু বললো। আর তার উত্তরটা শুনে আমার বেয়াড়া শরীরটা যেন অবশ হয়ে আসছে। উপাসনার ধারণা, চাঁদুদার অফিসের ঠিকানাটা যেন পণ্ডিতিয়া প্লেস, চাঁদুদার ভাল নামটা

যেন...ভট্টাচার্য! আর মালিকের নামটাও... উপাসনা গরম সিসে দিয়ে যেন আমার বুকের ওপর কিছু ঢালাই করে দিল।

"কী হলো তোমার? অতো কেন ভাবছ তুমি," বিব্রত উপাসনা এবার জানতে চাইছে। আমি এখনও নিরুত্তর। তা হলে একটা হিসেব পাওয়া যাচ্ছে। বলরাম বিশ্বাস সম্ভাব্য কর্মস্থলে কম মাইনে কোটেশন দিলে কার চাকরি যাচ্ছে সুখানি কোম্পানি থেকে তা এবার বুঝতে পারা যাচ্ছে।

"তুমি হঠাৎ ঘামছো কেন?" আমার অর্ধাঙ্গিনী উপাসনার রীতিমত কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ।

"গরমকাল। মানুষ ঘামবে না?" উপাসনার প্রশ্নের উত্তরে বিরক্তি প্রকাশ করছি, কিন্তু আমার শরীরের ঘাম বন্ধ হচ্ছে না।

একটা বড়ধরনের সিদ্ধান্ত ঝটপট নিয়ে ফেলেছি। আমি বললাম, "উপাসনা, আমি একটু বেরুবো ভেবেছিলাম। কিন্তু আমি ঠিক করলাম যেখানে যাবো ভেবেছিলাম সেখানে এখন যাবো না।"

"কেন? যেখানে যাওয়া দরকার সেখানে কেন যাবে না?" উপাসনা সরল মনে বলছে।

আমি বললাম, "উপাসনা, মানুষ যেখানে যাবে ঠিক করে অনেক সময় সেখানে যাওয়া যায় না।"

"তা হলে তুমি কী করবে?" প্রশ্ন আসছে উপাসনার দিক থেকে।

আমার উত্তর : "আমি কিচ্ছু করব না, উপাসনা। আমি একটু ভুলে থাকার জন্যে আমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকার চেষ্টা করবো।"

বাড়িতে এই মুহূর্তে আলো নেই। সি ই এস সি-র খেয়ালি অথবা যুক্তিসঙ্গত লোডশেডিং চলছে। উপাসনা অবশ্য বিদ্যুতের জন্যে তোয়াক্কা করল না, আমাকে অসময়ে ঘুম পাড়াবার জন্যে হাতপাখা নিয়ে পরম স্নেহে হাওয়া করতে লাগল।

আমাকে অবশ্যই তাড়াতাড়ি ঘুমোতে হবে, কারণ উপাসনা জানিয়ে দিয়েছে, আমাকে ঘুম পড়িয়েই সে চাঁদুদার চাকরিটার জন্যে সামনের কালীমন্দিরে সামান্য কিছু পুজো দিতে যাবে। ভগবান তুমি রত্নাদির দিকে

মুখ তুলে তাকাও, চাঁদুদার যেন চাকরিটা যেন চলে না যায়।

ভোর হলো, দোর খোলো। শ্রীমান বলরাম বিশ্বাস কুঁড়েমি বিসর্জন দিয়ে একবার উঠে পড়ো। অতএব নির্ধারিত সময়ের একটু আগেই পাড়ার তেকোণা পার্কের দিকে পা বাড়িয়েছি। উৎসাহটা নগেনবাবুর। পার্কে অবসরিকার সভ্য সংখ্যা? আশানুরূপ নয়। "তুমি ইয়ংম্যান, তুমি দায়িত্বটা নাও। ভোরবেলাটা আকর্ষণীয় করে তোলো।"

নগেনবাবু জানেন, স্বাস্থ্যরক্ষা করতে গিয়ে লার্নার ড্রাইভারের হাতে প্রাণবিসর্জন ভাল নয়, কিংবা পাঁচঘণ্টার পণবন্দি হওয়াটাও সুখকর হবে না। কিন্তু তাঁর বক্তব্য, সিন্ধি বৃদ্ধরা তো হাজার হাঙ্গামার মোকাবিলা করে তাঁদের বেঞ্চে নিয়মিত জমায়েত হচ্ছে। যারা মানুষ তুলতে বাইরে থেকে কলকাতায় আসে তারা জানে কলকাতার কোন্ মানুষের কত ভ্যালুয়েশন। বেশি ভ্যালুয়েশন হিসেব করলে গুণ্ডাদেরই লোকসান। বন্দিকে মাসের পর মাস ভাত কাপড় দিয়ে পুষতে হবে, অথচ টাকা পাওয়া যাবে না।

অবসরিকার কাগজে এবার বিস্তরিতভাবে লেখা হয়েছে, বিশিষ্ট ডাক্তারের উপদেশ : হাঁটুন হাঁটুন।

হাঁটা ছাড়া পেনসনারদের এবং অকালবৃদ্ধ ভি আর এস-দের অন্য কোনো পথ নেই। কর্মহীনরা জেনে রাখুন, হাঁটাচলা কমলে সেই অনুপাতে ঘুমও কমবে। শুধু স্বেচ্ছা-হন্টন নয়, সন্ধের পর চা-কফি পান বন্ধ করুন। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সময় নষ্ট না করে সেই সময়েও হাঁটুন। মনে রাখবেন হাঁটলে হাড়ের অসুখও কম হবে। ঘুম না হলে চিন্তিত হবেন না, কারণ বেশি বয়সে তিন-চারঘণ্টা ঘুমই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট। অতএব ঘুমের আশা ছেড়ে দিয়ে মনের আনন্দে ঘুরে ঘুরে হাওয়া খান—মনে রাখবেন এই পৈতৃক শরীরে প্রতিদিন ৩৫ হাজার বার শ্বাসগ্রহণ করে অন্তত ১৬ কেজি বাতাস অবশ্যই শরীরে ঢোকাতে হবে।

অবসরিকা পত্রিকায় উপদেশামৃতে নতুন দুটি পয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে : নিজেকে সংসারে অপ্রয়োজনীয় মনে করে মানসিক শান্তি নষ্ট করবেন না।

নব উদ্যমে নতুন বন্ধুলাভের চেষ্টা করুন। সব সময় মনে রাখবেন বার্ধক্যেরও একটা সৌন্দর্য আছে।

নগেনবাবুকে আজ একটু উত্তেজিত মনে হচ্ছে। অন্য বেঞ্চের সিন্ধি সভ্যরা, মাঝে মাঝে দলবদ্ধভাবে হাসবার চেষ্টা করছেন। এটাও নাকি ভালভাবে বেঁচে থাকবার একটা সহজ পথ। ওঁরা বোধহয় বম্বে থেকে হাসির মাস্টার আনাবেন। নগেন চৌধুরী আমাকে বললেন, "আমরা ঘোষ, বোস, দাসরা দেখেও শিখবো না, শুনেও শিখবো না, বই পড়েও শিখবো না। অথচ দেখুন ওদের উৎসাহ এবং বিজনেসের বুদ্ধি। ওঁদের মধ্যে এক ভদ্রলোক সাইকেলে গোটা কয়েক ফ্লাক্স ও প্লাস্টিক গেলাস নিয়ে প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় এখানে চলে আসেন। না, উনি চা-কফি বিক্রি করেন না, ওঁর কাছে পাবেন নিমপাতার রস এবং সাতরকম পাতার আয়ুর্বেদিক রস। যে কোনো স্বাস্থ্যকর কবিরাজী ফ্রেশ রস মাত্র তিন টাকা গেলাস—পার্কেই হুড়মুড় করে বিক্রি হচ্ছে। কে মশাই বাড়িতে এসব তৈরির ঝক্কি প্রতিদিন সামলাবে? অবস্থা বুঝে ভদ্রলোক ব্যবস্থা করেছেন, মোবাইল হেল্‌থ ড্রিংক! চলমান স্বাস্থ্যসুধা, মানুষটি পাকা ব্যবসায়ী। আমি দু'দিন ওঁর কাছ থেকে নিমপাতার রস খেয়েছি। খাবার পর বিনামূল্যে মুখশুদ্ধি, যাতে সুখের তিতোভাবটা চলে যায়। ইচ্ছে করলে যে কেউ মান্থলি পেমেন্ট সিস্টেমে চলে যেতে পারেন!"

মানে, একটা দুর্দান্ত ব্যবসায়িক সুযোগ আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেলো। যাদের বিজনেসে মন আছে তারা সারাক্ষণ বাজারের ওপর বাজপাখির মতন নজর রেখেছে; সুযোগ পেলেই তারা ছোঁ মেরে খরিদ্দার ধরে নেয়। দেখছি ভদ্রলোক খরিদ্দারকে যথাসাধ্য সার্ভিসও দিচ্ছেন, বিভিন্ন শরীরের বিভিন্ন সমস্যা বুঝে বিভিন্ন রস তিনি রেকমেন্ড করছেন। পণ্ডিত শিবকালী ভট্টাচার্য এঁকে দেখলে অবশ্যই খুশি হতেন।

আমি ভাবছি, তাৎক্ষণিক বিজনেসের এই সামান্য বুদ্ধিটা আমার মাথায় এলো না কেন? এইসব গাছগাছড়ার বিবরণ, তাদের বিভিন্ন গুণাবলী এবং সেই সঙ্গে কয়েকখণ্ডের শিবকালীসংহিতা তো আমার হাতের কাছেই

ছিল, উপাসনাও এইসব রস তৈরিতে আমাকে সাহায্য করতে পারত। আমার তো জানা উচিত ছিল, আজকাল বাড়িতে গাছগাছড়ার রস নিষ্কাশন করে তরিবত করার সুবিধে নেই। একটা সুবর্ণ সুযোগ একটুর জন্যে হাতছাড়া হয়ে গেল। পার্কের এই অবাঙালি ভদ্রলোক অদূর ভবিষ্যতে একদিন সাইকেল ছেড়ে স্কুটারভ্যান করবেন, তারপর নিশ্চয় হার্বাল জুসের চোখধাঁধানো দোকান খুলবেন। দয়া করে জুসের দোকানদারদের অবজ্ঞা করবেন না, দিল্লির একজন জুসওয়ালা যে মাথা খাটিয়ে শত শত কোটি টাকার মালিক হয়েছেন তা অনেকেই তো জানেন।

পার্কে পাক খাচ্ছেন কলকাতার বৃদ্ধ এবং অকালবৃদ্ধরা। চাকরি থেকে অবসর নিলেই বৃদ্ধ, এইটাই এই শহরের কানুন এবং অকালবৃদ্ধও তাঁর বার্ধক্যকে কিনা প্রতিবাদে মেনে নেন।

এঁদের অনেকেকেই কিন্তু নগেন চৌধুরীর তাঁর অবসরিকার মাধ্যমে উৎসাহিত করতে সমর্থ হয়েছেন।

"আসলে, সাধারণ মানুষের সবসময় একজন নেতা প্রয়োজন। চোখের সামনে হাতের গোড়ায় যখন কাউকে পাওয়া যায় না তখন না দেখেই ওপরের ভগবানকে মাটির মানুষ শিরোধার্য করেছে। আর অন্যসময় আমাদের নগেনবাবুরা তো রয়েছেন," বলছিলেন আমাদের সকলের প্রিয় ঢেকো বোস।

ঢেকো বোস বললেন, "হাঁটার স্পিড্ বাড়ান মশাই, ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে হাঁটলে শরীরের হাড়গুলো চাঙ্গা হবে না, মনে রাখতে হবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হাড়ের সংখ্যা কমে যায়। একটা বেবির শরীরে থাকে সাড়ে তিনশ হাড়, আর পরিণত বয়সে আমার হাড়ের সংখ্যা মাত্র দুশো।"

আমাদের বেঞ্চির কয়েকজন বন্ধু তাঁদের সহযাত্রীদের সঙ্গে ভাব করে নিচ্ছেন। তাঁদের প্রেরণার উৎস নগেন চৌধুরীর নির্দেশ আর ঢেকো বোসের সাম্প্রতিক ইংরিজি রচনা।

ঢেকো আমাকে বললেন, "আমি একা আর কত খবরের হদিশ পাবো?

আপনারা সবাই যেখানে যা খবর পান তা আমাকে সাপ্লাই করুন।"

এক ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে আমাদের প্রিয় সম্পাদককে বললেন, "আমি মশাই, যখন প্রবাসে ছিলাম..."

"কোথায়? পুণায়?'

"ঠিক ধরেছেন, তবে ওটা পুনা নয়, পুনে! মহারাষ্ট্রিয়ানরা ভীষণ চটে যায় ওদের নামটাম ঠিকমতন উচ্চারণ না করলে।"

"আমরাও তো একই মেজাজের লোক মশাই, নাম নিয়ে নো হ্যাংকি প্যাংকি!"

"কী বলছেন মিস্টার বোস! আমার বাড়ির সবাই বলেন তাঁরা থাকেন ওতোরপাড়ায়। কাউকে তো উত্তরপাড়া বলতে শুনলাম না। আমার ননবেঙ্গলি ওয়াইফ কত কষ্ট করে স্যাংসক্রিট স্টাইলে 'উত্তরপাড়া' শব্দটা রিহার্সল দিয়েছিল।"

পরবর্তী বক্তব্য, "ভদ্রলোক একসময় একটু হেভিওয়েট ছিলেন। তারপর আমার ওয়াইফ মারাঠী এক ম্যাগাজিন পড়ে ব্যবস্থা করে দিল বছরে চার কিলো ওজন কমানোর। খুব সহজ অঙ্ক, আপনি শিখে নিতে পারেন।"

ঢেকো বোস সঙ্গে সঙ্গে টি শার্টের বুকপকেট থেকে নোটবই বার করলেন। যে টি শার্টে বুক পকেট নেই তা মিস্টার বোস পরেন না। "বলুন, আপনার ম্যাডামের ভার লাঘবের ম্যাজিক ফর্মুলাটা!"

ভদ্রলোক খুবই উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "তিনটে জিনিস নির্দভাবে কমিয়ে দিলেন ম্যাডাম। শুনে রাখুন, দৈনিক এক স্লাইস পাঁউরুটি কম খেলে একবছরে দেড় কেজি ওজন রিডাকশন। দৈনিক দু'চামচ চিনি কম খেলে শরীর ঢেকে আরও দেড় কেজি ওজন উধাও। সেইসঙ্গে সপ্তাহে মাত্র দশখানা আলুভাজা কম খেলে বছরে সাতশ গ্রাম সাশ্রয়।"

"ওয়ান্ডারফুল! পরের সংখ্যাতেই এটা বক্সের মধ্যে যাচ্ছে। এটা দুমুখো ফর্মুলা, আমাদের অবসরিকায় বেশির ভাগ সভ্যই রোগা। যাঁরা মোটা হতে চান তাঁরা মাইনাসকে প্লাস করলেই বছরে চার কেজি গুরুত্ব

লাভ করতে পারবেন।"

ঢেকো বোস এই মুহূর্তে বিশেষ উৎসাহ বোধ করছেন। নোটবই আবার পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, "বুড়োদের মধ্যে শুধু হতাশার খবর, সুতরাং ভয় দেখানো স্বাস্থ্যের বাড়তি খবর দিয়ে লাভ নেই।"

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অ্যানাউন্স করেছেন, বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমাদের নয়, অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ, ওইটাই আমাদের ন্যাশানাল পলিসি।"

সুরেন সরকার এবার বললেন, : "আমি মশাই বহুদিন কলকাতা ছাড়া—আবার কোনোক্রমে নিজের দেশে ফিরে এসেছি। রবীন্দ্রনাথ টেগোর কি এই কবিতা আশিবছরে পা দিয়ে লিখেছিলেন?"

"জানি না মশাই, বুড়োবয়সে কবিগুরু এই স্টেটমেন্ট প্রত্যাহার করেছেন বলে তো শুনিনি, করলে রবীন্দ্র রসজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ অমিতাভ চৌধুরীমশাই নিশ্চয় কোথাও আর্টিকেল লিখতেন।" ঢেকো বোস যে চৌধুরীমশায়ের সুপরিচিত তা আমরা সবাই জানি।

"বৈরাগ্য, মুক্তি, ভক্তি এসব তো বার্ধক্যের অলঙ্কার, এসব তো সংসারের পি সি চন্দ্র, বি সরকার থেকে সংগ্রহ করতেই হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু রোমান্স, একটু রসরসিকতা, একটু হাল্কা হাল্কা ভাবও তো প্রয়োজন।"

ঢেকো বোসের কথা শুনে নবাগত মিস্টার সুরেন সরকার কিছুটা সাহস পেলেন। বললেন, "মারাঠি ভাষাটা মোটামুটি রপ্ত করেছি পুনেতে থেকে। গৃহিণীর ফেভারিট কাগজে সেবার একটা সংবাদ দেখেছি। প্রয়োজন ব্যবহার করতে পারেন। অ্যানাটমির খবর।"

"বলুন, বলুন," সাহস যোগাচ্ছেন ঢেকো বোস। "বকে যাওয়ার বয়স তো পেরিয়ে গিয়েছে আমাদের।"

হাঁটতে-হাঁটতেই অবসরিকার সাম্প্রতিক সভ্য সুরেন সরকার বললেন, "মেয়েদের বামস্তন ডানদিকের থেকে একটু বড় হয়। সাধারণত।"

নগেন চৌধুরী কোনও মন্তব্য করছেন না। কিন্তু কপট বিস্ময় দেখালেন

ঢেকো বোস। বিয়ের ফর্টিইয়ারস্ পরেও ব্যাপারটা যে তাঁর জানা নেই তা অকপটে স্বীকার করছেন আমাদের পত্রিকার মাননীয় সম্পাদক। বাড়িতে গিয়েও যে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করবেন সে পরিস্থিতিও নেই। রুটিবেলার বেলুন একবার ছুড়ে মেরেছিলেন ঢেকো গৃহিণী। অল্পের জন্য স্বামীর প্রাণরক্ষা হয়েছিল। স্ত্রীর হাতে মার খেয়ে হাড়গোড় ভাঙলেও পুলিশ কেস হয় না, থানার ওসি ফিক করে হেসে বলে, বাড়ি যান মশাই। আমাদের হাজার হাঙ্গামা, কমবয়সী বধূদের কেরোসিনের আগুন থেকে দূরে রাখতে গিয়েই থানার অফিসারদের হাড়ে দুব্বো গজিয়ে যাচ্ছে। এরপর যত রাজ্যের বুড়োকে বউদিদের হাত থেকে প্রোটেকশন দিতে গিয়ে হাড়ে ধান গাছ জন্মাবে মশাই।"

বাড়ি ফেরার পথে ফুটপাথ থেকে কিছু তরি তরকারি কিনছিলাম।

"আরে মিস্টার বিশ্বাস না?" সুরেন সরকার মশাই পকেট থেকে একটা পাতলা প্লাস্টিক ব্যাগ বার করে বাজার শুরু করেছেন।

আমি দুঃখ করলাম, "ধাপে ধাপে সবজির দাম বেড়ে চলেছে। এই শহরে যা একবার উপরে উঠে যায় তা তা কখনও নামে না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বাজে কথা—কিছুই এযুগে নেমে আসে না।"

সুরেন সরকার মন দিয়ে শুনছেন আমার কথা। আমি দুঃখ করলাম, "আপনি নতুন এসেছেন, নজর রাখলে দেখবেন একই উচ্ছে, একই পটল, একই কপির চারজায়গায় চাররকম দাম। সবচেয়ে বেশি এই ফুটপাথে, কারণ এরা জানে, বুড়োদের হেঁটে বেশিদূরে যাবার ক্ষমতা নেই, তাই পাঁচ টাকার জিনিস সাত টাকায় বিক্রি করে মনের সুখে।"

আমি ভাবছিলাম, নগেন চৌধুরীকে প্রস্তাব দেবো, অবসরিকার সভ্যদের বাজার একসঙ্গে করা হোক, সম্ভব হলে হোলসেল কেনা হবে কোলে মার্কেট থেকে পাইকারি রেটে। নগেন চৌধুরী অবশ্য আরও একপা এগিয়ে গেলেন। এক জায়গায় রেঁধে, সভ্যদের মধ্যে ঐচ্ছিক টিফিন কেরিয়ার সার্ভিস চালু করতে তিনি বেজায় উৎসাহী।

সুরেন সরকার ফিসফিস করে উল্টোগীত গাইলেন। বললেন "আমার স্ত্রী বলছিলেন, কলকাতায় শাক্‌সবজির জলের দাম। পুনেয় উচ্ছে পটল কিনতে গেলে মাথা ঘুরে যায়।"

"পুনেয় মানুষের হাতে কাঁচা টাকা আছে সরকার মশাই—হুড়হুড় করে কলকারখানা আপিস বাড়ছে, লোকের কাজের অভাব নেই।"

সুরেন সরকার বললেন, "সব সত্যি কথা, কিন্তু কলকাতা ইজ কলকাতা। কলকাতা না ছাড়লে কলকাতার মাহাত্ম্য বোঝা যায় না।"

কলকাতা ছাড়ার সৌভাগ্য এই অধমের হয়নি। সুরেন সরকার এবার বললেন, "আমার স্ত্রী ভেজিটারিয়ান, কিন্তু ডিভোটি অফ মাদার কালী! ও বলছিল, মাদার কালীর শহর এই কলকাতা, গডেরা এখানে একটু স্যাক্রিফাইস তো চাইবেনই।"

হাল্কা বাজারের থলি হাতে আমরা দু'জনে পথ দিয়ে হাঁটছি। কমবয়সে যখন বাজার করতাম তখন ডেলি বাজারের ওজন হয়ে যেতো তেরো চোদ্দ কেজি, এখন সেই ওজন বইতে গেলে নিশ্চিত হার্ট ফেল হতো। এখন সব গ্রামের হিসেবে, মাত্র পাঁচশগ্রাম মাল প্লাস্টিক মুড়ে বাড়ি নিয়ে গেলেই হলো।

সুরেন সরকার বললেন, "আমার স্ত্রী বলছেন, চমৎকার শহর এই কলকাতা, ভেজিটেবল পর্যন্ত কাটা অবস্থায় প্যাকেটে পাওয়া যাচ্ছে, সবজি কাটবার জন্যে দোকানিকে কোনও বাড়তি চার্জ দিতে হচ্ছে না। পুনেতে এসব ভাবা যায় না। আর শুনে রাখুন, ওখানে পটল খায় খু-উ-ব বড়লোকরা, ভীষণ দাম। যা কিছু ভাল জিনিস সব পশ্চিম ভারত থেকে সোজা মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে চলে যাচ্ছে।"

বুঝছি, সরকাব দম্পতি নতুন প্রেমে পড়েছেন এই শহরের। বলছেন, "এখানে সব কিছু ফ্রেন্ডলি, মানুষ এখনও আর একটা মানুষকে ভালবাসে, পরস্পরকে হেল্‌প করতে চায়।" পুনেতে যা বাড়ি ভাড়া তার অর্ধেকও এখানে দিচ্ছেন না মিস্টার সুরেন সরকার।

এই মানসিকতা আমার মন্দ লাগছে না। সব লোক একজোটে আমাদের

শহরের নিন্দে শুরু করলে কেমন করে চলে। "মহারাষ্ট্রিয়ানরা ভীষণ প্রাউড্ জাত—ওদের হিরোদের কেউ নিন্দে করে দেখুক না, হুলস্থূল বেধে যাবে।"

"আর এখানে মশাই, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর নামে নোংরা কথা বানিয়ে-বানিয়ে রটিয়েও লোকে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

সুরেন সরকার এইসব বিতর্কে জড়াতে চান না। তাঁর মতে "ক্যালকাটা ইজ এ গ্রেট সিটি। এটা এখানকার সবাই মনে মনে জানে। তবে তার জন্যে হামবড়া ভাব দেখায় না, এটাই এই শহরের সিটিজানদের স্বভাবিক বিনয়।"

মিস্টার সুরেন সরকার হাঁটতে হাঁটতে কী যেন ভাবছেন। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কোন্ কলেজে পড়তেন মিস্টার বিশ্বাস?"

কলেজের নাম বলতেই, সুরেন সরকার সানন্দে চিৎকার করে উঠলেন, "তাই বলি! মুখটা কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে!"

দেখা যাচ্ছে, বহুবছর আগে আমরা দু'জনেই একই বছরে একই কলেজে পড়েছি, তবে একজন সায়েন্স, আর আমি অন্য লাইনে।

"আমার স্ত্রীকেও হয়তো চিনতে পারবেন। সে আমাদের সঙ্গে পড়তো। উপাসনা।"

"উপাসনা! মনে রাখবার মতন নাম। অবশ্যই মনে পড়ছে। যদি কিছু মনে না করেন, এই উপাসনাকে দেখেই আমাদের ক্লাসের এক ছেলে একটা কবিতা লিখেছিল।"

তারপর অবশ্য কী হয়েছিল তা খোঁজ করবার অবকাশ পাননি সুরেন সরকার। সোজা চলে গিয়েছিলেন বাঙ্গালোরে। তারপর সুযোগের ধাক্কা খেতে খেতে একসময় পুনে। অথচ কোনওদিন কলকাতা ছেড়ে যাবার সাধ ছিল না সুরেন সরকারের।

এতদিন পরেও সুযোগ্যা জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনের জন্যে সহপাঠীদের কাছ থেকে পর্যন্ত অভিনন্দন পাচ্ছি জানলে উপাসনা নিশ্চয় খুব খুশি হবে। মনে হচ্ছে, উপাসনার তখনকার মুখটা সরকারমশাই চোখের সামনে

দেখতে পাচ্ছেন। বললেন, "কংগ্রাচুলেশন। আমার বন্ধুটি তো উপাসনা বলতে পাগল ছিল। একবার আমার সঙ্গে মুম্বাইতে দেখা হয়েছিল। প্রেমে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মনের দুঃখে এন আর আই হয়ে গিয়েছে। এখন মস্ত চাকরি; অনেক টাকাকড়ি এবং সম্পত্তি।"

এইসব কথা উপাসনাকে আমি অবশ্যই বলবো। এতো যুগ পরে নিশ্চয় শুনতে ভাল লাগবে। আমার নিজেরই ভীষণ ভাল লাগছে।

সুরেন সরকার বললেন, "আমার স্ত্রী মহারাষ্ট্রিয়ান। কারও কথা না মেনে বাঙালি বিয়ে করলেন। আমরা হ্যাপি। ভীষণ হ্যাপি, মিস্টার বিশ্বাস।"

ঊষাকিরণ জানে যে স্বামী সুরেন সরকারের একটাই অপূর্ণ সাধ আছে। জীবনের সায়াহ্নবেলায় তিনি জন্মভূমি কলকাতায় ফিরে আসতে আগ্রহী। অন্য মেয়ে হলে ভয় পেতো, বাধা দিতো। কিন্তু ঊষাকিরণ সে পথের পথিক নয়। সে একদিন সুরেনকে জিজ্ঞেস করলো, কলকাতায় ঘর বাঁধলে সুখী হবে?

"আমি বললাম, অনেকদিন অনেক পথ ঘুরেছি, ঊষা। এখন কেন জানি না, জন্মভূমি আমাকে টানছে। বেঙ্গলকে কেউ নিন্দে করলে আমার গায়ে কালশিরে পড়ে যায়। দেশের নিন্দে আমি সহ্য করতে পারি না। কত যুগের পুণ্যসঞ্চয় করলে তবে বাঙালি হয়ে জন্ম নেওয়া যায়। বলুন তো। সেই কবে সত্যেন দত্ত কীসব লিখে গিয়েছেন, কত কিছু ভুলে গিয়েছি, কিন্তু প্রবাসে আমি আমরা কবিতার লাইনগুলো কতবার যে আবৃত্তি করেছি। আপনি ভাবছেন, আমার মারাঠি স্ত্রী কি ভেবেছে? সি ইজ এ জেম অফ এ পার্সন, ঊষাকিরণ কোনওদিন আমার সেন্টিমেন্টে ব্যাঘাত দেয়নি।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি সুরেন সরকারকে।

সুরেন বললেন, "সে এক মস্ত গল্প। আপনি কলেজ ফ্রেন্ড, আবার আমাদের যৌবনের গ্ল্যামার গার্ল উপাসনার প্রেসাস হাজবেন্ড। ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়াতে লোকে স্বামীর গুরুত্ব বুঝে আদর করে বলে 'মূল্যবান' স্বামী।"

আমি নিঃশব্দে সুরেন সরকারের সঙ্গে পথ ধরে হাঁটছি। সুরেন বললেন,

"এই ধুতিপাঞ্জাবি পরাটা আমাকে নতুনভাবে শিখতে হবে। শুনেছি, সাউথ ক্যালকাটায় চমৎকার রেডিমেড্ পাঞ্জাবি আর জামাই-সুখ ধুতি কোঁচানো অবস্থায় বিক্রি হয়। অথচ লোকে বাইরে গিয়ে দুর্নাম দেয়, বাঙালিরা তাদের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে। ঊষাকিরণ নিজেও ঘুরে ঘুরে দেখছে, সে তো বাঙালি মেয়েদের দেখে মুগ্ধ!"

মোদ্দা কথাটা হলো, বহু পথ পেরিয়ে, প্রবাসের কর্মজীবন সমাপ্ত করে সুরেন সরকার দেশে ফিরে এসেছেন।

সুরেন বললেন, "বন্ধুরা কলেজে আমাকে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বলে ইয়ার্কি করতো, এখন দেখলে বুঝবে শ্রীসুরেনই ব্যাক টু বেঙ্গল।" ইচ্ছে করলে তারা এখন আমাকে স্যার সারেন্ডার নট বলে ডাকতে পারে।

পুনেতে পৃথিবীর কত মানুষ কর্মজীবনের অবসানে অবসর যাপনের স্বপ্ন দেখে। সুরেন সরকার ও উষাকিরণের কলকাতায় ফেরার পাকা সিদ্ধান্ত নিতে আর একটু সময় লাগতো, কিন্তু একবার স্ত্রী ঊষাকিরণ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হাসপাতালের চিকিৎসাপর্ব শেষ করে ঊষাকিরণ যখন বাড়ি ফিরলেন তখন সুরেন সরকারের সিদ্ধান্ত দ্রুততর হলো। ওঁর কেমন ধারণা হলো, বাংলার বায়ুতে বাংলার স্নেহপ্রশ্রয়ে ঊষাকিরণ আরও দ্রুত সুস্থজীবনে ফিরে আসতে পারবেন।

সরকার দম্পতির সমস্ত খবর এখনই সংগ্রহ করার জন্য আমি ব্যস্ত নই, কলেজের পুরনো সহপাঠী যখন এতো কাছে চলে এসেছেন এবং আমাদের হাতে যখন অঢেল সময় আছে তখন বিস্তারিত সংবাদের আদান প্রদান যথাসময়েই করা যাবে।

আজ অনেকদিন পরে আমাদের ফ্ল্যাটে ডাক পিওনের পদধূলি পড়ল। খোদ শ্রীবলরাম বিশ্বাস বি-এ-র নামাঙ্কিত একটি রেজিস্ট্রি কভার উপস্থিত হয়েছে। কোনও কোনও ডাকপিওন খামের ভিতরে কী আছে তার গন্ধ পায়। এই পিওনও গৃহকর্তার কাছে কিছু প্রত্যাশা করছে। উপাসনা ছোটখাট সংঘাত এড়িয়ে চলতে চায়। আমি কিছু বলবার আগেই দশটা টাকা সে হাতছাড়া করল।

অফিস থেকে পাঠানো হিসেব নিকেষের খাম খুলে আমি খুঁটিয়ে পাওনাগণ্ডার হিসেব করতে বসলাম। শুরুতেই মাইনাস টেন, তবু বললাম, "উপাসনা, অবশেষে লাখপতি হওয়া গেলো।"

লাখটাকা যে কত টাকা তা সে যুগের গরিব চাষিদের ধারণার বাইরে ছিল। লাখ টাকার আকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় অনেক ভেবেচিন্তে সে যুগের একজন কপর্দকহীন চাষি বলেছিল, তিন কুড়ি দশটশ কিছু একটা হবে!

দরিদ্রের লাখটাকা সম্পর্কে ধারণা নিয়ে একসময় আমরা অনেক হাসাহাসি করেছি। কিন্তু একসময় লাখপতিযাদেব যথেষ্ট সম্মান ছিল পবিত্র এই বঙ্গভূমে। সেযুগের বাংলা উপন্যাসে 'লক্ষপতি' বলতে বোঝাতো প্রচণ্ড ধনী, এমন মানুষ যার সম্পদের সীমা নেই। তারপর আমাদের চোখের সামনে মুদ্রাস্ফীতির দৌলতে, বাংলা উপন্যাসের ধনপতিরা 'ক্রোড়পতি' হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন। এখন, অবস্থা আরও সঙ্গিন। ক্রোড়পতি বললেও আগের যুগের লাখপতির ধারেকাছে আসা যায় না।

শতসহস্র নমস্কার তাঁদের, যাঁরা সোনার বাংলাকে এই অবস্থায় টেনে এনেছেন। শক হুন পাঠান মোগল ইংরেজ ফরাসি এঁদের আমরা দোষ দিই,

কিন্তু বঙ্গলক্ষ্মীর এমন অবমূল্যায়ন তাঁরাও ঘটাতে সমর্থ হননি। অর্থের অবমূল্যায়নের এই কৃতিত্ব স্বাধীন ভারতের জনগণমন অধিনায়কদের।

অফিস থেকে পাঠানো খামখানা হাতে নিয়ে ভাবছি, যাঁদের হস্তস্পর্শে সোনাও মাটি হয়ে গেল এঁরা কারা? এঁদের স্বরূপ আমরা কবে বুঝতে পারব? আমরা কবে এঁদের নিন্দায় মুখর হব?

আন্দাজ করছি, কোথাও একটা সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক ষড়যন্ত্রের জাল ছড়ানো হয়েছিল, তাই বিনা অপরাধে বঞ্চিত হবার ব্যাপারটা বুঝতে, এবং খোঁজখবর করতে বহু সময় লেগে যাচ্ছে। অদৃশ্য আসামির খোঁজ যখন পাওয়া যাবে তখন এদেশের বৃদ্ধদের চিৎকার করার, প্রতিবাদ করার শারীরিক শক্তি থাকবে না।

উপাসনা নিজেও কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "লোকে কেন মুদ্রাস্ফীতি বলে? আসলে তো মুদ্রা তার শক্তি হারিয়ে ক্রমশ কুঁচকে যাচ্ছে?"

আমি বলেছিলাম, "টাকা বাড়লে কেনার ক্ষমতা কমে যায়, উপাসনা। বইতে ওইরকম লেখা আছে, অমর্ত্য সেনটেন কেউই ওই শব্দে আপত্তি তোলেননি।

বুদ্ধিমতী উপাসনা কিন্তু সন্তুষ্ট নয়। "তা হলে তো বড়লোকদের যত টাকা বাড়বে তারা তত গরিব হয়ে যাবে। তা তো হয় না।"

উপাসনার যুক্তির মধ্যে নিশ্চয় কোনও ফাঁক আছে, কিন্তু আমি সবসময় সেই ফুটো খুঁজে পাই না। টাকাকড়ির ব্যাপারে নিজের গৃহিণী যা মন্তব্য করেন গৃহস্বামীর কাছে তার গুরুত্ব যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরের মতামতের থেকে বেশি মূল্যবান তা কলকাতার রিটায়ার্ড মহলে কে না জানে?

গুড্‌হাউস কোম্পানির ধাওয়ান সায়েব খুবই সাবধানী লোক। রিপন স্ট্রিট থেকে ঝকঝকে লেটার হেডে বলরাম বিশ্বাসকে যে চিঠি লিখেছেন সেখানে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ইন ফুল অ্যান্ড ফাইনাল স্যাটিশফ্যাকশন। অর্থাৎ এই চেকটি নেবার পরে স্বেচ্ছা-অবসর নেওয়া বলরামের আর রা কাটা চলবে না।

এবার আমার একটু রাগ হচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে কর্তাদের জিজ্ঞেস করি, ফুল এবং ফাইনাল না হয় বুঝলাম, তোমার হিসেবে যা পাওনাগণ্ডা হয় তা তুমি মিটিয়ে দিচ্ছ কড়ায় গণ্ডায়, তুমি ট্যাঁড়া পিটিয়ে দিচ্ছ বলরাম বিশ্বাসের এরপর টাকাকড়ি নিয়ে ট্যাঁ ফুঁ করার এক্তিয়ার থাকবে না। অল্ রাইট—তুমি কোম্পানিব কর্তা, হিসেবের অধীশ্বর এই ধরনের ফতোয়া জারি করার ক্ষমতা অবশ্যই তোমার আছে। কিন্তু মিস্টার ধাওয়ান, আপনার ওই শেষ শব্দটাতে আমার প্রবল আপত্তি। আমার কাছে অভিধান আছে, ইংলিশ টু বেঙ্গলি বাই আশুতোষ দেব, সেখানে একবার স্যাটিশফ্যাকশন শব্দটার অর্থ যাচাই করা যাক। ওই ইংরেজি শব্দটার আভিধানিক অর্থ তো সন্তোষ। আমার সন্তুষ্টি না হলেও তুমি একতরফা ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছ বলরাম বিশ্বাসের স্যাটিশফ্যাকশন হয়েছে। এই অধিকার তোমায় কে দিয়েছে?

একখানা চিঠি কোম্পানিকে লিখলে কেমন হয়? কোনো ফল হবে না। বড়জোর চিঠিখানা কোম্পানির সলিসিটরের কাছে চলে যাবে, তারপর অ্যাটর্নি এমনভাবে উত্তরের বয়ান লিখে দেবে যেন বিশ্বসংসারের সব ভুল ও সব দোষ বলরাম বিশ্বাস নামক প্রাক্তন কর্মচারীর। নিজের পাওনাগণ্ডা যদি তুমি বুঝে নিতে অপারগ হও তা হলে হোয়াট ক্যান গুড্‌হাউস কোম্পানি ডু?

অর্থাৎ, বল মা তারা দাঁড়াই কোথা? ভুলে যাও স্ত্রীশরীরের মান অভিমান। বছরের পর বছর রিপন স্ট্রিটের ঘানি টেনে রেজিস্ট্রি ডাকে একখানা ছয় অঙ্কের চেক পেয়েছো, এটা কম কথা নয়।

ওই যে ঠাকুর বলেছেন, আনন্দ করো। ওই যে মা ঠাকরুণ বলেছেন, যদি শান্তি চাও তাহলে অপরের দোষ দেখো না। ওইটাই বিশ্বসংসারের শেষ কথা বলে মেনে নাও। অন্য আর কোনও পথ নেই বলরাম বিশ্বাস। পৃথিবীর যত দুঃখ যত বঞ্চনা আছে সব নতমস্তকে মেনে নাও বৎস।

"কী হলো তোমার?" একটু উদ্বিগ্নভাবেই প্রশ্ন করছে উপাসনা। এতক্ষণ চিঠির ব্যাপারটা কিছু বলা হয়নি ওকে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "উপাসনা, আমার চেকটা রিপন স্ট্রিট থেকে এসে গিয়েছে। জানো উপাসনা, অনেক কোম্পানিতে এইসব হিসেবপত্তর ফাইনাল হতে অঢেল সময় লেগে যায়, স্কুলের মাস্টারমশাইরা তো অনেক সময় নিজের জীবনে এইসব হিসেবপত্তর দেখে যাবার চান্স পান না। আমাদের কোম্পানি সেদিক থেকে ভাল।"

উপাসনা শান্তভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর স্নিগ্ধ দৃষ্টি আমাকেও শান্ত করছে। অকারণে উত্তেজিত হয়ে বিশ্বসংসারে কোনো লাভ নেই।

শুভস্য শীঘ্রম্। যত তাড়াতাড়ি চেকটা ভাঙানো হয় ততোই মঙ্গল। নবীন উদ্যমে ছুটলাম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের দিকে। এতোদিন হাঁড়িতে কিছুই সঞ্চিত থাকতো না, ব্যাঙ্কের বাবু এই অ্যাকাউন্ট হোলডারকে খাতির করবার কারণ খুঁজে পেতেন না। আজ জমা নেওয়ার কাউন্টারে বলরাম বিশ্বাসের নামাঙ্কিত চেকটা দেখেই ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন।

অন্যপক্ষ কোশ্চেন করার আগেই নিজের উত্তর দেওয়াটা ভাল। শান্তভাবে আমি ঘোষণা করলাম "চাকরি থেকে রিটায়ার করলাম।" যেন ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত।

ব্যাঙ্কের বাবু আমার উষ্ণ প্রচেষ্টায় এক ঘটি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলেন। তাঁর মন্তব্য ও প্রশ্ন :"ভি-আর-এস নিলেন?"

এবার ভীষণ অপমানিত মনে হচ্ছে, কিন্তু অকারণে। একান্ত ভাবটা দেখালাম, "কোনোরকম জোর-জবরদস্তি ছিল না।" অনেকে তো ইচ্ছে করেও অসময়ে দাসত্ব থেকে মুক্তি নিতে ভালবাসে।

লোকটা বুঝতে পারছে না, এই একটা চেকের ওপর নির্ভর করে আমাকে এবং উপসনাকে বাকি জীবন চালাতে হবে। আমি তোমাকে বাড়তি কোনও খবর দিচ্ছি না, তুমি যা আন্দাজ করার করে নাও।

ব্যাঙ্কের লোকটা বলছে, "অনেক কোম্পানি ইনস্টলমেন্টে ভি আর এস মাঝে মাঝে পে করছে।"

আমার কিন্তু আর চেক আসছে না। ফুল অ্যান্ড ফাইনাল স্যাটিসফ্যাকশন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে খবর আমি দুনিয়ার লোকের কাছে কেন অ্যানাউন্স করবো? বলরাম বিশ্বাস, জুনিয়র অফিসারের কর্মজীবনটা যে ব্যর্থ হয়েছে তা বিশ্বসংসারের সবাইকে কেন জানাতে হবে?

ভাঁড়ে-মা-ভবানী অ্যাকাউন্ট বলে যাকে এতোদিন খাতির করোনি তাকেই আজকে আদর করে ডাকা হচ্ছে কাউন্টারের ভিতর। ব্যাঙ্কের সেজবাবুর সবিনয় নিবেদন, এই ব্যাঙ্কেরই ভাল ভাল প্ল্যান রয়েছে সঞ্চয়ের। বাড়িতে বসে বসে লাইফ এনজয় করুন। ফিক্সড ডিপোজিটের সুদ অটোম্যাটিক অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাবে। খুবই আকর্ষণীয় সুদের হার।

বাড়িতে বসতে মন চায় না। মাসে এক-আধবার ব্যাঙ্কে আসতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু ব্যাঙ্কার এখনও বিনয়ে বিগলিত। তিনি বলছেন, "অবসর নিলেই যে ব্যস্ততা কমে তা নয়। আপনাদের মূল্যবান সময় ব্যাঙ্কে ছোটাছুটি করে নষ্টব জন্যে নয়।"

ব্যাঙ্কের লোকরা কয়েকদিন সময় নিয়েছে চেকের অঙ্কটা আমার সেভিংস অ্যাকাউন্টে তুলতে। দুটো ছুটি ও একটা বেবি-বন্ধ পড়ে গিয়েছিল মধ্যিখানে। এমনিই সব কিছু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—এর ওপর আবার ফুল বন্ধ এবং বেবি-বন্ধ কেন রে বাবা? কমরেড্স দেশীভাইগণ, দয়া করে এইভাবে দেশটার বারোটা বাজাবেন না। এইভাবে এখানে এই পোড়া দেশে বন্ধ করার মতন কিছুই থাকবে না। আপনারা অবহিত হোন।

নগেন চৌধুরীর সঙ্গে ও ইতিমধ্যে দেখা হয়েছে। তিনি বলেছেন,

"বিশ্বাসমশাই, এমনভাবে টাকাটা লাগান যাতে আপনার প্রাপ্য সুদটা হায়েস্ট হয়। সুদ ছাড়া অবসরিকার মেম্বারদের আর কিছুই তো নেই।"

নগেনবাবু আরও বলেছেন, অঙ্ক কষুন, "সুদের পরিমাণটা হিসেব করে নিন, মাসে মাসে কত সুদ আসছে তা আপনি হিসেব করে নিন, তারপর নিজের সংসার খরচের বাজেট ফাইনাল করুন। মনে রাখতে হবে, আসলে হাত পড়লেই সামনে বিপদ। আপনি যখনই আসল ওঠাচ্ছেন তখনই নিজের গোলে নিজে বল মারছেন।"

সুরেন সরকার সস্ত্রীক গড়িয়াহাটায় বাংলা পাঞ্জাবির সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। সুরেন সরকার আজও খুব খুশি। বললেন, "কে বলে ওয়েস্ট বেঙ্গলের উন্নতি হচ্ছে না? এই ক'বছরে পাঞ্জাবির ডিজাইনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। আর একটা ভাল জিনিস, ইস্ট-ওয়েস্টের মিলন ঘটিয়েছে রুচিবান বাঙালিরা, এখন প্যান্টের সঙ্গে পাঞ্জাবি চমৎকার চলছে। এই পাতলুন জিনিসটা কিন্তু আমার ওয়াইফ ঊষা পছন্দ করে না।"

রাস্তায় সরকার দম্পতিকে দেখেই আর এক ভদ্রলোক ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লেন। সুরেন সরকার পরিচয় করিয়ে দিলেন, "আমাদের গাঁয়ের ছেলে। জাস্ট লাইক এ ফ্যামিলি মেম্বার। আমাকে সব ব্যাপারে সাহায্য করছে। এই রকম হেল্প আজকাল কোনও জায়গায় কেউ করে না।"

এই ভদ্রলোকের বয়স বত্রিশ তেত্রিশ। সে বললো, "সুরেন কাকা, আমি কাকিমাকে নিয়ে এগোচ্ছি, আপনি গল্প করতে করতে আসুন। আপনাদের জন্যে দেশ থেকে একটু ছানা আনিয়েছি।"

সুরেন সরকারের চোখ বড় হয়ে উঠলো, "দত্তপুকুরের ছানা, ওয়ার্ল্ডের বেস্ট মশাই। এই ইয়ংম্যানটির দয়ায় আমাদের কোনও সাধ আহ্লাদ বাকি থাকছে না। রানাঘাটের পান্তুয়া, শক্তিগড়ের ল্যাংচা, জনায়ের মনোহরা, কেষ্টনগরের সরভাজা—একের পর এক অরিজিন্যাল আইটেম এতো বছর পরে প্রাণভরে আস্বাদ করছি। ভাগ্যক্রমে আমার সুগার প্রবলেম নেই, সুতরাং মধুর রস থেকে স্বেচ্ছা বঞ্চিত হবার কোনো তাগিদ নেই।"

এরপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সুরেন সরকার বললেন, "এগোতে হবে

একটু। আমার মিসেসকে আজ রাতুল নিয়ে যাচ্ছে নিজের বাড়িতে। বাঙালি জয়েন্ট ফ্যামিলিতে ঊষা কখনও রাত্রিবাস করেনি। যৌথ পরিবার সম্পর্কে ওর খুব কৌতূহল। আমিও যাচ্ছি সঙ্গে, না হলে সব কিছু ওরা ব্যাখ্যা করতে পারবে না। অনেক ব্যাপারে বাঙালিদের সঙ্গে মহারাষ্ট্রিয়ানদের মিল আছে। দুটোই মস্ত কালচার মশাই।"

রাতের ঘুমটায় মাঝে-মাঝে বাধা পড়ে। শেষ প্রহরে সেই যে ঘুম ভাঙল আর চোখ বুজবার উপায় নেই। জানি এই বয়সে ঘুমের তেমন প্রয়োজন নেই। মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে এই দেশ চালানোর দুঃসাহস দেখিয়েছেন কেউ কেউ। কিন্তু বাইরের চিন্তা আর ভিতরের দুশ্চিন্তা বোধহয় এক জিনিস নয়। দেশের ক্ষতি হলে অবশ্যই খারাপ লাগে, কিন্তু নিজের আর্থিক সমস্যা থাকলে মানুষ ভিতর থেকে ভেঙে পড়ে।

ভোরবেলাতে ঈশ্বরচিন্তা না করে আমি মনে মনে সুদের অঙ্ক কষে যাচ্ছি। ব্যাঙ্কে যে চেক জমা পড়েছে তার কতটা স্বল্প সঞ্চয়ের কোন স্কিমে কত দিন রাখলে বছরে কত পাবো তা মনে মনে কষে নিয়ে, তারপর হিসেব করো প্রতি মাসের পয়লা তারিখে কত ব্যাঙ্কে কত জমা হচ্ছে। এই টাকার কতটা ব্যাঙ্কের সুদের নিয়ম ভঙ্গ না করে আমি নগদে তুলে আনতে পারছি? সব টাকা কি আমি কয়েক বছরের জন্যে বিনিয়োগ করব? এই ধরনের বিনিয়োগের যুক্তি আছে, সুদের হার ও পরিমাণ বাড়বে। কিন্তু হঠাৎ যদি উপাসনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হয়? ডাক্তাররা ধারে রুগি দেখায় বিশ্বাস করেন না, তাঁরা সুদও চার্জ করতে পারেন না। নার্সিং হোম তো আরও এক পা এগিয়ে। আসল টাকা না দিলে তাঁরা নড়েচড়ে বসেন না।

প্রথম কয়েক রাত ভেবেছিলাম, সুদ ঘুমকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর এক আশঙ্কাজনক অনুভূতি—ঘুমও কি সুদকে তাড়িয়ে দেয়?

আমি শুয়ে শুয়ে মনে মনে সুদের অঙ্কগুলো কষছি, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সব ভুলে যাচ্ছি। আগে স্মৃতির কনভেয়র বেল্ট বেয়ে কী সুন্দর তারা একের পর আসতো, রিপন স্ট্রিটে কোম্পানির দেয় কত সুদের হিসেব তো

বিনা কষ্টে করেছি। এখন কী যে হলো?

একবার মনে হলো, একটি মুখার্জি বালিকাকে অর্ধাঙ্গিনী করে কায়স্থ আমিও কি অর্ধেক মুখার্জি হয়ে গেলাম জীবনের প্রান্তভাগে? আবার ভাবছি, কোনও কোনও ধর্মে কুসীদজীবী হওয়াকে হেয় করা হয়েছে, নিশ্চয়ই তার যথেষ্ট কারণ আছে।

আমি কয়েকবার নিজের বিস্মরণ কাটিয়ে ওঠাব ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। একবার মনে হলো, শুয়ে শুয়ে মস্তিষ্ককে এইভাবে পরিশ্রান্ত করাটা ঠিক হচ্ছে না। মস্তিষ্ক সবচেয়ে কর্মক্ষম বোধহয় বসা অবস্থায়, না হলে সেকালের মহাসাধকরা শুয়ে না থেকে বসা অবস্থায় তপস্যা করতেন কেন? আবার মনে হলো, উপবিষ্ট না থেকে দণ্ডায়মান অবস্থায়ও তো কাউকে তপস্যা করতে দেখিনি। এমনকী আইজ্যাক নিউটনও যখন গাছ থেকে আপেল ফল পড়তে দেখেছিলেন তখন তো তিনি দাঁড়িয়েছিলেন না, শুয়েছিলেন না, গাছের তলায় বসেছিলেন। অন্তত তাই তো আমার ধারণা।

অতএব আমি কাকভোরে বিছানায় বসে বসে মানসাঙ্ক (মানসিক অঙ্ক) শুরু করেছি।

ইস্কুলে এক মাস্টারমশাই এইভাবে আমাদের মুখে মুখে অঙ্ক কষাতেন, খাতায় লিখতে দিতেন না, বলতেন এতে বুদ্ধিতে এবং স্মৃতিতে শান দেওয়া হয়। এবার পুরনো যুগের একজন সায়েবের নাম মনে করতে চাইলাম, রিপন স্ট্রিট অফিসে বসে বসে তিনি বাঁ হাতে টপাটপ অঙ্ক কষতেন একটা নোট বইতে। কী আশ্চর্য, সায়েবের নামটা মনের মধ্যে একদম আসছে না, অথচ বুকের ভিতরের টিভি স্ক্রিনে সায়েবকে আমি সচল অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি।

আস্তে আস্তে আমার দুশ্চিন্তা বাড়ছে। আমি কি স্মৃতিভ্রংশ হতে চলেছি? সেদিন কাগজে অ্যালজাইমার রোগের কথাও পড়েছি, বুড়ো বয়সে এই রোগে মানুষ সব ভুলে যায়। আমি হাতের কাছাকাছি একটা বই তুলে নিলাম। ইতিমধ্যে সায়েবের নামটা মনে পড়ছে, মিস্টার ফাউলার। ভারি

গলায় চিৎকার করতেন বলে অনেকে আড়ালে এঁকে হাউলার বলে ডাকতো।

বই থেকে একটু ভরসা পাওয়া গেল। মারাত্মক অ্যালজাইমার রোগে ভুলে যাওয়া রোগীর কথা আর কখনও মনে পড়ে না। দেরিতে হলেও ফাউলারের কথা তো শেষপর্যন্ত আমার মনে পড়েছে। স্মৃতিভ্রংশে ভুলে যাওয়া কথা আবার মনে পড়ে।

আলো ফুটতেই আমি নগেন চৌধুরীর বাসায় হাজির হয়েছি। নগেন চৌধুরীর ফ্ল্যাটে তালা। হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরছি, পথে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নগেন চৌধুরী রাত্তিরটা রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গলের অপেক্ষাকক্ষে কাটিয়ে বাড়ি ফিরছেন। বললেন, নামে শিশুমঙ্গল, কিন্তু ওখানে বৃদ্ধমঙ্গলও যথেষ্ট হয়। আমাদের মিস্টার ভবেশ খাস্তগির হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। কখন কি হয় বলা যায় না "ওঁর ইচ্ছে আমি সঙ্গে থাকি।" নগেন চৌধুরী বললেন, "একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হলো। রাত্রে বেঞ্চিতে বসে থেকে মনে হলো, সবাইকে তো এই পৃথিবী থেকে একা যেতে হবে। তবু যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষ কেন আপনজন পরিবৃত হয়ে থাকতে চায়?"

এর উত্তর আমার জানা নেই। শুধু এইটুকু জানি, ভিড়ের মধ্যে থাকলে মানুষ একা হতে চায়, আর একলা থাকে মানুষ আসঙ্গপিয়াসী হয়ে ওঠে।

আমাদের নেতা নগেন চৌধুরীর অফুরন্ত প্রাণশক্তি বিপুল উৎসাহে আমাকে টানতে টানতে তাঁর বাড়ি নিয়ে এলেন। সারা রাত্রের কষ্ট ভুলে, চায়ের জল গরম করলেন। তারপর আমাকে বললেন, "বসুন, একটা ইমপর্টান্ট এক্সারসাইজ সেরে নিই।"

"আপনি আজকাল যোগব্যায়াম করেন নাকি?"

না, এ তো যোগব্যায়াম নয়! নগেন চৌধুরী দুটো চায়ের চামচ নিয়ে একসঙ্গে দু'হাতে দুটো কাপে চিনি নাড়তে লাগলেন। তারপর দুটো রবারের টেনিস বল নিয়ে দু'হাতে কিছুক্ষণ বাউন্স করতে লাগলেন।

কী ব্যাপার? খেয়ালী নগেন চৌধুরী কি এবার চাইনিজ জাগলারি শিখছেন?

নগেন চৌধুরী আমাকে বললেন, "বিশ্বাসমশাই, এখন থেকে সুযোগ পেলেই দুটো হাতকে একসঙ্গে সমানভাবে খাটাবেন। এই ধরুন ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে যখন কিছু ফেলবেন, তখন ঝুড়িটা একটু দূরে রাখবেন, তারপর দু'হাতে দুটো কাগজ পাকিয়ে একসঙ্গে বাস্কেটে ছুড়বেন।"

"এর অর্থ?" আমি জানতে চাই।

"বেকার ব্রেনকে একটু ফিজিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া! এই ডবল অ্যাকশন হচ্ছে স্মৃতির শারীরিক ব্যায়াম!"

"আমার তো একই সমস্যা। আমার স্মৃতি আজকাল প্রায়ই তোতলামি করে, আমার কথা শুনতে চায় না!"

নগেন চৌধুরী আশ্বাস দিলেন, "একেবারেই ঘাবড়াবেন না। বুড়ো বয়সের মাইনর ব্যারাম। কিন্তু নিরাময়ের জন্যে চমৎকার সব ব্যায়াম রয়েছে। কতকগুলো আপনাকে শিখিয়ে দিই, উপকার পাবেন,। সকালে বাথরুমে ঢুকে ডানহাতের পরিবর্তে বাঁ হাতে টুথব্রাশ করবেন—বাঁ দিকটাও তো আপনার, কেন আপনি তাকে কম খাটাবেন এবং বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেবেন? মেঝেতে কিছু জিনিসপত্তর ইচ্ছে করে ফেলে দিয়ে সেগুলো যথাসম্ভব বাঁ হাতে একে একে টেবিলে তুলে রাখবেন। এই ব্যায়াম দিনে কয়েকবার করবেন এবং মনে রাখবেন, শুধু শৌচ করবার জন্যে এবং ঘুষ গ্রহণের জন্যে আমাদের বাঁ হাতের সৃষ্টি হয়নি।"

মৃতদার নগেন চৌধুরী উৎসাহে এবং নিজেব চেষ্টায় প্রতিদিন কিছু না কিছু শিখছেন। আমাকে বললেন, "কয়েকটা টোটকা দিচ্ছি, বিস্মৃতি আপনার ধারেকাছে আসতে সাহস পাবে না। আমাদের শরীরের মতন স্মৃতিকেও একটু ছোটানো প্রয়োজন।" একটু থেমে নগেন চৌধুরী বললেন,

"আমার তো সে সুযোগ নেই, কিন্তু আপনার রয়েছে। বাড়িতে দেওয়াল আলমারি খুলে আপনি প্রেয়সী গৃহিণীর ঝোলানো শাড়িগুলো একনজরে দেখে নিন। তারপর ঝটপট আলমারি বন্ধ করে একটা কাগজ

নিয়ে স্মৃতি থেকে গিন্নির শাড়ির একটা লিস্টি বানান। স্মৃতি থেকে তালিকা তৈরি করতে কষ্ট হবে প্রথম দিকে, কিন্তু না ঘাবড়িয়ে চেষ্টা চালিয়ে যান, দেখবেন আপনার মাথার অকেজো সেলগুলো ক্রমশ হুঁশিয়ার হয়ে উঠছে। আমার বাড়িতে তো গিন্নির ওয়াড্রোব নেই, আমি দেওয়ালে পুরনো অফিসের দু'একটা গ্রুপ ফটোগ্রাফ টাঙিয়ে রেখেছি। একের পর এক কে দাঁড়িয়ে আছে, কে বসে আছে তা ছবির দিকে না তাকিয়ে কাগজে লিখে মিলিয়ে নিই। দেখছি বিস্মৃতি কমছে।"

উৎসাহী নগেন চৌধুরী বললেন, "ধরুন এই টুথ পিক। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিন। শুধু দাঁত খোঁটা ছাড়া খড়কের আরও পঁচিশটা ব্যবহার মাথা ঘামিয়ে ঘামিয়ে আবিষ্কার করুন এবং তা কাগজে লিখে ফেলুন। মাঝে মাঝে এইধরনের গেম তৈরি করুন—কখনও দাঁত খড়কে, কখনও চামচ, কখনও সেফটিপিন তারপর দেখুন বসে থাকা নিষ্কর্মা ব্রেনের মজা!"

"আর একটা ব্যায়াম আমি করি। নিজের বাড়িতে খুব ভাল করে দেখে নিন কোথায় কী রয়েছে। এবার চোখ বন্ধ করে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যেই হাঁটতে থাকুন এবং আন্দাজ করুন কোথায় কী রয়েছে, এবং আপনি কোন জিনিসটা পেরিয়ে চলেছেন।"

"নগেনবাবু, এতে স্মৃতিশক্তির উপকার হবে? এ তো খেলা নয়, ছোটখাট বিপ্লব!"

"উপকার হবে না মানে? আসলে সারাক্ষণ শুধু দেহকেই নয়, মনকেও নাড়াচাড়া দিতে হবে। জেনে রাখুন, মনের পেশীগুলোও খাটালে খুশি হয়, এইভাবে বুড়ো বয়সেও নতুন মস্তিষ্ককোষের জন্ম হতে পারে। এইসব করে আমি এখন ভীষণ ভাল আছি।" এই বলে নগেন চৌধুরী আবার দু হাতে দুটো চামচ দুটো কাপের মধ্যে একসঙ্গে নাড়তে লাগলেন।

তা হলে আমার আর চিন্তা কি? বাঁ হাতকে বুঝিয়ে দিয়েছি, লিখিত আবেদন করলেও সে ভি-আর-এস পাচ্ছে না। অতএব আমার ঝিমিয়ে থাকা মস্তিষ্কও মনিবের ইচ্ছা অনুযায়ী সারাক্ষণ সজাগ থাকতে বাধ্য। কয়েকজন মানুষের সঙ্গে দেখা হচ্ছে অবসরিকার মাধ্যমে, সুতরাং একা থাকার ভয় থেকেও মুক্তি হয়েছে কিছুটা। হে ঈশ্বর, দয়া করো, ভক্ত পানে চাহো। উপাসনাকে সুস্থ রেখে, সুদের টাকায় যেন কোনও রকমে সংসারের বড় বড় চাহিদাগুলো মিটিয়ে আমি একদিন জীবনসায়র পেরিয়ে মরণ সাগরে সাঁতার দিতে পারি।

উপাসনা আজকাল আমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চায়। কিন্তু আমি ভয় পাই। এতদিন যেভাবে আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে সেখানে যেন ছেদ না পড়ে।

পার্কে অবসরিকার বেঞ্চে সকালে বিকেলে সভ্যসংখ্যা কমছে না। চেনা-অচেনা মানুষের প্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। কেউ প্রবল উৎসাহ নিয়ে আসে, কেউ উৎসাহ হারিয়ে ফেলে কেউ এমন শয্যাবন্দি হয় যে পায়ে হেঁটে পার্ক পর্যন্ত আসতে পারে না।

প্রাপ্তি যেমন আছে বিচ্ছেদও তেমন আছে। কখনও খবর আসে, অমুকবাবু নেই। আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়, চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকি। সেইসময় সুরেন সরকার টি শার্ট ও হাফ প্যান্ট পরে স্পোর্টিং স্টাইলে বলেন, "চলুন, দুঃখ পেয়ে হাঁটা বন্ধ করবেন না, এই দেহটা হচ্ছে অ্যামবাসাডার গাড়ি, বসিয়ে রাখলেই ব্যাটারি ডাউন।"

আমার একটা ব্যাপার, আমি কখনও বন্ধুদের শ্রাদ্ধবাসরে যাই না।

আমরা নগেন চৌধুরীকে বলেছি, দয়াকরে শোকসভাও করবেন না। যে চলে গিয়েছে আমরা তো তাকে ভুলছি না।

সুরেন সরকার ইদানীং তিব্বতীদের মৃত্যুধারণা সম্পর্কে একখানা বই রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করে এনেছে। "মজার ব্যাপার মশাই, তিব্বতীদের মৃত্যুভীতি নেই, কারণ ওদের বিশ্বাস মৃত্যুটাই মানুষের আসল ঘর, জীবনটা হচ্ছে দু'দিনের খেলা। জীবনের খেলা শেষ হলেই ফিরে যেতে হবে নিজের ঘরে। আবার হয়তো বেরিয়ে আসতে হবে মৃত্যুকক্ষ থেকে। অনেকবার যাতায়াত করতে করতে শেষপর্যন্ত নির্বাণ।"

সুরেন সরকার ইদানীং আমার কলেজজীবনের কথা তোলে, সুরেনই একমাত্র লোক যে মনে করিয়ে দেয় যে চিরকাল আমি ব্যর্থ ভি-আর-এস ছিলাম না, একদিন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে উপাসনা আমাকে নির্বাচন করেছিল, স্বয়ম্বর সভা থেকে রাজকন্যেকে আমিই তুলে এনেছিলাম। আমার সুখের এবং সাফল্যের অভাব কোথায়?

আমাদের স্যার সুরেন্দ্রনাথ প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ! কলকাতায় ফিরে আসতে পেরে যেন মাটিতে পা রাখতে পেরেছে। আনন্দের অভাব নেই তাই।

আমি বলি, "সুরেন, তুমি লাকি। স্বয়ং ঊষা তোমার অনুগামিনী।"

সানন্দে সুরেন সরকার জানায় "বউকে বলেছি, ওয়ার্ল্ডের একমাত্র শহর কলকাতা যেখানে বড়লাটের নাম পাল্টে তোমার স্বামীর জীবিতকালেই পার্কের নাম রাখা হয়েছে সুরেন্দ্রনাথ পার্ক। ঊষা সব বুঝে মুখ টিপে হাসে, বলে, 'তোমাকে কখনও তো এত খুশি দেখিনি পুনেতে।' দ্যাখো বলরাম, আই হ্যাভ নাথিং এগেনস্ট পুনে, ওই শহর থেকে স্ত্রীকে পেয়েছি, বহুবছর অন্ন পেয়েছি, তবু ক্যালকাটা ইজ ক্যালকাটা। নদী বলো, মানুষ বলো শেষ পর্বে সবারই উৎসমুখে ফিরে আসবার বাসনা জন্মায়।"

"উপাসনা ছাড়া তো কলেজে এক-পা নড়তে চাইতে না। এখন তাকে নিয়ে বেরোও না কেন?" সুরের সরকার জিজ্ঞেস করলো আমাকে।

আমাকে স্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে বুলেটিন ছাড়তে হয়। "হাঁটুতে বাত,

অস্টিওফাইটিস। খুব হাঁটতে চায় না। তবে সাংসারিক কাজে ব্যস্ত রেখেছে নিজেকে। আজ মাসতুতো দাদা সুরেন ভট্‌চাজ্যির বাড়িতে সত্যনারায়ণের সিন্নি, ওখানে চলে গিয়েছে।"

"এই সিন্নিটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং, তাই না? একটা কিছু ইচ্ছাপূরণের ব্যাপার থাকে।" সুরেন সরকারকে সিন্নিতে নেমন্তন্ন করলে বোধ হয় আনন্দ পেতেন।

"তোমার সব তো ভালই মনে থাকে, সুরেন। উপাসনা বলছিল, বউদির অনুরোধ। চাঁদু দাদার চাকরির ওপর একটা ধকল যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল চাকরিটা থাকবে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বিপদটা কেটে গিয়েছে।"

সুরেন সরকার বললো, "আমি প্ল্যানিং-এ খারাপ নই। তোমার সব হিসেব ঠিক করে দেবো এমনভাবে যাতে হায়েস্ট সুদ পাও। তুমি যতটা পারো পোস্টাপিস মাসিক সঞ্চয়ে টাকা রাখো। ব্যাঙ্কের ওপর নির্ভর কোরো না, ব্যাঙ্কে সুদ কম। অনেকে সুদের প্ল্যানিং করে না, ফলে তারা কষ্ট পায়। ঠিক মতন ঘুটি সাজালে দেখবে বিনাধকলে সুদের টাকায় সংসার চলে যাচ্ছে।"

সুরেন সরকার ছাড়লো না। সুরেন একটা ফ্ল্যাট দেখতে যাচ্ছে, বাড়ির নাম অশ্বিনী নিবাস।

"এই অশ্বিনীটা কে? ঊষা জিজ্ঞেস করছিল, বলতে পারলাম না। ওর ধারণা, ওটা দেবতাদের চিকিৎসক যমজ ভাই অশ্বিনীকুমারের নামে। আমি বললাম, বোধ হয় নয়, জোড়া বাড়ি হলে নাহয় ওই নাম হতো। নিশ্চয় কোনও গ্রেট বেঙ্গলি।"

আমি বললাম, "অশ্বিনী দত্ত বোধহয়। নাম করা শিক্ষক ছিলেন, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ বলে দুখানা বেস্ট সেলার লিখেছিলেন এখনও লোকে বইদুটোকে ভোলেনি।"

"ও বই দুটো সোয়ামী বিবেকানন্দর লেখা নয়? ঊষা পড়েছে।"

"একই সাবজেস্টে দুই মহাপুরুষের কলমের লড়াই।"

সুরেন সরকার বললো, "এখন মোটা টাকায় ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছি।

পুনেতে যা সম্পত্তি ছিল আর দত্তপুকুরে যা পৈতৃক বিষয় ছিল তা বেচে ফেলতে পারলেই আমার ও ঊষার সারাজীবন কোনও চিন্তা থাকবে না। একটা মনের মতন ফ্ল্যাট ওই অশ্বিনীনিবাসেই পাওয়া যাচ্ছে, ভাবছি ওটা কিনে নেবো।"

সুরেন সরকার খুব প্রশংসা করতে লাগলো রাতুলের—"জাস্ট লাইক এ ফ্যামিলি মেম্বার। সব কাজে ভীষণ হেল্প করে। কোথায় পছন্দমতন ফ্ল্যাট বিক্রি রয়েছে তার খোঁজখবর নিয়ে আমাদের কাছে আসে।"

এই রাতুলটি কে?

একটা ট্যাক্সি ধরলো সুরেন সরকার। আমাকেও সে গাড়িতে তুললো। এইটুকু পথ সহজেই পায়ে হেঁটে বা মিনিতে যাওয়া যেতো। ট্যাক্সির যা ভাড়া বেড়েছে। যাদের চাকরি আছে তারাই চড়তে ভয় পায়।

সুরেন সরকার বললো, "ভাড়া বেড়েছে, কিন্তু কলকাতার ট্যাক্সি এখনও ইন্ডিয়ার চিপেস্ট!" তারপর সুরেন বললো, "বলরাম, একসময় অনেক কষ্ট করা গিয়েছে, এখন আর নিজেকে নিগৃহীত করা কেন? দু'জায়গার প্রপার্টিগুলো বেচে টাকা এসে গেলে ওসব নিয়ে কী করবো? ঊষা জানে, একটা ফ্ল্যাট কেনা, একটা গাড়ি রাখা, মাঝে মাঝে একটু ট্যাক্সি চড়া এ সব ভগবানের ইচ্ছেয় খুব কঠিন হবে না।"

"রাতুল বলছে, দত্তপুকুরেও আমাদের ছোট্ট একটা কান্ট্রি হোম হয়ে যেতে পারে। যবে ইচ্ছে, যখন ইচ্ছে গ্রাম্যপরিবেশে চলে যাওয়া যাবে। আমি ভাবছি, নজরটা আরও উঁচু করে খোদ শান্তিনিকেতনেই একটা কটেজ রাখা যেতে পারে। তবে এ-ব্যাপারে আমার মতের থেকে রাতুলের মতের মূল্য বেশি ঊষা ওর ওপরেই এ সব ব্যাপারে বেশি নির্ভর করে।

অশ্বিনীনিবাস কলেজ অধ্যাপকদের যৌথ হাউজিং। সুরেন সরকার বললো, "কত সাধ করে স্বল্পআয়ের মাস্টারমশাইরা এই ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি করেছিলেন। মিস্টার ঢেকো বোসকে বলো, এই বাড়ির বৃদ্ধ বাসিন্দাদের নিয়ে একটা আর্টিকেল অবসরিকায় লিখতে।"

আমরা অশ্বিনীনিবাসের একটা ফ্ল্যাটে ঢুকলাম। গৃহকর্মী বৃদ্ধা মিসেস

দেবযানী আচার্য ধুনি জ্বালিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। ওঁদের দুই ছেলে, দু'জনেই বিদেশে, একজন সিঙ্গাপুরে, আরেকজন কানেকটিকাটে। দেড় বছর আগে প্রফেসর প্রেমকান্ত আচার্য দেহরক্ষা করেছেন। মিসেস দেবযানী আচার্য আর এই নিঃসঙ্গতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারছেন না। বাড়ি বেচে চলে যাবেন সুদূর কানেকটিকাটে। ওঁর ছেলেদের কলকাতার সম্পত্তি রাখার কোনও আগ্রহ নেই।

সুরেন সরকারকে মিসেস দেবযানী আচার্য জিজ্ঞেস করছেন, কবে নাগাদ ফ্ল্যাট বেচা-কেনা শেষ হতে পারে?

সুরেন বললো, "যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমার পুনের বিষয় সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছে। ওখান থেকে টাকা এলো বলে। ফ্ল্যাট কিনে নেওয়াটা জরুরি, আমিও মাসে মাসে মোটা টাকা ভাড়া দিচ্ছি অকারণে।"

রাতুলবাবুই যে এখানে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করাচ্ছেন তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

সুরেন সরকার বললেন, "প্রয়োজনে রাতুল একবার ঘুরে আসবে পুনে থেকে। ও তো ওইখানেই বিজনেস করছে।"

সুরেন সরকার ঘুরে ঘুরে প্রয়াত অধ্যাপকের ফ্ল্যাটটা দেখছে। মিসেস দেবযানী আচার্য দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখে বললেন, "ওঁরা কয়েকজনে মিলে অনেক সাহস দেখিয়ে এবং অনেক কষ্ট করে কুড়ি বছর আগে এই অশ্বিনীনিবাস তৈরি করেছিলেন। দেখুন না, আমার ফ্ল্যাটে একটা নয়, দুটো নয়, তিনটে শোবার ঘর। কিন্তু শোবার মানুষ কোথায়?" এ বাড়িতে মিসেস দেবযানী আচার্যর যে আর এক মুহূর্ত থাকবার ইচ্ছে নেই তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

শুধু মিসেস আচার্য নয়, এ বাড়ির বেশ কয়েকটা ফ্ল্যাটে একই অবস্থা, কোথাও নিঃসঙ্গ বৃদ্ধা, কোথাও একাকী বৃদ্ধ, কোথাও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ফ্ল্যাট আগলিয়ে বসে আছেন।

"কমবয়সী নতুন প্রজন্ম এইসব আবাসন থেকে কোথায় উধাও হলো?"

"শুধু অশ্বিনীনিবাস নয়, বালিগঞ্জ প্লেসে, বিধাননগর, নিউ আলিপুরে

একই অবস্থা। নতুন প্রজন্মের তরুণরা এই শহরে উপার্জনের পথ খুঁজে পায়নি। অনেকেই পড়াশোনায় ভাল ছিল, তাই তারা পালিয়েছে দূরদূরান্তরে, কখনও স্বদেশে, কখনও বিদেশে।"

পাশের ফ্ল্যাটের মিস্টার চিন্ময় অ্যান্ড মিসেস ভাগ্যবতী চ্যাটার্জি সে তুলনায় ভাগ্যবান। ওঁদের মেয়ের শ্বশুরবাড়ি অশ্বিনীনিবাসের পাঁচতলায়। একই ফ্ল্যাট-গুচ্ছে পুত্রকন্যা বিবাহিতা হলে সবসময় একটা গল্প থাকে, এখানেও আছে। মিসেস চ্যাটার্জি আপত্তি তুলেছিলেন সুশিক্ষিতা সুন্দরী কন্যার অসবর্ণ বিবাহে, কিন্তু বাধা দিতে সাহস পাননি। এখন তাঁর মেয়েও কলেজে পড়ায়। ভালই মাইনে পায়।

চ্যাটার্জিবা আমাদের চা খাওয়াতে চাইলেন। চিন্ময় বললেন, "জানেন মিস্টার সরকার একসময় এই অশ্বিনীনিবাস কচিকাঁচাদের হৈচৈতে ভরা ছিল। তারপর একসময় বাড় বন্ধ হয়ে গেলো। অশ্বিনীনিবাসের ভাল ভাল ছেলেগুলো একটু বড় হয়ে কাজের জন্যে হন্যে হয়ে উঠল, এখানে কোথায় কাজ? তাই তারা ছড়িয়ে পড়লো বরোদা, বিকানির, কোচি, কোয়াম্বাটুরে।"

"মেয়েরা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"অঙ্কের ব্যাপার! যোগ্যপাত্র হাতের গোড়ায় না থাকলে যোগ্য পাত্রীরাও ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। আজকাল বম্বে, দিল্লি, বাঙ্গালোরের কাগজে কলকাতার বাঙালিরা বিবাহবন্ধনের বিজ্ঞাপন দিয়ে ধন্য হয়ে যাচ্ছে। আমার ছোট মেয়েও তাই, জামাই এখন থাকে মরিশাসে।"

চ্যাটার্জিদের ভাগ্য ভাল, অন্তত এক মেয়ে খুব কাছাকাছি রয়েছে। ওঁদের একটি নাতি ও একটি নাতনি আছে। তারা এলে ভীষণ আনন্দ হয়, কিন্তু বাপমায়ের ঢালোয়া পারমিশন নেই। দাদু-দিদিমার কাছে সময় কাটানো মানেই নাকি পড়াশোনা নষ্ট।

ভাগ্যবতী চ্যাটার্জির দুঃখ "ওদের মায়ের মনে থাকে না যে দাদুও ম্যাথামেটিক্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট!"

তবে মেয়ে-জামাইকে পুরো দোষ দিতে পারেন না। যা আজকাল পড়াশোনার চাপ। অধ্যাপক চিন্ময় চ্যাটার্জির প্রশ্ন, "হ্যাঁ, মশাই গোটা

কলকাতা শহরটাই এক সময় অশ্বিনীনিবাস হয়ে যাবে নাকি?"

সুরেন সরকার কিন্তু আশাবাদী। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন তুললো, "তা কেন? কতো নতুন লোক এখানে আসবে, এই শহরটাকে তারা নিজের করে নেবে। অনেক শহর, মিস্টার চ্যাটার্জি, সাফল্যের পর সাফল্যে ওভার-হিটেড্ হয়ে গিয়েছে।"

"মানে?" জিজ্ঞেস করলো ভাগ্যবতী দেবী।

সুরেন সরকার ব্যাখ্যা করলো "বাড়ি ভাড়া, জীবনযাত্রার খরচ, কাজের লোকের মাইনে কিছু বড় এবং বাড়ন্ত শহরে এতো বেড়ে গিয়েছে যে বৃদ্ধরা সেখানে থাকতে পারছেন না। দেখবেন, যত বড় শহর তত কম বৃদ্ধদের উপস্থিতি।"

"তাতে সংসারের কী এসে যায়, মিস্টার সরকার?" হতাশ মনে জিজ্ঞেস করলেন অধ্যাপক চিন্ময় চ্যাটার্জি।

সুরে সরকার বললো, "এসে যায় মিস্টার চ্যাটার্জি, বয়স্থদের অনুপস্থিতিতে আমাদের অতিমাত্রায় তপ্ত শহরগুলো তাদের কোমলতা এবং শ্যামলতা দুই-ই হারিয়ে ফেলছে।"

সুরেন সরকার আরও ব্যাখ্যা করলেন, "এই যে আপনাদের সঙ্গে পাঁচতলার নাতি-নাতিনীদের যোগাযোগ চেয়েছি এটা একটা অন্য ধরনের মানবিক সম্পর্ক—কম বয়সে আপনাদের সান্নিধ্যসুখ যারা পাচ্ছে তারা অন্য ছেলেমেয়েদের থেকে অনেক ভাগ্যবান। যে সব শহর এসব পায় না তারা দুর্ভাগা।"

প্রফেসর চিন্ময় চ্যাটার্জি মনের আনন্দে শুনছেন সুরেন সরকারের কথা। মাঝেমাঝে প্রশ্ন তুলছেন।

সুরেন সরকার বললো, "আপনি এই কলকাতা শহরের কথাই ধরুন। সেখানে এখানকার ভাগ্যবিধাতা ইংরেজ সায়েবরা চাকরি শেষ হলেই টুক করে স্বদেশে কেটে পড়তেন, এখানে তাঁদের দাঁত পড়তো না, চুলও পাকতো না। বিহার উড়িষ্যা থেকে আনা এখানকার প্রবাসী শ্রমিকরাও শারীরিক ভাবে অসমর্থ হলেই চলে যেত 'দেশ' নামক এক গ্রামে। একমাত্র

কিছু মধ্যবিত্ত বৃদ্ধের বসবাস ছিল, তাদের সান্নিধ্যে এই শহরে মধ্যবিত্তর মেধার বিকাশ ঘটেছিল কি না তা খুঁজে দেখা উচিত।"

এই মুহূর্তে আমার মনে প্রবল হতাশা। এই শহরে শেষ পর্যন্ত বাঙালিদের কোন অংশ টিকে থাকবে?

বৃদ্ধরা যদি কোনও রকমে সম্পত্তি না বেচে মাটি কামড়ে পড়ে থাকেন, তা হলেও প্রফেশনাল বাঙালি যৌবন এখানে তেমন থাকবে না। তারা না থাকলে, শিশুরা, তাদের কমবয়সী মায়েরা বাবা-মাকে সান্নিধ্য দিতে অক্ষম হবে। অথচ বৃদ্ধরা এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছেন।

"এটা আবার কী জিনিস, বলরাম? সব ক্ষণই তো সন্ধিক্ষণ। নেচার তো সবসময় সৃষ্টি ও ধ্বংসের নেশায় ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।"

অধ্যাপক চ্যাটার্জি বললেন, "এমন কি আমাদের এই দেহ। প্রতিদিন এই দেহে তিরিশ কোটি কোষের মৃত্যু হচ্ছে এবং সমপরিমাণ কোষের জন্ম হচ্ছে।"

আমি এবার বললাম, "আমি ভাই তোমাদের মতন পড়াশোনা করা লোক নই। আমি শুধু জানি, আগে এই কলকাতা শহরের ঘরবাড়ি মধ্যবয়সী বিধবায় ভরা ছিল। এখন ভগবানের আশীর্বাদে এবং বিজ্ঞানের প্রচেষ্টায় এয়ো স্ত্রীর সংখ্যা বাড়ছে, যার অর্থ বৃদ্ধরা এবং বৃদ্ধারা আগেকার তুলনায় বেশি বছর বাঁচছেন। এটা যদি গুড নিউজ হয় তা হলে প্রত্যেক সংসারকে এই সুযোগটা তো পুরো ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু সেটা কী করে হবে, কেমন করে হবে? তার প্রস্তুতি কোথায়?"

আমার কলেজ জীবনের বন্ধু সুরেন সরকার মোটেই বিব্রত হচ্ছে না। সে বললো, ইস্কুলে একবার বক্তৃতা প্রতিযোগিতা হয়েছিল—তুমি কী হইতে চাও? প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম হয়েছিলাম। আমার বক্তব্য ছিল, বুড়ো হতে চাই, কারণ বৃদ্ধ না হলে মানুষ সুন্দর হয় না। আমার বক্তব্য ছিল—রুপোলি চুল হলো মানুষের পরিপূর্ণতা ও প্রজ্ঞার লক্ষণ। কানে কম শোনেন বলে একমাত্র বৃদ্ধরাই আজেবাজে গুজব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন। দৃষ্টি ক্ষীণ বলেই ছোট টাইপে খবরের কাগজের

আজেবাজে লেখা তাঁদের পড়তে হয় না। ফলে বয়োজ্যেষ্ঠরা উদ্বেগশূন্য! একমাত্র বার্ধক্যই মানুষকে সেই শক্তি দেয় যার ফলে দেহি দেহি না করেও নতুন প্রজন্মের ওপর রাজত্ব করা যায়।"

অঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক চিন্ময় চ্যাটার্জি বললেন, "এখানে চলে আসুন মশাই। বাধাটা কোথায়?'

"দ্বিধাও নেই, বাধাও নেই। এখন শুধু রাতুলকে নির্দেশ দেওয়া, কাজ সারো তাড়াতাড়ি, পুনে থেকে টাকা নিয়ে এসো দ্রুত।"

এতদূর যখন এসেছি তখন একবার ঢেকো বোসের সঙ্গে যোগাযোগ না করা অন্যায়।

লেখেন তিনি আর ছাপা অফিসে ছোটাছুটি করি আমি। ঢেকো বোসের ইচ্ছে আমার নামটা সহসম্পাদক হিসেবে ছাপিয়ে দেওয়া হোক। আমি মোটেই রাজি নই, আমার মতন অশিক্ষিত লোকের নাম ছাপার অক্ষরে থাকলে কাগজটার বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যাবে।

ঢেকো বোস বললেন, "একবার মাননীয় নগেন চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে আলোচনায় বসা দরকার।"

"আজকাল প্রায়ই শেষ রাতে ঘুম চলে যাচ্ছে, বিশ্বাস মশাই। মনে হচ্ছে স্মৃতিশক্তিও একটু একটু করে কমে যাচ্ছে। আমার বউমার দাদা ডাক্তার, গতকাল ফোন করেছিলেন। তিনি বললেন, 'চিন্তা করবেন না, পাওনাদার ছাড়া আর সবার কথা সময়মতো আমাদের মনে পড়ে যায়।' আর একটা ভ্যালুয়েবল কথা তিনি বললেন, স্মৃতিশক্তি এবং স্মরণশক্তি—মেমরি এবং রিকল এক জিনিস নয়। মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে একটি মাতাল হনুমান

বসবাস করে, অনেক সময় সে আজেবাজে জিনিস করে ফেলে, কিন্তু মাতালকে ক্ষমাঘেন্না করে নিতে হয়।"

আমি দেখলাম, ঢেকো বোস মশাই ডান হাতের বুড়ো আঙুলের সঙ্গে পরের দুটো আঙুল ঘনঘন জুড়ছেন।

আমি ব্যাপারটা লক্ষও করে ফেলেছি দেখে ঢেকো বোস বললেন, "স্পেশাল বৌদ্ধ মুদ্রা। তিব্বত থেকে সিক্রেটলি এ দেশে চলে এসেছে- কোনো কিছু মনে রাখার মোক্ষম মুদ্রা! আমি খুব ভাল ফল পাচ্ছি আজ থেকে। এক এক সময় ভয় পাচ্ছি, যে সব জিনিস তৎক্ষণাৎ ভুলে না গেলে মনের বর্জ্য পদার্থ অর্থাৎ ফ্রি র‍্যাডিকাল বেড়ে যায়, সেগুলো ভুলবো কী করে?"

আমি বললাম, "তিনটে আঙুলের একত্র মাপ নিয়ে একটা তিব্বতী তামার রিং তৈরি করলে কেমন হয়?"

"ঠিক মতন বিজ্ঞাপন দিয়ে বাজারে ছাড়তে পারলে কোটিপতি হয়ে যাবেন কয়েক মাসে! শুধু একটা সাবধান করে দিতে হবে, ছোটখাট অপ্রিয় স্মৃতি যদি ভুলতে না পারেন তবে তার জন্যে কোং দায়ী নয়।"

ওটা কী জিনিস আমার জানা ছিল না। পত্রিকা সম্পাদক বললেন, "ছোটবেলায় সন্দেশ পত্রিকায় পড়েছি। কোম্পানি যাতে জড়িয়ে না পড়ে তার জন্যে যেখানে সেখানে বারেবারে লিখতে হয় কোং দায়ী নয়।"

"ওঃ এইটুকু পৃথিবীতে যে কত জিনিস জেনে রাখতে হয়। সাধে কি আর কাগজের সম্পাদককে লোকে এত সম্মান করে, নেমন্তন্ন করে বিলেত-আমেরিকায় পাঠায়।"

ঢেকো বোস জিজ্ঞেস করলেন, "একটা বিষয়ে জরুরি আলোচনা প্রয়োজন। বলুন তো, সব ব্যাপারে চায়নার সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা কি সঙ্গত?"

আমি জানি যে এককালে চায়নার বৃদ্ধদের একটা বড় অংশ অহিফেনে আসক্ত ছিলেন এবং সেই আফিম চালান হতো কলকাতার বড়বাজার থেকে।

"সে সব মশাই আদ্যিকালের কথা। তারপর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বৃদ্ধ এখন চিনে এবং এঁরা সরকারি মদতে পুষ্ট হয়ে নানাভাবে নিজেদের ব্যস্ত রাখেন। বৃদ্ধরা ছেলে পড়ান, পুলিশকে সাহায্য করেন, ট্যুরিস্ট গাইডের কাজ করেন। রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটলেও এঁদের মস্ত ভূমিকা। এদেশেও আমরা কম খরচে কোচিং ক্লাস খুলতে পারি; ট্রাফিক পুলিশরা অবশ্য আমাদের সাহায্য নেবে না, নাকের ডগায় সারাক্ষণ বৃদ্ধরা থাকলে ওঁদের পুলিশ হবার সুখটাই মাঠে মারা যাবে।"

অবসরিকার পরবর্তী একটা সুললিত আইটেম লিখে ফেলেছেন বোস মশাই। "যাঁরা অবসর নিয়েও সুস্থসবল আছেন তাঁরা দয়া করে দিনে দু'ঘণ্টা ব্যয় করুন অন্যের সঙ্গে কথা বলতে, এবং সান্নিধ্য দিতে। ওঁদের চিঠিপত্র লিখে দিন, ইলেকট্রিক বিল জমা দিয়ে আসুন, বই পড়ে শোনান, প্রয়োজনে হিসেবপত্তরে সাহায্য করুন।"

বোসমশাই সেই সঙ্গে অবসরিকার পাঠকদের জানাচ্ছেন : "আপনার চারদিকে যা ঘটছে তা যদি আপনার নিতান্তই একঘেয়ে মনে হয় তা হলে আঠারো বছর বয়সেও আপনি বৃদ্ধ, আর আপনার দিনগুলি যদি সবসময় আনন্দময় মনে হয় তা হলে আপনি একশ বছরেও যুবক।"

বোসমশাই আরও লিখেছেন, "মনে রাখবেন বাকি সময়টাই আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হতে পারে।"

"শ্রেষ্ঠ সময়! এটা আপনি বিশ্বাস করেন, মিস্টার বোস?"

তিনি বললেন, "এডিটর বোস এবং আপনার বন্ধু ঢেকো বোস এক লোক নয়, বিশ্বাস মশাই। এই সত্তর বছরে আমি পঁচিশ হাজার সূর্যোদয় দেখেছি, আপনিও অন্তত বিশ হাজার সানরাইজ দেখেছেন, আমি কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি না।"

একটু ভাবলেন বোস মশাই, তারপর মন্তব্য করলেন, "যৌবনটা বোধহয় আসলি সোনা, বেশি ঘসাঘসি করতে হয় না। আর আমাদের এই বয়সে মানুষ চাইছে একটু ভরসা, এই ভরসাটুকুও যদি আমরা নিজেদের দিতে না পারলাম তা হলে কী করলাম?"

আমি কী মন্তব্য করবো? ঢেকো বোস উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "নগেনবাবুকে সাজেশন দিন অবসারিকার স্পেশাল চিন সংখ্যা বার করতে। চিনে আইন পাশ হয়ে গেল, বউকে যেমন ভরণপোষণ দিতে স্বামী বাধ্য, তেমন বাবামাকেও খোরপোষ দিতে ছেলেমেয়েরা বাধ্য।"

"ভাইপো-ভাইঝিকে যদি ইনক্লুড করা যায় কিংবা ভাগ্নেকে, তা হলে আমি ইন্টারেস্টেড, না হলে আমি এই পয়েন্টে সময় নষ্ট করতে চাই না, বোস মশাই।"

আমার কথা শুনে খুব হাসতে লাগলেন সম্পাদক ঢেকো বোস। সেই সুযোগে আমি বললাম, "অশ্বিনীভবনে কমবয়সীদের কাণ্ড শুনুন। প্রত্যেক বৃদ্ধকে ওরা একখানা ছাপানো ফর্ম পাঠিয়েছে—দেহ দান করুন। অবশ্যই মৃত্যুর পরে। কিন্তু ডাকে এই কাগজ পেয়ে কয়েকজন বৃদ্ধ খুব ঝিমিয়ে পড়েছেন। বলছেন, থাকার মধ্যে তো এই দেহটুকু। সেটাও খামচে নেবার জন্য কত লোক উঁচিয়ে আছে। ধন্য কলকাতা।"

মরণোত্তর দেহদান জিনিসটা হয়তো ভাল। কিন্তু ওই বিষয়ে সম্পাদকমশাই কিছুতেই প্রবন্ধ লিখবেন না অবসরিকা পত্রিকায়। ব্যাপারটা যে বৃদ্ধ মানুষকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়, এ কথাও কেউ কেউ বুঝতে নারাজ।

সুরেন সরকার তিন দিন অনুপস্থিত। ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম, সেখানে দরজার ওপরে একটা হলুদ স্লিপ সাঁটা। থ্রি-এম কোম্পানি আবিষ্কৃত এই স্লিপগুলোর যে কতরকম ব্যবহার। লেখো আর যেখানে প্রয়োজন সেখানে সাঁটো। প্রয়োজন শেষ হলেই টান মারো কাগজটা উঠে আসবে।

সুরেন নিজেই বলেছিল, "লাইফের ফিলজফিটা এই থ্রি-এম আবিষ্কারের মধ্যে পাবে। একটু চাপ দিলেই সাঁটা, কিন্তু বিচ্ছেদের জন্য কোনো টানাটানি, হ্যাঁচকা হেঁচকি, ছেঁড়াছেঁড়ির প্রয়োজন নেই। ডেনড্রাইটও জোড়ে, কিন্তু গোঁড়া হিন্দু বিয়ের মতন বিচ্ছেদের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, থ্রি-এম জোড়ে কিন্তু বিচ্ছেদের জন্যে সদাপ্রস্তুত।"

হলদে কাগজেই সুরেনের বিজ্ঞপ্তি, সে দত্তপুকুর যাচ্ছে। তার মানে 'ভাইপো' রাতুলের সঙ্গে একটা লং উইক-এন্ড যাপন করবে।

সুরেন সরকার অঙ্কটা কষে দেবে আমাকে রিপন স্ট্রিট থেকে কোথায় কত রাখবো। বিনিয়োগের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই। উপাসনা এসব আর্থিক সমস্যা বোঝে না, বুঝতেও চায় না।

এখন অন্য এক অনুভূতি আমার মনকে ঘিরে ধরছে। ভরদুপুরে এইসময় ঘরমুখো হবার বাসনা থাকে না। ইচ্ছে হচ্ছে বহু বছর ধরে দিনের অবোধ যেখানে সময় কাটিয়েছি সেই রিপন স্ট্রিটটাই একবার ঘুরে আসি।

হঠাৎ কেন এমন ইচ্ছে হচ্ছে? বুড়ো বয়সে ছোঁড়া হবার অযৌক্তিক বাসনা নাকি? আরে বাপধন কোম্পানির এমপ্লয়মেন্ট খাতায় নাম না থাকলে ব্যাগ হাতে এই সময় অফিসে যাওয়া যায় না। কোথায় যেন নগেন চৌধুরী রেগেমেগে বলেছিলেন, "বিয়ে না করেই নাতির অন্নপ্রাশনে লাখ টাকা খরচের বাসনা। এর কোনো মানে হয় না। একটা ধাপ আচমকা এড়িয়ে আর একটা ধাপে পৌঁছতে চাইলে জীবনের বহু অঙ্ক বেসামাল হয়ে যায়। ভি-আর-এস-এর চিঠি নেবো, চেকও নেবো। আবার পুরনো অফিসের ঠাণ্ডা পরিবেশে কোম্পানির খরচে গরম চা পান করবো তা হয় না।"

কারণটা বুঝতে পারছি। পার্কের একটা বেঞ্চিতে বসে আজ আমরা ভি-আই-পি আদর উপভোগ করেছি। আমরা বৃদ্ধরা একটা কোণে নিজেদের জগতের মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে বসে আছি, সেই সময় মাথায় টুপি লাগিয়ে, রঙচঙে টিশার্ট ও জিন্‌স-পরা একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আমাদের কাছে। হাজির হলো কলেজের পড়ুয়া ভাল ফ্যামিলির ছেলেমেয়ে মনে হয়। এরা

আমাকে একটা ইংরেজি কাগজ দিতে চাইল। আর্থিক কারণে আমি গতকাল সকালেই বাড়ির কাগজটা বন্ধ করে দিয়েছি। উপাসনার নির্দেশে। ওর বাপের বাড়িতে রত্না বউদিও খরচ কমাবার জন্যে কাগজ বন্ধ করে দিয়েছেন, সংবাদপত্রহীন অস্তিত্বে তেমন কোনও অসুবিধা হচ্ছে না, কারণ চাঁদুদা ওরফে সুরেন ভট্টাচার্য বিকেলে পাড়ার ফ্রি রিডিং রুমে কাগজটা পড়ে নিচ্ছে।

বুঝছি, এই তরুণ-তরুণী, আমাকে একখানা কাগজ গছাতে চায়। একবার ভাবলাম বলি, ভি-আর-এস আমি, কাগজ কেনা ছেড়ে দেওয়ার সময় আমার, কিন্তু সঙ্কোচ হলো, বলতে পারলাম না। এদের কিছুই তো অতি সামান্য প্রত্যাশা। হয়তো আজই কাগজ ফেরির ব্যবসায় নেমেছে। পকেট থেকে পয়সা বার করতে যেতেই কমবয়সী মেয়েটি হাঁ-হাঁ করে উঠল। পয়সার নেওয়ার কোনও প্রশ্ন নাকি নেই। এটা বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে, কাগজ কোম্পানির শুভেচ্ছা সহ। এই ধরনের ভি আই পি আদর তো বিশিষ্ট লোকদের জন্য সংরক্ষিত। আমি বললাম, তোমরা ভুল করছো, আমি কোনও ইম্পর্ট্যান্ট লোক নই, আমি বাড়ির বাংলা কাগজটাও বন্ধ করে দিয়েছি। কিন্তু ছেলেটি শুনলো না, বললো, আপনি যাই বলুন, আমাদের কাগজের কাছে আপনি খুব ইম্পর্ট্যান্ট।

খবরের কাগজের অনেকগুলো পাতা। তার মধ্যে গোটা ষোলো পাতা চাকরির বিজ্ঞাপনে ঠাসা। এই সেকশনের নামটিও বেশ : 'উত্থান'। এবার আমার মেজাজটা আকস্মিক বিগড়ে গেল। হাতের এই ষোলোটা রঙিন পাতা ছাড়া আমার চারদিকের সব কিছুই তো 'পতন'। সে ক্ষেত্রে এই সব কাগজ পড়ে সময় নষ্ট করে কী লাভ?

কিন্তু পড়তে পড়তে দেখলাম, সমস্ত ভারতবর্ষ এখনও কলকাতা হয়নি। অনেক অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে অনেক চাকরির রয়েছে, কিন্তু যোগ্য মানুষ পাওয়া যাচ্ছে না। কোম্পানির কর্তারা পয়সা খরচ করে, আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে, দূরদূরান্ত থেকে কাজের মানুষ টানার চেষ্টা করছে। এই খবর কলকাতার বলরাম বিশ্বাসকে পৌঁছে দেবার জন্যেই যেন

একজোড়া কলেজের ছেলেমেয়ে পয়সা না নিয়েই পার্কে পার্কে সংবাদপত্র বিতরণ করছে।

ওরা কষ্ট করে কাছে এসে আমাকে সংবাদপত্র উপহাব দিয়েছে। বেঞ্চিতে আমার পাশে বসা ভদ্রলোকও আর্থিক কারণে কাগজ নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁর অবশ্য সরকারি পেনসন—সামনের মাস থেকে পেনসনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছেন সরকার বাহাদুর। ভদ্রলোক বললেন, এরিয়ার টাকাটা ব্যাঙ্কে এলেই এই কাগজটাই আমি বাড়িতে রাখবো। অনেক পাতা থাকে, মাসের শেষে বিক্রিওয়ালার কাছ থেকে তিনগুণ পাব, সুতরাং মাসের খরচটা গায়ে লাগবে না।

"বিক্রিওয়ালার ব্যাপারটা আপনার মাথায় এসেছে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"মাথাটা আমার নয়, আমার ওয়াইফের। হীরের টুকরো মেয়ে মশাই, বাড়িতে অবশ্য অন্য কথা বলি। ওয়াইফ নয় জেনুইন ম্যাজিশিয়ান এই বাংলার গৃহবধূরা। হাতে যা তুলে দিই তাতেই খরচ চালিয়ে নেয়।"

নতুন চাকরির বিজ্ঞপ্তি! সে তো নিষিদ্ধ এলাকা। কিন্তু বিনাপয়সায় পাওয়া কাজের ওই বিজ্ঞাপনগুলোই আমাকে টানছিল। এখন চাকরিতে প্রার্থীকে টানতে নামকরা কোম্পানিগুলো কত কাণ্ডই না করে! পড়তে পড়তে একটা বিজ্ঞাপনে আমার নজর আটকে গেলো। বিজ্ঞাপনটা বারবার পড়তে লাগলাম। ব্যাপারটা আমার জানা ছিল না। বিজ্ঞাপনদাতা লিখছেন একজন সাধাবণ মানুষ তার সংক্ষিপ্ত মূল্যবান জীবনের এক লাখ ষোলো হাজার আশি ঘণ্টা সময় কর্মক্ষেত্রে ব্যয় করে। এই সময়টা যাতে সুখময় হয় তার জন্যেই বিজ্ঞাপনদাতা কোম্পানির বিশেষ ব্যবস্থা।

উপহার দেওয়া কাগজটা আমি ফেলে দিতে পারনি। বগলে নিয়েই ঘুরছি। ঘুরতে ফিরতে ওই ১,১৬,০০০ ঘণ্টার হিসেবটা ব্রেনের গভীরতম অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে। সেই জন্যেই বোধহয় একবার রিপন স্ট্রিট যাবার বাসনা হচ্ছে। কিন্তু ওখানে যাওয়া হচ্ছে না। স্পেশাল কোনও কাজ না

থাকলে ছেড়ে যাওয়া কর্মক্ষেত্রে কিছুতেই ফিরতে নেই। মানসম্মান থাকে না। ওই যে বিখ্যাত গবেষক বিমলেন্দু মজুমদারের ডাইভোর্সড্ ওয়াইফ রমলাদি আসতেন উপাসনার কাছে। তখন বুঝতাম না, ডিভোর্স হয়ে যাবার পরেও স্বামীকে ফেরত পাবার ইচ্ছে ওঁর মধ্যে এতো কেন? অচরিতার্থ আত্মবাসনার কাছে আত্মসম্মানের কোনও গুরুত্ব নেই।

পুরনো অফিসে ফিরে যাবার ইচ্ছাকে সংযত করার একটা পথ সারকিট সেনগুপ্তর লোকাল অফিসটা একবার ঘুরে যাওয়া।

"আরে দাদা, লং টাইম নো সি!" সারকিট আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন।

"আপনাকে দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছে আমাব ওয়াইফ, ব্যস্ত হয়ে আছি স্বয়ং আমি।"

সারকিট সেনগুপ্তর সেই পুরনো প্রশ্ন : "ইদানীং কোন্ মেগাসিরিয়ালে বউদি ফাঁসলেন?"

"যেটার মার্কেট রিসার্চ আপনি করছেন। একটা পর্ব হয়ে যাবার পরেই পরেরটার জন্যে উপাসনার ভীষণ ভাবনা, চরিত্রটার শেষপর্যন্ত কী হবে? পার্শ্বচরিত্র নিয়ে অনেক সময় আরও বেশি দুশ্চিন্তা। উপাসনা বলে, দ্যাখো মূল হিরোর বড়জোর কষ্ট হবে, মনে ব্যথা লাগবে, কিন্তু হিরোকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে বেঁচে থাকতেই হবে। মুশকিল হলো পার্শ্বচরিত্রটার—তার জীবনে দুমদাম অঘটন ঘটে যেতে পারে, যেভাবে টিভির ক্যারাক্টারগুলো আজকাল রিভলভার, রাইফেল এবং বোমা নিয়ে ঘোরাঘুরি করে।"

সারকিট সেনগুপ্তর চিন্তার কারণ অন্য। তিনি বললেন, "একটা ভয়ঙ্কর সমস্যা হলো ভাল মেগাসিরিয়াল আর খারাপ সিরিয়ালের মধ্যে মানুষ তফাত করতে পারছে না। সকলেই ধরে নিচ্ছে লাইফ ইটসেল্‌ফ ইজ এ মেগাসিরিয়াল—ভালমন্দ যা ঈশ্বর তৈরি করে দিয়েছেন তা মেনে নিতেই হবে।"

সারকিটের ধারণা, "এখন কোম্পানি চাইছে, মানুষ মেনে নিক, মেগাসিরিয়ালটাই জীবন।"

আমার সন্দেহ জীবন থেকে মেগাসিরিয়ালটা ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে উঠলে টিভি কোম্পানির পক্ষে মঙ্গলজনক?"

সারকিটের বক্তব্য : "দেখুন বিশ্বাসমশাই, একটা পরিবেশে আপনার যখন ভাল লাগছে তখন যে প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন আপনাকে দেখানো হবে তাই আপনার মনে ধরে যাবে। সেই জিনিস কেনার সিদ্ধান্তটাও সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবে।"

আমি মার্কেট রিসার্চের সব কথা বুঝতে পারি না। বললাম, সেনগুপ্ত মশাই জিনিস কেনার সিদ্ধান্ত কি শুধু ভাললাগার ওপর নির্ভর করে? পকেটে টাকা থাকা চাই তো?"

সারকিট আমাকে পাত্তা দিচ্ছেন না। "টাকা অটোম্যাটিক এসে যায়, মিস্টার বিশ্বাস। একটা খরচ থেকে স্বেচ্ছায় সরে এসে মানুষ আর একটা খরচের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এইটাই সংসারের নিয়ম। এই দেখুন না, ডাবের খরচ কমিয়ে দিয়ে মানুষ ঠাণ্ডা পানির বোতল কিনছে। হোয়াই? আপনি জানেন না, অনেক ফ্যামিলি পুজোর আগে টিভি কিনবে বলে, ছ'মাস আগে থেকে চিকেন খাওয়া কমিয়ে দিচ্ছে।"

"সুকৃৎ, আপনি কী সব বলছেন?"

"ঠিক বলছি, মিস্টার বিশ্বাস। এই শহরের টু-লিট্‌ল আর্থিক সামর্থকে কেন্দ্র করে টু-মেনি প্রোডাক্টস্ মিউজিক্যাল চেয়ার খেলছে। এর ওপর নির্ভর করেই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের টিভি সিরিয়াল, মেগাসিরিয়াল, এমন কী দৈনিক কাগজগুলো।"

সারকিট এবার নিজের খবর দিলেন। ভাগ্যসন্ধানে কিছুদিনের জন্যে বাঙ্গালোর চলে যাচ্ছেন। সারকিট স্বীকার করলেন, "আমি চাই এখন একটা আইডিয়াল পরিবেশ, যেখানে অনেক টাকা এবং অনেক সামগ্রী এক জায়গায় রয়েছে। যেখানে আমার প্রতিভার প্রমাণ দিতে পারবো। তবে ভাববেন না ওসব জায়গায় কোনো অসুবিধে নেই। ওখানে গোল্ডেন টেলিভিশন টাইম বলতে সন্ধ্যা সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে ন'টা। এই একটা ঘণ্টা নিজের দখলে আনার জন্যে বড় বড় কোম্পানির মধ্যে প্রাণঘাতী লড়াই। কলকাতার মানুষদের মতন দুপুরের অনন্ত অবসর যদি ওখানে থাকতো!"

আমার বগলের কাগজটা সারকিট সেনগুপ্তর নজরে পড়েছে। "আপনিও দেড়শ বছরের ডেলি ক্যালকাটা ছেড়ে বাইরের কাগজে সুইচ অন করলেন। আমার রিপোর্ট ছিল, বাঙালিরা এখনও ভীষণ অনুগত পাঠক। ওয়াইফ পাল্টাবে তবু পেপার পাল্টাবে না।"

"আমি কাগজটা বিনা পয়সায় পেলাম, সেনগুপ্ত মশাই।"

সুকৃৎ বললেন, "সিনিয়র সিটিজান সেক্টরেও তা হলে ওরা ফ্রি সাম্পলিং আরম্ভ করলো!"

"সেটা কী জিনিস, আমি সারকিটের কাছ থেকে জানতে চাই।"

সারকিট সেনগুপ্ত চমৎকার ব্যাখ্যা করলেন। "আগে লোকাল ট্রেনে কবিরাজ কালীপদ দে'র আশ্চর্য মলম বিক্রেতারা যা করত—নিত্যযাত্রীদের মধ্যে নিয়মিত নমুনা বিতবণ। যদি কিছু না মনে করেন, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরও তাই করেছিলেন। নরেন জিজ্ঞেস করলো, আপনি ঈশ্বর দেখেছেন? ঠাকুর জানালেন, শুধু দেখেছেন নয়, নরেনকেও দেখাতে পারেন। তারপর একটু ঈশ্বরদর্শনের স্যাম্পল দিলেন, তবে তো বিবেকানন্দর মতন মানুষ ওঁকে হৃদয়ে গ্রহণ করলেন।"

সারকিট সেনগুপ্ত পারেনও বটে, মার্কেট রিসার্চের মধ্যেই বোধহয় মানুষটা ঈশ্বরের সন্ধান পেয়ে যাবে।

বিনামূল্যে বিতরণের রহস্যটা এবার আমাকে সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়া

হলো। সারকিট বললেন, "যারা নমুনা পাচ্ছেন তাঁদের দশ শতাংশ হয়তো কাগজটা কিনতে আরম্ভ করবেন। তা হলেই প্রকাশনা কোম্পানির কেল্লা ফতে।"

আমি সুকৃৎকে বললাম, "খবরের কাগজে বলছে, ভাগ্যবান মানুষদের ১,১৬,০০০ ঘণ্টা অফিসে কাটে। আমার ভাগ্যে কত ঘণ্টা কম জুটলো তা আজ হিসেব করব বাড়িতে গিয়ে।"

"অবশ্যই করবেন। তবে কলকাতার লোকরা নিতান্ত ভাল মানুষ। তারা ভাবতে আরম্ভ করে কোন কর্মফলে আমার নির্ধারিত সময়টা কম হলো? আপনি কিন্তু ও পথে যাবেন না। আপনি যদি দেখেন রিপন স্ট্রিট আপনাকে দশ হাজার ঘণ্টা কম দিয়েছে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে মতলব আঁটুন, বছরে দু'হাজার ঘণ্টা হিসেবে কী করে আগামী পাঁচ বছরে ঘাটতিটা মিটিয়ে ফেলা যায়।"

আমাকে সুখানির সঙ্গে যোগাযোগ বাখতে বলছেন সুকৃৎ ওরফে সারকিট সেনগুপ্ত। আমার মনোবল চাঙ্গা করার জন্যে সারকিট সেনগুপ্তর প্রশ্ন, "কর্মী হিসেবে আপনার কী নেই যা একটা কোম্পানি কাজে লাগাতে না পারে?"

বিনয় সুখানির ব্যাপারটা মুখ ফুটে বলা যাচ্ছে না। আমার স্ত্রীর রত্না বউদি, মাসতুতো দাদা সুরেন ভট্টাচার্য এঁরা ব্যাপারটা কীরকম যেন গুলিয়ে দিয়েছেন—এ কথাও মুখে আসতে চাইছে না।

আমি লজ্জার মাথা খেয়ে সারকিটকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার এই মার্কেট রিসার্চের কাজে আমাকে জড়িয়ে নিতে পারেন না?"

সুকৃৎ ক্ষমা চাইলেন। জড়াতে পারলে নিশ্চয় জড়াতেন। কিন্তু কলকাতায় তালাচাবি লাগিয়ে সারকিট এখন বাঙ্গালোর যাচ্ছেন দু'বছরের জন্যে।

"হতাশ হয়ে সারকিটকে প্রশ্ন করলাম, মানুষ কেন এই অঞ্চল থেকে থেকে চলে যেতে ব্যস্ত, বলুন তো। কলকাতার লোকরা কি সত্যিই কর্মবিমুখ?"

সারকিটের স্পষ্ট উত্তর : "একেবারে বাজে কথা। এখানকার কর্মবিমুখরাই তো অন্য রাজ্যে গিয়ে সোনা ফলাচ্ছে। আসলে ভাঁটার সময় চলেছে এই বাংলায়। ভাঁটার টানে সেরা লোকদেরও বদনাম রটছে।"

এই মুহূর্তে পোস্টাপিসমুখো আমি। খুব সাবধানে পথ হাঁটছি। পোস্টাপিসের সামনে স্বল্পসঞ্চয় এজেন্ট নরপতি সামন্ত আমার জন্যে খুব অপেক্ষা করছেন।

আমার অত্যধিক সাবধানতার কারণ আমার পকেটে অনেক টাকা। একটু আগেই ব্যাঙ্ক থেকে চেক ভাঙিয়ে ক্যাশ তুলেছি। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অফিসার আবার অনুরোধ করেছিল, "কেন তুলছেন? এখানেই রাখুন না?"

আমার উত্তর, "আপনাদের সুদ তো এতো কম, খাবো কী? সুদেই সংসার চালানো যাবে এই ভেবেই তো জনদরদী সরকার এতো উৎসাহ নিয়ে ভি-আর-এস ফেস্টিভ্যালে নেমেছেন।"

"পোস্টাপিসেই হায়েস্ট সুদ।" নরপতিবাবু সগর্বে বলেছিলেন, "স্বল্প সঞ্চয়ের ব্যাপারে আমাদের এই নিশ্চিত রাজ্যই হায়েস্ট। কাগজে দেখেননি রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সগর্ব ঘোষণা?"

"তা হবে না কেন? কোথায় আর এতো মানুষ প্রত্যেকদিন ভি-আর-এস কাগজে সই করছে? অবস্থার চাপে পড়ে, ভয়ে পড়ে, বাধ্য হয়ে মানুষ নিজের ভবিষ্যৎটা বন্ধক রেখে কোনোক্রমে প্রতিদিনের খিদে মেটাচ্ছে।"

এই যে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে পোস্টাপিসে নগদ জমা দেওয়া, এও নরপতি সামন্তর প্রাইভেট উপদেশ অনুযায়ী। পোস্টাপিসে চেক দিলে

একূল ওকূল দুকূল গেল। কবে যে পোস্টাপিস ওই চেক ভাঙাবে তা বিশ্বসংসারের কেউ জানে না। ওখানে কারও ব্যস্ততা নেই, কারণ চেকের টাকা উসুল না-হওয়া পর্যন্ত ডাকঘরে সুদের মিটার চালু হচ্ছে না। "অথচ আপনার সুদ তো দরকার?"

নরপতিকে আমি বললাম, "অবশ্যই দরকার। এই দেখুন না, কী করবো ভেবে ভেবে এবং সুদের হিসেব কষতে কষতে ব্যাঙের আধুলিতেই হাত পড়ে গিয়েছে। বেশ কিছু টাকা ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে গিয়েছে। টাকা হচ্ছে মেথিলেটেড স্পিরিটের মতন। বোতলের ছিপি খোলা থাকলে কাউকে কোনও খবর না দিয়েই সব উবে যাবে আপনা-আপনি। স্বল্পসঞ্চয় থেকে স্বল্পব্যয় যে শতগুণ দ্রুতগামী তা ভি-আর-এসের লোকরা ভালভাবেই জানেন।"

অতএব কারও দয়ায় না থেকে একটা পদক্ষেপ কমিয়ে দেওয়া। বলরাম বিশ্বাসের পকেটে কখনও এতো টাকা প্রবেশ করেনি, এগুলো আমার নিজস্ব টাকা ভাবতেও বেশ ভাল লাগছে, এই টাকা সুদ নামক বাচ্চা পাড়বে এবং তার ওপর নির্ভর করে জীবনের সবকটাদিন কাটাতে হবে ভাবতে মনটা আতঙ্কে ভরে ওঠে।

পোস্টাপিসের পথে পকেটমার সজাগ থাকতে পারে এই আশঙ্কায় বুক ঢিবঢিব করছিল। পকেটমারদের দয়ামায়া বলে কোনও বস্তু নেই। অবশ্য থাকবে কী করে? ওরা লাইন ছাড়তে চাইলেও কেউ তো ওদের ভি-আর-এস দেবে না।

পোস্টাপিসের গেটের সামনেই উত্তেজিত অবস্থায় অপেক্ষা করছেন এজেন্ট নরপতি সামন্ত। দুঃসংবাদ। আজ সকাল থেকে গভর্নমেন্ট স্বল্পসঞ্চয়ের সুদ ভীষণ কমিয়ে দিয়েছে।

"তার মানে?" আমি জানতে চাই।

গতকাল পর্যন্ত নরপতি সামন্ত যাঁদের টাকা স্বল্পসঞ্চয়ে জমা দিয়েছেন আগামী ছ'বছর তাঁরা পুরনো হারে সুদ পাবেন।

নরপতি সামন্ত গতকালই আমাকে টাকা নিয়ে আসতে রিকোয়েস্ট

করেছিলেন। "আমি ভাবলাম, বেস্পতিবার টাকাটা তুলবো!"

"মশাই, আপনার টাকা তো আপনার নামেই থাকতো। এখন আপনার অনেক টাকা লোকসান হয়ে গেল।"

আমি আফসোস করছি। সেইসঙ্গে মনে মনে হিসেব করছি। "এই সুদ কমে যাওয়ার মানেটা কি?"

এজেন্ট নরপতিবাবুর বিজনেসের ক্ষতি হবে প্রচণ্ড। বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, "মানেটা হল মধ্যবিত্তকে গরিব করে বড়লোককে আরও বড়লোক করা। বড়লোকরা নিত্য আব্দার করছেন ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে সুদের গুনতে কোম্পানিগুলোর ভাল লাগছে না, গভর্নমেন্টের নিজেরও ভাঁড়ে-মা-ভবানী, ধারের ওপর সরকারী সংসার চলছে, অতএব ধাক্কা মারো তাদের যারা নিজেদের সর্বস্ব অপরের কাছে গচ্ছিত রেখে সুদের টাকায় সংসার চালাতে চেষ্টা করছে।"

নতুন সুদের মৌখিক অঙ্কটা কষতে গিয়ে আমার শরীর কিন্তু হিম হয়ে আসছে। মাসের গোড়ায় যে টাকা পোস্টাপিস থেকে প্রত্যাশা করছিলাম তা অনেক কমে যাবে।

"একটুর জন্যে আপনি আটকে গেলেন। মাত্র একটা দিনের জন্যে স্রেফ....," দুঃখ করলেন নরপতিবাবু।

আমি ভাবছি বাড়ি গিয়ে উপাসনাকে কী বলবো! জিজ্ঞেস করবো "এতো সুযোগ থাকতে সে একটা ব্লাডিফুলকে বিয়ে করেছিল কেন?"

একটু আগে তুলে নেওয়া টাকাটা নিয়ে আমি ব্যাক-টু-ব্যাঙ্ক। ঘরের ছেলেকে মাথা নিচু করে ঘরে ফিরে আসতে দেখে ব্যাঙ্কের অফিসাররা বেশ খুশি। ওরা ভয় দেখাচ্ছে ব্যাঙ্কের সুদও কমবে, তার আগে ঝটপট টাকাটা এফ. ডি.-তে সরিয়ে দিন। কিন্তু ব্যাঙ্ক যে সুদ দেয় তাতে আমার আর্থিক অবস্থা হয়ে উঠবে আরও শোচনীয়। এখন বরং টাকাটা নিজেব অ্যাকাউন্টেই থাকুক, একটু ভেবে দেখা যাক।

নরপতিবাবু পরের দিন বাড়িতে এসে আমার খোঁজ করেছেন। সঙ্গে এনেছেন তাঁর শ্যালককে। শালাবাবুও এই সঞ্চয় লাইনে কাজ করেন।

নরপতির শ্যালক বললেন, "পোস্টাপিসে সুদ কমিয়ে বোকামি সরকারই করছে। পাবলিক অত মাথামোটা নয়, তারা ডাকঘরের স্বল্পসঞ্চয় এড়িয়ে অন্য জায়গায় চলে যাবে?"

"কোথায় যাবে তারা?" আমি জানতে চাই।

শালাবাবুব ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। "আছে আছে, অনেক পথ আছে। সুদও বেশি, ব্যবস্থাও ভাল। ঝটপট ব্যবস্থা করা যায়।"

রহস্যটা ভাঙছেন না শালাবাবু। তবে আশ্বাস দিচ্ছেন. এমন একটা ব্যবস্থা সম্ভব যা আমাকে অপ্রত্যাশিত আনন্দ দেবে।

শালাবাবু এবার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি এতোদিন কোন কোম্পানিতে কাজ করতেন?"

বললাম, "গুড্‌হাউস ইন্ডিয়া লিমিটেড।"

"আরে মশাই, তা হলে আপনার আর ভাবনা কি? গুড্‌হাউস খুব ভাল সুদে তিন বছরের জন্য জমানত নিচ্ছে। পোস্টাপিসে আগে যা সুদ দিচ্ছিল তার থেকেও দু'পার্সেন্ট বেশি পাবেন। তার মানে আপনাকে মারতে গিয়ে গভর্নমেন্ট নিজেই মার খেয়ে গেল।"

শালাবাবু বললেন, "বিশ্বাসমশাই আপনার পুরনো কোম্পানি। আপনি নিজে গিয়ে রিপন স্ট্রিটের কাউন্টারে টাকা জমা দিয়ে আসতে পারেন। অথবা আমার হাতেও কোম্পানির নামে চেক দিতে পারেন।"

নরপতি বললেন, "ওকে চেক দেওয়ার অনেক সুবিধে, এককাঁড়ি কাঁচা টাকা নিয়ে আপনাকে গাঁটের কড়ি খরচ করে কোম্পানির রিপন স্ট্রিট আপিসে ছুটতে হল না। আপনার বাড়তি সুবিধে হাতে হাতে নগদ ইনসেনটিভ পেয়ে যাচ্ছেন শালাবাবুর কাছ থেকে।"

ইনসেনটিভ— উৎসাহিকী! সেটা কী জিনিস?

শালাবাবু উত্তর দিলেন, "আপনারা শিক্ষিত লোক, আপনাদের বাড়িতে দু'দশখানা অভিধান সাজানো আছে, আমি কী বলবো? মোদ্দা কথাটা হলো, সরকারী পোস্টাপিস আপনাকে ডিস-ইন্সেন্টিভ দিলো, অর্থাৎ নিরুৎসাহ করল, আর আপনার পুরনো কোম্পানি আপনাকে 'উৎসাহ'

দিয়ে কাছে টেনে নিলো। শুধু আপনার কোম্পানি নয়, আরও কিছু কোম্পানি একই স্কিমে উৎসাহ ছড়িয়ে দিচ্ছেন।"

"না মশাই, জানাশোনা কোম্পানিই টাকা রাখার পক্ষে ভাল।"

চিন্তা করবার জন্য আমি একদিনের সময় চাইলাম। একটু ভেবে দেখা যাক। সকালে সুরেন সরকারের ওখানে চলে গেলাম। সুরেনের দরজায় এখনও সেই পুরনো হলদে নোটিশ ঝুলছে। চললাম ঢেকো বোসের কাছে। বোসমশাইও অনুপস্থিত, সপরিবারে সাতসকালে তারকেশ্বরে গিয়েছেন মানত করতে। বন্ধু নগেন চৌধুরীও বেপাত্তা—টোটো কোম্পানির ম্যানেজার হয়ে উঠছেন অবসরিকার প্রাণপুরুষ নগেন চৌধুরী। আমি যদি হঠাৎ বড়লোক হই তাহলে ওকে একটা সেলুলার ফোন উপহার দেবো।

নরপতিবাবু অ্যান্ড শ্যালক আবার বাড়িতে হাজির হয়েছেন। ওঁদের আশঙ্কা গুড্‌হাউস কোম্পানি শুধু সুদের হার কমাবে তা নয়, হয়তো এইভাবে টাকা নেওয়াই বন্ধ করে দেবে।

শালাবাবু বললেন, "সরকারের উসকানিতে সুদ কমাবার একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছে, দেখছেন না!"

ঠিকই বলছেন এঁরা। নেড়া বেলতলায় যায় ক'বার? আর দেরি করা যুক্তিযুক্ত হবে না। আমি গুড্‌হাউস কোম্পানির ফর্মটা বোঝাই করে, উপাসনাকে দিয়েও একটা সই করিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। হঠাৎ আমার একটা কিছু হয়ে গেলে উপাসনা বিশ্বাস ইজ সেফ, জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে মাস মাস টাকাটা পেয়ে যাবে। আর বাড়তি যে টাকাটা পাওয়া যাবে তাতে সহজেই একটা খবরের কাগজ নিয়মিত নেওয়া যাবে। উপাসনা যাই বলুক, আনন্দবাজারটা ও মিস করে। তবে ওর যা প্রকৃতি, যত কষ্টই হোক মুখ ফুটে নিজের কোনও দুঃখই সে অবসর-পাওয়া স্বামীর কাছে প্রকাশ করবে না।

৮

তে খবর দেখছি। পোস্টাপিসের সুদের হার কমাবার জন্যে বণিকসভার চাঁইরা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। পিটিআইকে ধনকুবের সঙ্ঘের সভাপতি বলেছেন, ভারত এবার ঠিক পথে এগোতে শুরু করেছে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী রুটিন সমালোচনা করেছেন কেন্দ্রমন্ত্রীকে। সুদের হার কমানোর জন্যে নয়, এর ফলে রাজ্য যদি স্বল্পসঞ্চয় থেকে কম টাকা পান তাহলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমশাইকে আরও গালি দেওয়া হবে।

নগেন চৌধুরী অবশ্য সুদের ব্যাপারে ততটা চিন্তিত নন। তিনি মাত্র দু'সপ্তাহ আগে তাঁর সঞ্চয় ছ'বছরের জন্যে রিনিউ করিয়েছেন স্থানীয় ডাকঘরে। ছ'বছর অনেক সময়। পৈত্রিক শরীরকে ছ'বছর টিকিয়ে রাখাটাই এখন মস্ত কাজ। সম্পাদক ঢেকো বোস সুদসংক্রান্ত খবর পড়েন না। তিনি বললেন, "ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়, আমার আসলই নেই তো সুদ। আমার একমাত্র ইনভেস্টমেন্ট হলো আমার পুত্র, সে খারাপ করছে না।"

আর আমার সহপাঠী বন্ধু স্যার সুরেন্দ্রনাথ? তার তো অনেক টাকা, কয়েক পার্সেন্ট সুদের হেরফেরে তার কী এখন এসে যাবে? কিন্তু মানুষটা গেলো কোথায়?

আমি এবং আমার চেনাজানা মানুষদের জীবন ঝিমিয়ে পড়া নদী, সামান্য জল আছে, কিন্তু স্রোত নেই। যে খরস্রোতা জীবনের কথা আমরা নিত্য টিভি-তে দেখি, সংবাদপত্রে পড়ি, তার সঙ্গে এই জীবনের কোনও সামঞ্জস্য নেই। এই জন্যেই কেউ বোধহয় ভাবে না আমাদের কথা। ভি-

আর-এসটা শুধু স্বেচ্ছা অবসর নয়, জীবনের মূল প্রবাহ থেকেও বাধ্যতামূলক বিদায়।

কে জানে, পৃথিবীতে চিরকালই হয়তো এমন হয়েছে। যে দুর্বল, দরিদ্র ও অপারগ সে জায়গা করে দিয়েছে তাকে যার শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে এবং গতি আছে। আমার সহধর্মিনী উপাসনা ভাগ্যবতী। সে এসব নিয়ে ভাবে না। সে পরিপূর্ণ নির্ভর করে বসে আছে তার সন্তোষী মায়ের ওপর। তার বিশ্বাস, তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। সে চায়, আমার ভাল হোক, সেইসঙ্গে আমার জানাশোনা সবার মঙ্গল হোক। পুজোর সময় সে মায়ের কাছে তার চেনাজানা কতজনের জন্যে যে প্রার্থনা করে।

আর আমি? যেন অর্ধমৃত-অর্ধজীবিত এক পশু। কত কি ভাবছি, কত কি হিসেব করছি, কিন্তু সবেগে উঠে পড়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করছি না। কে জানে, সায়াহ্ন শিখরে অস্তরাগের সময় সূর্যদেবও বোধ হয় এই রকম কর্মবিমুখ হয়ে পড়েন। পৃথিবীর কেউ অবশ্য এসবের হিসেব রাখার প্রয়োজন মনে করে না।

ভাবছি ফেলে আসা জীবনের কথা। ভাবছি আমার নবজীবনের নবপরিচিতদের কথা।

সুরেন সরকারের কথাও ভাবছি। আমাদের মধ্যে সুরেনই অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান। ঢেকো বোস যতই সুখে থাকুন তিনি পরনির্ভর, ছেলের কাছ থেকে তাঁকে বাসভাড়া নিতে হয়। নগেন চৌধুরী একলা মানুষ, দুঃখকে এবং দারিদ্র্যকে আজকাল তেমন তোয়াক্কা করেন না। সেনকো পরিবারও একটা নতুন চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছেন।

প্রবাস জীবনের সুরেন সরকার স্বেচ্ছায় এই কলকাতায় ফিরে এসেছে। অশ্বিনীনিবাসে ফ্ল্যাট কেনা হয়ে গেলে ওর হাতে যে টাকা থাকবে তাতে মনের আনন্দে অবশিষ্ট জীবন চালিয়ে যাবে। যাওয়া মানে তো আর অন্তহীন যাওয়া নয়, এ যাওয়া রাতের শেষ ট্রামে ডিপোতে পৌঁছানো। কোথাও কোনও চোখের জল নেই, শেষ পর্যন্ত আশ্রয়ে পৌঁছতে পারছে

এটাই তো যথেষ্ট।

সুরেন সরকার আজকাল মজার মজার কথা বলে। সে বলে, "বুড়ো বয়সে সংসার সুখের হয় ব্যাঙ্কের গুণে। ব্যাঙ্ক ছাড়া সব পুরুষ-রমণী ভূমিকা বৃদ্ধ বয়সে অপ্রধান হয়ে পড়ে। কলকাতায় অসংখ্য চেনাজানা মানুষের যে ব্যাঙ্কের জোর নেই তা সুরেনকে বেদনা দেয়। তার আরও দুঃখ, এই আশ্চর্য শহরে যারা আজন্ম বসবাস করে এসেছে তারা কেন মহানগরীর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে না? আমি সুরেনকে বোঝাবো, এইটাই বিশ্বসংসারের নিয়ম, এই ধারাই চলে এসেছে অনন্তকাল থেকে। বৈশালী, পাটলিপুত্র, এথেন্স, রোম, লন্ডন কোনও শহরেই সমকালের নাগরিক তেমনভাবে অনুভব করেননি বিশেষ কোনও মহত্ত্বের উপস্থিতি।

আমার একটাই সন্তুষ্টি রয়ে গেলো, শত শত দুঃখের মধ্যে অন্তত একজন স্যর সুরেন্দ্রনাথকে কিছুটা সুখী এবং চিন্তামুক্ত দেখতে পেলাম।সে ঠিক সময়েই ফিরে এসেছে নিজের শহরে শেষ বয়সের ইচ্ছা সব সাধ-আহ্লাদ মিটিয়ে নিতে।

গত রাতে বাড়ি ফিরে আমি এই পর্যন্ত লিখেছিলাম আমার লেখার খাতায়। আমি নিজের খেয়ালে খাতায় আবোল তাবোল লিখে যাচ্ছি, কেন লিখছি তাও জানি না। ইতিহাসের পাতায় নাম লেখার জন্যে অবশ্যই এই লেখা নয়। ছাপার অক্ষরে পাঠক-পাঠিকার কাছে পৌঁছোনোর দুঃসাহস অবশ্যই আমার মনের কোণে স্থান পায় না। অনাগত বংশধররা একদিন জীবনযুদ্ধে নিষ্পেষিত পূর্বপুরুষের ইতিবৃত্ত পাঠ করবে সে পথও যে খোলা নেই তা নিঃসন্তান বলরাম বিশ্বাসের থেকে ভালভাবে কেউ জানে না। এই লেখাটা কেবল নিজের জন্যেই লেখা, নিজেকে নিজের কাছে মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেওয়ার বাতুলতা। অর্থাৎ এই জীবনকথা অফ বলরাম বিশ্বাস ইজ বাই বলরাম বিশ্বাস ওনলি ফর বলরাম বিশ্বাস।

কিন্তু লেখার একটা শেষ চাই তো। ভি-আর-এস-এর টাকাটা নানা বাধাবিপত্তি পেরিয়ে নিজের কোম্পানিতেই ফিক্সড ডিপোজিটে পাঠিয়ে

দেওয়া হলো, একটু বীরত্ব একটু সহানুভূতি, একটু ত্যাগ দেখিয়ে বিনয় সুখানির অফিসে কাজটা ফলোআপ না করে উপাসনার দাদার সংসারটা কিছুদিনের জন্যে রক্ষা করা গেলো, এটা তো তেমন একটু মনপসন্দ পরিণতি নয়।

সুরেনবাবু এবং ঢেকো বোসের সঙ্গে একদিন আলোচনা হচ্ছিল। ওঁরা বলছিলেন, আত্মকথার প্রধান আকর্ষণই হলো তার অসমাপ্তি। পৃথিবীর কোনও অটোবায়োগ্রাফি আজ পর্যন্ত কমপ্লিট হয়নি। কারণ এই পৃথিবীর মহাশক্তিমানও তো মৃত্যুর পরে আত্মজীবনীর শেষ লাইনটা লিখে যাবার অধিকারী নন।

আসলে তিব্বতীদের কথা ধরলে, এই মানবজীবনটারই তো সমাপ্তি নেই। সব সময় সব অবস্থায় অসম্পূর্ণ— ইনকমপ্লিট। একটা অধ্যায় থেকে কেবল আরেকটা অধ্যায়ে যাবার প্রস্তুতি।

এবার তাই সুরেন সরকারের শেষ পর্বটা ঝটপট বলে ফেলি। সুরেন সরকার ও তাঁর ওয়াইফ একখানা চিঠি লিখে আমাকে এবং অবসরিকাকে বিপদে ফেলেছিলেন।

ব্যাপারটা এইরকম। আমি মাঝে মাঝে সুরেনের বাড়ি গিয়ে দরজায় সাঁটা হলদে বিজ্ঞপ্তির ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছি। পাবো কী করে তাঁদের? দত্তপুকুরে গিয়ে ঊষাকিরণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ওইখান থেকেই অ্যাম্বুলেন্সে সোজা ঊষাকে নিয়ে নার্সিংহোমে তুলেছে সুরেন সরকার। প্রথম দিকে খরচ সম্পর্কে কখনো চিন্তা করেনি সুরেন সরকার। ফলে কয়েকদিনের মধ্যে লাখখানেক টাকা নার্সিং হোমকে দিয়েছে সুরেন

সরকার। আফটার অল টাকা কী জন্যে? সুরেন বলেছে, উই ওয়ান্ট দ্য বেস্ট অ্যাটেনশন। কী বলো রাতুল? 'কাকু'র সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়েছে রাতুল সরকার, যার ওপর সরকারদম্পতি উভয়েই বিপুল বিশ্বাস করে বসে আছে।

মনে রাখতে হবে এই রাতুল সরকারের সঙ্গে সুরেন সরকারের প্রথম সাক্ষাৎ কলকাতায় হয়নি। দু'জনের প্রথম আচমকা দেখা হয়েছে পুনেতে। ঊষাকিরণ সরকার যখন শুনেছে, এই রাতুলের বাড়ি দত্তপুকুরে, তখন ভীষণ খুশি হয়েছে এই মহারাষ্ট্র তনয়া। ঊষা জানে, দেশের লোক দেখলে ভীষণ খুশি হয় তার স্বামী।

রাতুল সরকার একেবারে গাঁয়ের লোক। দুজনের একই টাইটেল। তার ওপর ছেলেটি সুরেনকে প্রথম দর্শনেই কাকু বললো। বিজনেসের টানে ভাগ্যসন্ধানে ঘরছাড়া হয়ে রাতুল হাজির হয়েছে পুনেয়, যেমন অনেকদিন আগে স্বয়ং সুরেন সরকার এই পুনেতে উপস্থিত হয়েছিল।

তারপর ছোটখাট অনেক ঘটনার বিবরণ রয়েছে। রাতুল সরকার আশ্রয় পেয়েছে, সাহায্য পেয়েছে, স্নেহ পেয়েছে এবং বিশ্বাস অর্জন করেছে। আসলে সুরেন ও তার স্ত্রী স্বদেশেব কাউকে বিশ্বাস করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করেছিল। ফলে অচিরেই রাতুলের নিজস্ব বিজনেস হয়েছে, সুরেন সরকারের গ্যারান্টিতে পুনে শহরে বাড়ি ভাড়াও পেয়েছে সে। বাড়ি হয়েছে, কিন্তু রান্নার চাপ তেমন পড়েনি, সুরেন সরকার ও তার স্ত্রীর সঙ্গে নিয়মিত সান্ধ্যভোজন পর্ব সেরেছে রাতুল সরকার।

এই রাতুল সরকারের নিয়মিত যাতায়াত ছিল কলকাতায়। এখানকার পাটালি, এখানকার খেজুর গুড়, এখানকার 'জয়নগরের মোয়া' সহজেই হৃদয় হরণ করেছে সুরেন সরকারের, ছেড়ে আসা দেশ সম্বন্ধে জাগিয়ে তুলেছে এক নতুন মায়ামোহ। রাতুল সরকার বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করে এনেছে সুরেনদের দত্তপুকুরের সম্পত্তি সম্পর্কে। সেই পৈত্রিক সম্পত্তি যে এখন বেশ মূল্যবান হয়ে উঠেছে সে খবরও সুরেন পেয়েছে রাতুলের মাধ্যমে। সুরেনের কেমন ধারণা হয়েছিল, ওয়েস্ট বেঙ্গলের অধঃপতনের

সঙ্গে এরাজ্যে জমির দাম কমে গিয়েছে। কিন্তু এ এক নতুন পরিস্থিতি, রোজগার কমলেও পশ্চিম বাংলার গ্রামেগঞ্জে জমির দাম বেড়েই চলেছে।

এরপর সুরেন সরকার একবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। রাতুলই তখন সব। সে শুধু নিয়মিত হাসপাতালেই যাতায়াত করেনি, সরকারের দৈনন্দিন বিজনেসেও যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। একেবারে ফ্যামিলি মেম্বার বলতে যা বোঝায়। তারপর একসময় সস্ত্রীক সুরেন সরকারের কলকাতায় ফিরে আসবার পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে রাতুলের সামনে। রাতুল অবশ্যই উৎসাহ দিয়েছে। কাকু কলকাতায় ফিরে আসবার আগেই রাতুল আর একটা ছোটখাট ব্যবসা কলকাতায় শুরু করে দিয়েছে। এখানে একটা ব্যবসা না থাকলে কলকাতায় ফিরে আসা কাকুর কাছে ঘন ঘন ছুটে আসবার ছুতো খুঁজে পাবে কী করে?

এবার কলকাতায় ঊষার অসুখের সময় নার্সিংহোমে বসে বসে একের পর এক চেক কেটে গিয়েছে সুরেন সরকার, কখনও মনের মধ্যে কোনো চিন্তার উদয় হয়নি। পুনের সমস্ত সম্পত্তিতে ঊষারও নাম ছিল। সম্পত্তি হস্তান্তরের কিছু কিছু কাগজপত্র নার্সিং হোমেই দু'জনে সই করেছে। তাদের অনেক সৌভাগ্য, রাতুল সারাক্ষণ পাশে পাশে রয়েছে।

সুরেন সরকারের ধারণা রাতুল কাজের ছেলে। সে জানে বিষয় সম্পত্তি বেচে দিয়ে সুরেন সরকার এবার ঝাড়া হাত-পা হতে চায়। থাকার মধ্যে থাকবে সাউথ ক্যালকাটায় একটা ফ্ল্যাট। তাই দত্তপুকুরে সুরেন সরকারের পৈতৃক প্রপার্টির জটও রাতুল পরিষ্কার করেছে নিজের চেনাশোনা উকিল লাগিয়ে। বিষয়-সম্পত্তির সব ভাল, ওই ওকালতি অংশটুকু ছাড়া, বলতো সুরেন সরকার। বিদেশে বড়লোকেরা কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পরে তদ্বির-তদারকের হাঙ্গামায় যেতে চান না। ব্যাঙ্কের গচ্ছিত লিকুইড টাকাকেই তাঁরা সেরা টাকা মনে করেন। সুরেন সরকার এই সব ধনকুবেরদের তুলনায় সামান্য হলেও একই পথ অনুসরণ করবে।

অবশেষে ঊষাকে নিয়ে ভাড়াটে বাড়িতে ফিরে এসেছে সুরেন সরকার।

সুরেনের ব্যাঙ্কের টাকা এখনও বেশ কিছুটা কমলেও তত নিঃশেষ হয়নি। ঊষা যখন প্রায় সুস্থ হয়েছে তখনই আচমকা বিপদ নেমে এলো। গভীর রাতে সুরেন সরকার নিজেই এবার অসুস্থ হয়ে পড়লো। উডল্যান্ডসের অ্যামবুলেন্স এসে সুরেনকে নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়েছে, সঙ্গে ঊষাও গিয়েছে। পুরনো অসুখগুলো এবার সদলবলে আক্রমণ করেছে সুরেন সরকারের দুর্বল শরীরকে। শেষ বয়সে নিঃসঙ্গ স্বামী-স্ত্রী একইসঙ্গে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে এ-কথা সাধারণত কারও মনে থাকে না, ফলে সে ধরনের প্রস্তুতিও থাকে না।

সুরেনের অসুস্থ হওয়ার খবরটা পেলাম একটা স্লিপের মাধ্যমে। সুরেনের স্ত্রী লিখছে একবার যেন দেখা করি। তখন বিকেলবেলা। সুরেনের ভাড়ার ফ্ল্যাটে ওর সঙ্গে দেখা হলো। এই ক'দিনে মানুষটা বেশ কয়েক বছর বুড়ো হয়ে গিয়েছে। সুযোগ পেলে রোগ যে মানুষের সর্বস্ব হরণ করে তা সুরেনকে দেখেই বুঝতে পারছি। এই দেহপটের যে কোনও মূল্য নেই, স্থায়িত্ব নেই তা বুঝতে গেলে মাঝে মাঝে অসুস্থ মানুষের কাছে যাওয়া প্রয়োজন।

সুরেনের যে রোগ তার বোধহয় নিরাময় নেই। কিন্তু লড়াই আছে। এই লড়াই ডাক্তারেরা চালিয়ে যান বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে। শরীর যেমন দায়িত্ব আর পালন করতে অনিচ্ছুক তা করবার জন্যে যন্ত্রদের নির্দেশ দেন চিকিৎসকরা। তেমন প্রয়োজন হলে ধর্মঘটী অঙ্গকে বিচ্ছন্ন ও বিদায় করো, সেইখানে আনো নতুন অঙ্গ অথবা নতুন যন্ত্র।

অর্থাৎ সুরেনকে সপ্তাহে অন্তত দু'বার বাড়ি থেকে হাসপাতালমুখো হতে হবে। ওখানে ব্যবস্থা সব সুন্দর, তবে প্রয়োজন অর্থবলের। এই সংসারে বিনা পয়সায় ভোজন বা ফ্রি-লাঞ্চ বলে যে কিছু নেই তা সুরেনের অজানা নয়। সেই জন্যই তো পুনেতে অর্থ উপার্জন করেছে সুরেন এবং সে সব তো কলকাতায় এল বলে।

আমি লক্ষ্য করলাম, অসুস্থ সুরেনের প্রবল উদ্বেগ রাতুলকে নিয়ে। ক'দিন এই ছোকরাটির কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। সুরেনের আশঙ্কা,

বিভিন্ন গ্রহের যৌথ ষড়যন্ত্রে একই সংসারের তিন জন অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। উষাকিরণ কখনও স্বামীর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যায় না। স্বামী যা বলেন তাই নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে নেবার সহজাত শক্তি নিয়েই যেন কোনও কোনও সহধর্মিণী জন্মগ্রহণ করে।

উষা ভাবছে, সুরেন যা আশঙ্কা করছে তাই হওয়াই স্বাভাবিক। ষড়যন্ত্রকারী গ্রহমণ্ডলের তাড়নায় রাতুল সরকার কোথাও শয্যাশায়ী হয়ে আছে।

হাসপাতালে ডায়ালিসিসে যাবার আগে স্যর সুরেন আমাকে একদিন খবর পাঠিয়েছে। রাতুলের খোঁজ পাবার জন্যে সে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। এই রাতুল সরকারের সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপারে সে কতটা নির্ভরশীল, তার সম্পত্তি বিক্রির ব্যাপারে রাতুলের ভূমিকা কী, এসব আমার জানা ছিল না।

সুরেন যে ক্রমশ অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠছে তা পরের দিন থেকে বুঝেছি। সে এখনই রাতুলের খবর চাইছে। হাসপাতালের ডায়ালিসিস মেশিনে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার জন্যে বন্দি হওয়া সুরেন প্রথম দর্শনেই খরচের কথা তুলেছে। বলছে, এক একটা চিকিৎসা যন্ত্র কারেন্সি নোট ছাপার মেশিনের চেয়েও দ্রুতগতিতে বিল করতে চায়। অসুখের ক্ষেত্রে কয়েক লক্ষ টাকা যে কিছুই নয় তা ক্রমশ আমার কাছেও স্পষ্ট হচ্ছে। সেই কবে নির্বাসিত অসকার ওয়াইল্ড্ রোগ জর্জরিত অবস্থায় প্রবাস থেকে প্রিয় বন্ধুকে লিখেছিলেন, নিজের সাধ্যের অতীত ব্যয় করে কেউ কেউ জীবনধারণ করেন, আর আমি মরবার জন্যেও সাধ্যের অতীত খরচ করছি!

সুরেনের মুখ চেয়ে আমি একটা ঠিকানায় গিয়েছিলাম, কিন্তু রাতুল সরকারের খোঁজ পাইনি। অবশেষে বাতুলের পাত্তা পেয়েছি দত্তপুকুরে। সে মোটেই অসুস্থ নয়, চমৎকার স্বাস্থ্য নিয়ে মনের আনন্দে নিজের এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুরেন সরকারের সঙ্গে দেখা করার কোনও তাগিদ রাতুলের মধ্যে লক্ষ্য করলাম না। বাতুল সরকার নাকি এখন ভীষণ

ব্যস্ত, সে যাচ্ছে পুনে শহরে নিজের বিজনেসের কাজে।

রাতুলের খবর আমি অসুস্থ সুরেন এবং প্রায় অসুস্থ তার স্ত্রীকে যথাসময়ে দিয়েছি।

এরপর অসহায় সুরেন যে আইনজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, আইনজ্ঞ যে রাতুলকে পাকড়াও করে একবার সুরেনের রোগশয্যায় এবং পরে স্থানীয় থানায় হাজির করিয়েছেন এসব আমার অজ্ঞাত ছিল।

সমস্ত ব্যাপারটা যখন স্পষ্টভাবে জানতে পারলাম তখন বড় দেরি হয়ে গিয়েছে। সুরেন সরকার ও তার স্ত্রী সারাজীবনের উপার্জন থেকে রহস্যজনকভাবে প্রতারিত হয়েছে। ওদের হাতে যে অর্থ ছিল তাও শেষ। বাড়ি ভাড়া বাকি, অথচ সুদূর পুনে থেকে যেকোনো মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ টাকার আসবার অপেক্ষায় রয়েছে সরকারদম্পতি। সামনেই রয়েছে হাসপাতালের খরচ। ওদের ডাক্তার রসিকতা করেছেন, নার্সিংহোমে একটা ডবল রুম নিয়ে আপনারা দু'জনে কিছুদিন থেকে যান।

তারপর? তারপরের ব্যাপারটাও আমাকে স্তম্ভিত করেছে। একদিন দুপুরে স্থানীয় থানার পুলিশ এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছে। সুরেন ও ঊষাকিরণ ভোররাতে একই সঙ্গে আত্মঘাতী হয়েছে। কারও যাতে অসুবিধে না হয় তার জন্যে সুসংযত সুইসাইড নোট রেখে গিয়েছে পুলিশের নামে। সরকার দম্পতি ক্ষমা চেয়েছে এই ধরনের অসুবিধা সৃষ্টির জন্যে। ওরা কিন্তু বিস্তারিত লিখেছে একান্ত প্রিয় রাতুল সরকারের সম্বন্ধে। এই দেশের মানুষটিই সুচতুরভাবে সর্বস্বহরণ করেছে অথচ সুরেন ও তার স্ত্রী লোভের বশবর্তী হয়নি, সরলমনা সরকার দম্পতির নির্ভাবনায় বার্ধক্য অতিবাহিত করা ছাড়া অন্য কোনো প্রত্যাশা ছিল না।

রাতুল সরকার খলিফা ব্যক্তি। আইন বাঁচিয়ে প্রবঞ্চনার কাজটা এমনভাবে সেরেছে, সবকিছু এমনভাবে ম্যানেজ করেছে, যে পুলিশ তার দিকে হাত বাড়াতে উৎসাহ দেখাচ্ছে না।

সুইসাইড নোট লেখার সময়ে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের বোধ হয় কোনও ভয় থাকে না। ওরা দুজনে লিখেছে, "রাতুলের কারসাজিতে আমরা

কপর্দকশূন্য হয়েছি। আর একদিন বাঁচলে আমাদের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে না। দেনায় জর্জরিত হয়ে, অপরের পাওনা গণ্ডা না দিয়ে আমরা ছোট হতে চাই না। তার বদলে মৃত্যু আসুক। মৃত লোকের চিকিৎসা প্রয়োজন হয় না।"

আর একটা চিঠি লিখেছে আমাকে। "মাই ডিয়ার বলরাম, হাতে তেমন সময় নেই। ভাবছি, কাকে শেষ লিখে যাই, তারপর মনে হলো তুমি আমার ছাত্রজীবনের সহপাঠী, আবার শেষজীবনের বন্ধুও বটে। কলকাতার বৈদ্যুতিক চুল্লিতে আজকাল খরচ কত আমি জানি না, বালিশের তলায় একটা খামে দু'হাজার টাকা ক্যাশ রেখে গেলাম। দাহকার্যের দায়িত্বটা তোমাকে না জিজ্ঞেস করেই তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে গেলাম। উপায় ছিল না, ক্ষমা কোরো ব্রাদার। আর শোনো, আর একটা খামে দশ হাজার টাকা রইল। দু'মাসের ভাড়া বাকি, বাড়িওয়ালাকে মিটিয়ে দিও। শ্রাদ্ধশান্তি এসবের প্রয়োজন নেই। বরং একদিন পার্কে অবসরিকার বেঞ্চিতে বসে তোমরা সকলে মিলে আমাদের কথা একটু আলোচনা কোরো। বৃদ্ধবয়সে কাউকে বোকার মতন বিশ্বাস করার চেয়ে সবাইকে অবিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত কি না তা বিচার করে দেখো। সময় হয়ে গিয়েছে। গুড্ বাই। তোমাদের স্যর সুরেন্দ্রনাথ।"

পুলিশের হাঙ্গামা, সুরেন ও তার সহধর্মিণীর পারলৌকিক কর্ম সব মিটে গিয়েছে। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে আমার বন্ধু সুরেন সরকার শান্তি পেয়েছে আমি ধরে নিতে পারি। পুলিশ অবশ্য বলছিল, আত্মহত্যাটা বেআইনি। কিন্তু আত্মহত্যার পরে পুলিশ তো আজও কাউকে ধরতে সক্ষম হয়নি।

আমার মনে পড়লো, অবসরিকার একটা সংখ্যায় স্বেচ্ছামৃত্যু সম্পর্কে সভ্যদের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা হয়েছিল। সুরেন সেই সংখ্যায় চমৎকার ভাষায় লিখেছিল, একথা ঠিক আমি কখন পৃথিবীতে আসব তা আমি ঠিক করিনি, কিন্তু তাই বলে আমি কখন যাবো তা ঠিক করার

স্বাধীনতা কেন আমার থাকবে না?

আমার চিন্তশক্তি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, সুরেন ও ঊষাকে একসঙ্গে সি অফ্ করতে হলো।

বেঁচে থাকার জন্য ব্যাঙ্ক যে নিতান্ত প্রয়োজন তা পৃথিবীতে স্পষ্ট বলা হয় না কেন?

আজকাল আমার বেরুতে ইচ্ছা করে না। নরপতি সামন্তর শ্যালক ইতিমধ্যে আমাকে গুড্‌হাউস কোম্পানির ফিকস্‌ড ডিপোজিট রসিদ, মাসিক সুদের কয়েকখানা আগাম চেক নিজের হাতে দিয়ে গিয়েছেন। সেই সঙ্গে হাতে তুলে দিয়েছেন কিছু নগদ টাকা—ইনসেনটিভ। সেই সঙ্গে সারপ্রাইজ—একটা ছাতা। নতুন বিনিয়োগকারী আকর্ষণ করার জন্যে এইটাই আমার প্রাক্তন কোম্পানির সুপরিকল্পিত স্ট্রাটেজি।

সুদের একটা চেক আমি যথাসময়ে ভাঙিয়ে এনেছি। সুরেনের দাহকাজে দু'হাজার টাকা পুরো খরচ হয়নি। কিছু বাড়তি পড়ে আছে, কাকে দেবো এখনও জানি না। সুরেন এত সাবধানী, এত হিসেবি, কিন্তু যাবার সময় বাড়তি টাকা রেখে গেলো।

না সুরেন, আমি মৃত্যুকে দিয়ে আমার এই কাহিনী শেষ করবো না। মৃত্যু তো এক ধরনের ব্যর্থতা। সার্থক জন্মের পর মৃত্যুর ব্যর্থতা বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নেবার জন্যে তো আমরা বিশ্বসংসারে আসিনি। আমাদের জন্মমুহূর্তে ধরিত্রী আনন্দিতা হয়েছিলেন, সুদূর আকাশের তারারা আমার উদ্দেশেই তাদের নিঃশব্দ বাণী পাঠিয়েছিল, একথা স্বয়ং কবিই তো বলে গিয়েছেন।

অতএব শোনো আমার পরবর্তী কথা। আমি যখন পরের মাসের সুদের চেকটা নিয়ে ব্যাঙ্কে যাচ্ছিলাম, তখন আবার একখানা খবরের কাগজ একটি মার্কেটিং বালিকার কাছ থেকে উপহার পেলাম। ওই কাগজের তৃতীয় পাতায় খবর বেরিয়েছে, গুড্‌হাউস কোম্পানি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাতের অন্ধকারে ওখানে তালা ঝোলানো হয়েছে, কোম্পানিরাও তাহলে কখনও কখনও দেনায় জর্জরিত হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়!

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার আমার নাম লেখাটা চেকটা নিলেন না। বললেন, খোঁজ করি মশাই, কোম্পানি লালবাতি জ্বাললে কে তার চেকে সম্মান করবে? চেক সম্মানিত না হয়ে ফিরে এলে আমরা আপনার অ্যাকাউন্ট বেশ কয়েকটা টাকা কেটে নেবো। কেন ডবল লোকসান করবেন?

আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে। ব্যাংক থেকে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চোখের সামনে বন্ধু সুরেন সরকারকে দেখতে পাচ্ছি আমি বলরাম সরকার, রিটায়ার্ড জুনিয়র অফিসার অফ গুড্‌হাউস লিমিটেড, ক্যালকাটা। এই সেই ক্যালকাটা যেখানে নিকট আত্মীয়রা সাজ পরে ভাইপো তার প্রিয়জনের যথাসর্বস্ব হরণ করে, যেখানে নামকরা কোম্পানি তাদের দীর্ঘদিনের এক কর্মীকে অবসর নিতে বাধ্য করে এবং পরে তার যথাসর্বস্ব হরণ করে, যেখানে কেউ বোধহয় চায় না, সম্পদশূন্য বৃদ্ধরা দীর্ঘজীবী হোক। বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে সরকারের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, কিন্তু তাঁদেরই আইন অনুযায়ী আত্মহত্যাটা অপরাধ, অর্থাৎ বেঁচে থাকাটা বাধ্যতামূলক।

আমার এবার মনে পড়ছে, গতকাল উপাসনার মাসতুতো দাদা সুরেন ভট্টাচার্য ওরফে চাঁদুদা তাঁর রোগজীর্ণা স্ত্রী রত্নাকে নিয়ে বোনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। সুরেন ভট্টচার্য এখনও পণ্ডিতিয়া রোডে মিস্টার সুখানির অফিসে কাজ করছেন, কিন্তু বেশ ভয়ে ভয়ে রয়েছেন।

আমার সামনে এখন পথ কী? আই অ্যাম স্যরি সুরেন, আমি বেআইনি কোনও কাজ করতে পারবো না. আত্মহত্যা ইজ ইল্‌লিগাল। পেনাল কোড থেকে আরম্ভ করে ন্যায়শাস্ত্র পর্যন্ত সর্বত্র আত্মহননের তীব্র নিন্দা।

হাজরা মোড় থেকে স্কুটার রিকশ চড়ে আমি পণ্ডিতিয়া প্লেসে মিস্টার বিনয় সুখানির অফিসে ঢুকে পড়েছি। সৌভাগ্যক্রমে মিস্টার সুখানি আজ কোনো এ জি এম অ্যাটেন্ড না করে নিজের অফিসে কর্মব্যস্ত রয়েছেন। অফিসের খরচ কমাবার জন্যে তিনি এখনও সস্তায় লোক খুঁজছেন। আমাকে দেখে বেজায় খুশি বিনয় সুখানি। বললেন, "কই আপনি তো

এলেন না, মিস্টার বিশোয়াস। মিস্টার সারকিট সেনগুপ্ত আপনার কথা অমনভাবে বলে গেলেন। আপনি মিনিমাম কত মাইনেতে কাজ করতে রাজি তা জানালেন না।" একবার ভাবলাম সুখানিকে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি একজন বেশি মাইনের বুড়োকে তাড়িয়ে একজন কম দামের বুড়োকে নেবেন? কিন্তু সম্ভাব্য মালিককে এধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হবে না, ওঁর মুখের ভাব দেখেই তো মনের ইচ্ছেটা বুঝতে পারছি।

বিনয়াবনত আমি নতজানু হয়ে নিবেদন করলাম, "শুনুন মিস্টার সুখানি, চাকরিটা আমার বিশেষ দরকার। আপনি একই পোস্টে এখন যা দিচ্ছেন তার থেকে একশো টাকা অথবা যত ইচ্ছে কম দেবেন। এইটাই আমার টেন্ডার।"

প্রজ্ঞার প্রতিমূর্তি হয়ে বসে আছেন বিনয় সুখানি। বললেন, "বুড়োরা হাঙ্গামা করে না, তবু আমি এক মাসের মাইনে প্রেজেন্ট বুড়োটার হাতে দিয়ে দেবো, আপনি কাল থেকেই কাজে আসুন মিস্টার বিশোয়াস।"

একশ টাকার থোকে একটা বুড়োকে তাড়াতে কেনও কষ্ট হচ্ছে না কোটিপতি মিস্টার সুখানির। বলছেন, "বুড়ো বয়সে মানুষ যেকটা দিন যা পায় তাই তো পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা।"

"আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট রাইট।" এই বলে আমার নতুন মনিবের সঙ্গে উষ্ণ করমর্দন করেছি আমি বলরাম বিশ্বাস, হাজবেন্ড অফ উপাসনা।

পণ্ডিতিয়া প্লেস থেকে বাড়ি ফেরার পথে কী যে হলো, পথের ধারে একটা দিশি মদের দোকান দেখে তার সামনে থমকে দাঁড়িয়েছি। আজ আমি একটু ড্রিংক করবো, তাতে যা হয় তা হোক। সস্তার মদ গলায় ঢালতে ঢালতে আমি বলেছি, পুওর বলরাম বিশ্বাসকে কিছুতেই দোষ দেওয়া চলবে না।

উপাসনার মাসতুতো দাদার মুখটা আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। ওঁকে আমি বললাম "ভট্‌চাজ্যি মশাই, আপনি আমাকে দোষ দিতে পারেন না, আমি কম মাইনে না চাইলে, অন্য কোনো বুড়ো এসে সেই অপকর্মটি করত। আপনাকে রক্ষে করা যিনি আপনার জন্ম দিয়েছেন সেই

ঈশ্বরের কাজ, মানুষের নয়।" প্লিজ আপনি আপনার দূর সম্পর্কের শ্যালককে ভুল বুঝবেন না।

মন চলো নিজ নিকেতনে! অনেক রাত্রে আমি বাড়ি ফিরে এসেছি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আমার জন্যে দরজা খুলে দিয়ে মদের গন্ধ পেয়ে উপাসনা আঁতকে উঠলো। "একি করেছো তুমি!"

মত্ত অবস্থাতেও মাথা ঠিক রাখার চেষ্টা করছি আমি। আমি উপাসনার হাতটা জড়িয়ে ধরেছি। "উপাসনা, প্লিজ শোনো। সেই যেদিন রিপন স্ট্রিটে গুড হাউস কোম্পানিতে চাকরির নিয়োগপত্র পেয়েছিলাম সেদিন বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে একটু ড্রিংক করেছিলাম, তোমার মনে আছে নিশ্চয়। আমি সেদিন তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর কোনো দিন আমি ড্রিংক করবো না। শোনো উপাসনা, আমি আবার একটা চাকরি জোগাড় করেছি। আমাকে তুমি বোকো না প্লিজ। বুড়ো হলে মানুষকে বকতে নেই, উপাসনা।"

উপাসনা বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নগর কলকাতার একজন স্বেচ্ছা-অবসর নিতে বাধ্য হওয়া বুড়োকে ছোট ছেলের মতো কাঁদতে দেখে সে আর কিছু বললো না। বরং পরম স্নেহে আমাকে ভিতরে টেনে নিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে দিলো।

-